দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর

তারেক শামসুর রেহমান



বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর

দ্বিতীয় খণ্ড

তারেক শামসুর রেহমান

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

লেখকের কথা

The history of the 20th century was shaped by the changing relations of the world's great powers. The first half of the century, the age of the World Wars and the start of the Cold War, was dominated by the rivalries of those powers. The second half saw the replacement, largely through the agency of those wars, of the European state system by a world system with many centres of both power and discord.

Prof Walter A. McDougalil
University of Pennsylvania, USA.

বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর-এর দ্বিতীয় খণ্ড মূলত ইতিহাস নির্ভর ঘটনাবলির একটি বিশ্লেষণ। প্রথম গ্রন্থে আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করতে পারিনি, দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। পাঠক যদি দুটি খণ্ড একসাথে পড়েন, তাহলে বিংশ শতাব্দীর সব ঘটনার একটা পূর্ণ চিত্র পাবেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে উপনিবেশবাদের বিস্তার, এর প্রেক্ষাপট ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা। ইউরোপীয় শক্তিগুলো কীভাবে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করেছিল, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ রয়েছে প্রথম দুই অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশের বিস্তার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশের বিস্তার নিয়ে আলোচনা। প্রথম অধ্যায়ে আমরা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি ও এর প্রেক্ষাপটও আলোচনা করেছি। এই দুটো অধ্যায়ই মূলত এক ধরনের ডকুমেন্ট যা পাঠককে উপনিবেশবাদের বিস্তার বুঝতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত দেওয়া হয়েছে, যাতে উপনিবেশবাদের প্রভাবটা বুঝতে সহজ হবে। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কীভাবে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ওই

অঞ্চলে তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছিল, আমরা সেই তথ্যও তুলে এনেছি। একই সাথে লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ১৯১১ সালের চীন বিপ্লব নিয়ে আলোচনা। চীনা সমাজ ও চীনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বুঝতে হলে চীনের ১৯১১ সালের বিপ্লবকে জানতে হবে। ১৯১১ সালে চীনে এই বিপ্লব একটি বড় পরিবর্তন এনেছিল। এর মধ্য দিয়ে চীনে Qing সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে একটি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি গণতান্ত্রিক চীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ওই সময় তৈরি হয়েছিল। এ কারণেই ১৯১১ সালের চীন বিপ্লবের গুরুত্ব রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে সংগত কারণেই প্যারিসের শান্তি সম্মেলন, ভার্সাই চুক্তি, উইলসনের ১৪ দফা, জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা এবং বলকান যুদ্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব যে বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল, যা মহামন্দা হিসেবে খ্যাত সে ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে ওই মহামন্দার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি একটি অংশ। অটোমান সাম্রাজ্যের গুরুত্ব এ কারণে যে, এই সাম্রাজ্য ৬০০ বছরের অধিককাল বিস্তৃত ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে ১৯২৪ সালে এর অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রায় ২০ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে (ইউরোপের একটা অংশসহ) এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আর এ কারণে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আলোচনা করেছি। ফিলিস্তিন সংকটের গুরুত্ব এ কারণে যে বিংশ শতাব্দীর একটা বড় সময় এই ফিলিস্তিন সংকট বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। এমনকি একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। এ কারণেই ফিলিস্তিন সংকটের গুরুত্ব অনেক বেশি।

অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে ফ্যাসিবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। শুধুমাত্র ইতালি, জার্মানি আর স্পেনের ফ্যাসিবাদই আমাদের আলোচনায় আসেনি, বরং জাপানের ফ্যাসিবাদ নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের এটা বুঝতে সহজ হবে কীভাবে ফ্যাসিবাদ বিস্তার করেছিল এবং বিশ্ব সভ্যতাকে একটি সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। নবম অধ্যায়ে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে ইয়াল্টা সম্মেলন, আটলান্টিক চার্টার, তেহরান সম্মেলন, পটসডাম সম্মেলন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন পর্যন্ত। যেহেতু বিষয়গুলো আমরা ২০২০ সালে এসে আলোচনা করেছি, সে কারণে সর্বশেষ তথ্য ও বিশ্লেষণ আমরা তুলে ধরেছি। দশম অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন। এই আলোচনায় আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্রের ভিন্ন পথ ও সমাজতন্ত্রের পতন নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই অধ্যায়ে বিশ্বব্যাংক গঠন এবং গ্যাট থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্থানে যেসব জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান হয়েছে, তার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে হলোকাস্ট, আর্মেনিয়ান হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় সেব্রেনিৎসা গণহত্যা, আফ্রিকার হুতু-তুতসি দ্বন্দ্ব ও গণহত্যাও স্থান পেয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়টিও বিংশ শতাব্দীর একটি অংশ। ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছিল। ধর্মকে (শিয়া) সামনে রেখে এবং এটাকে ব্যবহার করে যে একটি বিপ্লব হতে পারে, ইরান বিপ্লব ছিল তার বড় প্রমাণ। ২০২০ সালে এসেও এই বিপ্লবের গ্রহণযোগ্যতা ও ইরান সমাজে এর প্রভাব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিশ্বায়নের গতিপ্রকৃতি ও বিশ্বায়নের ব্যর্থতা চর্তুদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে নতুন ধরনের যে একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, যাকে আমরা বলছি নতুন বিশ্বায়ন বা বি-বিশ্বায়ন (deglobalisation), আলোচনায় তাও স্থান পেয়েছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এই নতুন বিশ্বায়নের ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে। পঞ্চদশ অধ্যায়টি আমাদের সর্বশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত সকল চুক্তি ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মানব ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর গুরুত্ব অনেক বেশি। এই শতাব্দীতে অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা বিশ্ব রাজনীতিকে বদলে দিয়েছিল। এজন্যই দুই খণ্ডে আমরা 'বিংশ শতাব্দীর ১০০ বছর' বইটি প্রকাশ করলাম। প্রথম খণ্ড

অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এত বিশাল যে এক খণ্ডে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমরা তুলে আনলাম। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পা দিয়ে পাঠক যাতে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বুঝতে পারেন, সে জন্য সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু তথ্য আমরা সংযোজন করেছি। গ্রন্থটিতে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যাতে করে পাঠক খুব সহজেই বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পেতে পারেন। গত প্রায় এক বছর যাবৎ আমি গ্রন্থটি রচনা করতে প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি এবং গ্রন্থ রচনার সময় তা ব্যবহার করেছি। গ্রন্থটিতে আমরা প্রচুর ঐতিহাসিক ছবি ব্যবহার করেছি যা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞান আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হয়, আমার সার্থকতা এখানেই। বরাবরের মতো শোভা প্রকাশের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের কৃতিত্ব এখানে বেশি। তাঁর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণাতেই এই বই লেখা। আমার সন্তানতুল্য সুজন, হানিফ, তৌফিক, জবা, তনিমা এবং শুভ ও সামির ওদের কথা না বললেই নয়– ওরা আমার কাছে থেকে নতুন বই পেতে চায়। ওদের সবার জন্য আমার ভালোবাসা।

সাভার, ঢাকা
আগস্ট, ২০২০

প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান
সাবেক সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও
সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সারণি তালিকা

সারণি-১ : আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ॥ ২১
সারণি-২ : বিংশ শতাব্দীর আফ্রিকা ॥ ২৩
সারণি-৩ : বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকা ॥ ৪৪
সারণি-৪ : লাতিন আমেরিকার শীর্ষ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ॥ ৫০
সারণি-৫ : লাতিন আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলোর তালিকা ॥ ৫১
সারণি-৬ : লাতিন আমেরিকার শীর্ষ দশ কোম্পানির আয় ॥ ৮২
সারণি-৭ : ভারতে ব্রিটিশ শাসন ॥ ৮৫
সারণি-৮ : ভারতে ব্রিটিশ গর্ভনর জেনারেল ও ভাইসরয় ॥ ৮৮
সারণি-৯ : চীনা বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ॥ ৯৪
সারণি-১০ : মহামন্দা ও বিশ্ব ॥ ১১১
সারণি-১১ : যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার কিছু তথ্য ॥ ১১৩
সারণি-১২ : যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার কিছু পরিসংখ্যান ॥ ১১৫
সারণি-১৩ : অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি : কিছু তথ্য ॥ ১২২
সারণি-১৪ : জাপানি ফ্যাসিবাদ : গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ॥ ১৪৫
সারণি-১৫ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী নানা চুক্তি ॥ ১৪৮
সারণি-১৬ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু কথা ॥ ১৫০
সারণি-১৭ : পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ॥ ১৭০
সারণি-১৮ : গ্যাট থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ॥ ১৮৭
সারণি-১৯ : ইরান সম্পর্কে কিছু তথ্য ॥ ২২৮
সারণি-২০ : শীর্ষ বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ ॥ ২৩৭
সারণি-২১ : অসমতার চিত্র ॥ ২৪৪
সারণি-২২ : বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকা ॥ ২৪৯
সারণি-২৩ : ধনী দেশগুলোর তালিকা . ২৫১
সারণি-২৪ : দরিদ্র : কিছু তথ্য ॥ ২৫৮
সারণি-২৫ : অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশগুলোর তালিকা ॥ ২৫৯
সারণি-২৬ : প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ শীর্ষে অবস্থানকারী দেশসমূহ ॥ ২৬০
সারণি-২৭ : শীর্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি (২০১৮) ॥ ২৬০
সারণি-২৮ : ধনী ও গরিব দেশের মাঝে পার্থক্য ॥ ২৬১
সারণি-২৯ : CRI অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর অবস্থান ॥ ২৬১
সারণি-৩০ : CRI অনুযায়ী সবচেয়ে খারাপ ১০টি দেশ ॥ ২৬২
সারণি-৩১ : CRI এ দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান ॥ ২৬২
সারণি-৩২ : যুক্তরাষ্ট্র যেসব সংস্থা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে ॥ ২৬৩
সারণি-৩৩ : পারমাণবিক পরীক্ষার ঘটনাপঞ্জি ॥ ২৬৮
সারণি-৩৪ : অঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ ॥ ২৭২
সারণি-৩৫ : এক নজরে পারমাণবিক অস্ত্র : ১৯৪৫-২০২০ ॥ ২৭৫
সারণি-৩৬ : এক নজরে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ ॥ ২৮১

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায় : **উপনিবেশবাদের বিস্তার : আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা ॥ ১৭-৬৩**

আফ্রিকা ১৮
বার্লিন সম্মেলন ১৯
ফ্রান্স ২৫
ব্রিটেন ২৬
ইতালি ২৯
পর্তুগাল ৩১
জার্মানি ৩২
বেলজিয়াম ৩৪
স্পেন ৩৬
হল্যান্ড ৩৮
মূল্যায়ন ৪০
লাতিন আমেরিকা ৪২
বিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকা ৪৯
লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ৫২
উপনিবেশবাদের নব্যরূপ ৬২

দ্বিতীয় অধ্যায় : **উপনিবেশবাদের বিস্তার : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া ॥ ৬৪-৯১**

দক্ষিণ এশিয়া ৮৩

তৃতীয় অধ্যায় : **চীন বিপ্লব ॥ ৯২-৯৯**

চতুর্থ অধ্যায় : **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি ॥ ১০০-১০৮**

বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ ও ১৯১৩ ১০১
প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (১৮ জানুয়ারি ১৯১৯-২১ জুন ১৯২০) ১০৩
উইলসনের ১৪ দফা ১০৪
ভার্সাই চুক্তি ১৯১৯ ১০৫
ভাইমার রিপাবলিক, ১৯১৮ ১০৭

পঞ্চম অধ্যায় : **মহামন্দা ॥ ১০৯-১১৫**

ষষ্ঠ অধ্যায় : অটোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ॥ ১১৬-১২২
অটোমান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ১২৬

সপ্তম অধ্যায় : ফিলিস্তিন সংকট ॥ ১২৩-১২৯

অষ্টম অধ্যায় : ফ্যাসিবাদের উত্থান ॥ ১৩০-১৪৬
মুসোলিনি ১৩৩
নাজিবাদ ১৩৬
স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ফ্রাংকো উত্থান ১৩৯
জাপানি ফ্যাসিবাদের স্বরূপ ১৪২

নবম অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি ॥ ১৪৭-১৬৪
ইয়াল্টা সম্মেলন ১৫০
আটলান্টিক চার্টার ১৫২
তেহরান সম্মেলন ১৫৩
পটসডাম সম্মেলন ১৫৩
ন্যাটো সামরিক জোট ১৫৫
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৫৯
মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান ডকট্রিন ১৬০
ওয়ারশ জোট ১৬১
কমিকন ১৬৩
জার্মান একত্রীকরণ ১৬৪

দশম অধ্যায় : পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ॥ ১৬৫-১৭৮
গর্বাচেভ ও পূর্ব ইউরোপ ১৬৮
পূর্ব ইউরোপের বর্তমান অবস্থান ১৭১
সমাজতন্ত্রের নয়া পথ : যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়ার অভিজ্ঞতা ১৭১
আলবেনিয়া ১৭৪
যুগোস্লাভিয়ার ভেঙে যাওয়া ১৭৭
উপসংহার ১৭৮

একাদশ অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ॥ ১৭৯-১৯৬
গ্যাট, ডব্লিউটিও এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব ১৮৬
গ্যাট কী ১৮৬
বর্তমান গ্যাট চুক্তিতে কী আছে ১৮৯
বাংলাদেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ১৯০
ডব্লিউটিও : গ্যাটের উত্তরসূরি ১৯২

দ্বাদশ অধ্যায় : জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান ॥ ১৯৭-২১২
পুরানো কথা ১৯৮
হলোকাস্ট ২০০
আর্মেনিয়ান গণহত্যা ২০৪
সাবেক যুগোস্লাভিয়া ২০৫
কসোভো ২০৬
রুয়ান্ডা ২০৭
বুরুন্ডি ২০৯
জায়ার ২১১

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ইরানি বিপ্লব ॥ ২১৩-২৩১
ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ ২২৭

চতুর্দশ অধ্যায় : বিশ্বায়ন ॥ ২৩২-২৬৩
বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ২৪৭
নতুন বিশ্বায়ন ২৫২
কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব ২৫৫

পঞ্চদশ অধ্যায় : নিরস্ত্রীকরণ ॥ ২৬৪-২৮৫
এনপিটি চুক্তি ২৭৪
সিটিবিটি ২৭৭
সল্ট চুক্তি ২৭৮
আইএনএফ চুক্তি ২৭৯
স্টার্ট চুক্তি ২৭৯
জৈব অস্ত্র কনভেনশন ২৮২
রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি ২৮৩
মহাশূন্য চুক্তি ২৮৪

প্রথম অধ্যায়

উপনিবেশবাদের বিস্তার : আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা

> Colonialism is a practice of domination, which involves the subjugation of one people to another. One of the difficulties in defining colonialism is that it is hard to distinguish it from imperialism. ... Like colonialism, imperialism also involves political and economic control over a dependent territory.
>
> **May 9, 2006**
> **Stanford Encyclopedia of Philosophy**

উপনিবেশবাদ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। মূলত ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে এবং তাদের ব্যাবসায়িক স্বার্থ হাসিল করার স্বার্থে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব তথা দক্ষিণ এশিয়াতে তাদের ক্ষমতার বলয় বিস্তার করেছিল। এটা করতে গিয়ে তারা তাদের অবৈধ শাসন ওই এলাকায় চালু করেছিল। অত্যাচার, নির্যাতন আর গণহত্যার মধ্যে দিয়ে ইউরোপের শাসকরা এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করতো। তাদের সম্পদ লুট করে নিয়েছিল। আর এভাবেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো এক বিশাল অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশবাদের ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও, ইতিহাস থেকে জানা যায়, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে আজকের যে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ (Canary Island) সেখানে প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলো উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করে। স্পেন এ প্রক্রিয়া প্রথম শুরু করে। ১৬০৭ সালে ব্রিটেন আটলান্টিকের ওপারে তাদের কলোনি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করে। ওই বছর তারা ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনে এ (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের প্রথম কলোনি প্রতিষ্ঠা করে।

আফ্রিকা

বিংশ শতাব্দীর আফ্রিকার ইতিহাস জুড়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন। বলা হয় 'Age of Discovery'র মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রথম কলোনিয়াল প্রক্রিয়া শুরু করে পর্তুগাল। পরে এর সাথে যোগ দেয় স্পেন। মোট তিনটি 'Wave of Colonialism' বা কলোনিয়াল প্রক্রিয়ার তিনটি 'ধারা' বা কলোনিয়াল প্রক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই ধারাগুলোর সাথে জড়িত ছিল তৎকালীন তিনটি শক্তি–পর্তুগাল, স্পেন ও অটোমান সাম্রাজ্য। পর্তুগাল প্রথমে তার কলোনিয়াল প্রক্রিয়া শুরু করে ১৪১৫ সালে ভূমধ্যসাগর ঘেঁষে মরক্কোর Ceuta দখল করার মধ্যে দিয়ে। এর পর আফ্রিকায় তারা অভিযান পরিচালনা করে। পরে ১৬৬৮ সালে পর্তুগালের রাজা Afonso VI স্পেনের কাছে Ceuta হস্তান্তর করেন। অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে ১৩৫৯ থেকে ১৬৫৩ সময়সীমায় তাদের কলোনিয়াল সীমানা সম্প্রসারিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায়। আর স্পেন ও পর্তুগাল Treaty of Tordesillas (১৪৯৪) স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে লাতিন আমেরিকায় তাদের দখলিকৃত এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দ্বিতীয় ধারা বা কলোনিয়াল প্রক্রিয়া শুরু করে ব্রিটেন এশিয়ায় তাদের কলোনিয়াল এলাকা সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে। এ লক্ষ্যে প্রথমে তারা East India Company গঠন করেছিল। এশিয়ায় কলোনিয়াল এলাকা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সাথে সাথে ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যান্ডও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় উদ্যোগটিকে বলা হয় 'New Imperialism' বা নয়া সাম্রাজ্যবাদ। ১৮৮৪-১৮৮৫ সালে বার্লিন সম্মেলনে আফ্রিকার বিভক্তি, যা চিহ্নিত হয়ে আছে *Scramble for Africa* হিসেবে, এর মাধ্যমে কলোনাইজেশনের তৃতীয় ধারা শুরু হয়েছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইতালি আর স্পেনের মতো দেশ আফ্রিকাকে নিজেদের মতো ভাগ করে নিয়েছিল।

প্রাচীন চীনে (Han শাসনামলে খ্রিস্টপূর্ব ২০২-২২০ খ্রিস্টাব্দ) পার্শ্ববর্তী ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও মধ্য এশিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি সম্প্রসারিত করলেও, ইউরোপীয় শক্তিগুলো যখন পঞ্চদশ শতকে তাদের কলোনি সম্প্রসারিত করে, তখন চীনের কোনো উদ্যোগের কথা ইতিহাসে নেই। রাশিয়ায় শাসক জার রোমানভের শাসন আমলে ১৫৯৮-১৬১৩ সময়সীমায় রাশিয়া তার সীমানা পশ্চিম ইউরোপে সম্প্রসারিত করেছিল। তবে আমরা যখনই উপনিবেশবাদ নিয়ে আলোচনা করি, তখনই ইউরোপীয়

শক্তিগুলোর কথাই আলোচনায় আসে। অর্থাৎ ইউরোপীয় শক্তিগুলোই কলোনিয়াল প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। উপনিবেশ বিস্তারে যে তিনটি ধারার কথা আমরা উল্লেখ করলাম, সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন গবেষক গিলমার্টিন মন্তব্য করেছেন যে এই তিনটি 'ধারা' মূলত পুঁজিবাদের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম ধারায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো নতুন নতুন আয়ের উৎস সন্ধান করেছে, যা কি না ইউরোপের সামন্ততন্ত্রকে (Feudalism) টিকিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয় ধারায় বাণিজ্য নির্ভর পুঁজিবাদের (Mercantile Capitalism) জন্ম হয়েছিল এবং ইউরোপে উৎপাদনশীল শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তৃতীয় ধারায় উপনিবেশগুলোর কাঁচামাল ব্যবহার করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল (দেখুন, M. Gilmartin, Colonialism/Imperialism : In key Concepts in Political Geography, 2009)। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসন আলোচনা করতে গেলে আমাদের বার্লিন সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বার্লিন সম্মেলন

আফ্রিকার উপনিবেশবাদী ইতিহাসে বার্লিন সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বেশি। ওই সময়কার জার্মান চ্যান্সেলর অটোভন বিসমার্ক এই সম্মেলনটি ডেকেছিলেন। ১৮৮৪ সালের ১৫ নভেম্বর বার্লিনে যে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে অংশ নিয়েছিল ১৪টি দেশ। দেশগুলো হচ্ছে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, ইতালি, হল্যান্ড, পর্তুগাল, রাশিয়া, স্পেন, সুইডেন-নরওয়ে (১৮১৪ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত একত্রিত), তুরস্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র। অনেক দেশেরই ওই সময় আফ্রিকাতে কোনো কলোনি ছিল না। সম্মেলনে অন্যতম আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে কঙ্গো নদী (Congo River) ও নাইজার নদীর (Niger River) অববাহিকা এলাকা নিরপেক্ষ থাকবে। কেননা এই নদীপথ ব্যবহার করে আফ্রিকার কাঁচামাল ইউরোপে সরবরাহ করা হতো। তবে কঙ্গো নদীর অববাহিকার কিছু অংশ (Congo Basin) বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ২ (Liopold II) এর নিয়ন্ত্রণে থেকে গিয়েছিল। বেলজিয়ামের রাজার নিয়ন্ত্রণে আফ্রিকার আরো যেসব অঞ্চল ছিল, সেখানকার জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকের মৃত্যু হয়েছিল তার শাসন আমলে। তিনি ১৮৬৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪৪ বছর তিনি বেলজিয়াম শাসন করেন। এখানে বলা ভালো, বার্লিন সম্মেলনটি ১৮৮৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ওই

সম্মেলনেই ইউরোপিয়ান শক্তিগুলোর মাঝে আফ্রিকা ভাগ হয়ে যায়। এই বিভক্তির মধ্য দিয়ে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশটি দেশের অস্তিত্বের খবর জানি, যে দেশগুলোর কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হাতে। যেভাবে আফ্রিকার বিভক্তি নিশ্চিত হয়েছিল, তা ছিল অনেকটা এ রকম :

ব্রিটেন	:	মিশর, সুদান (অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান সুদান), উগান্ডা, কেনিয়া (ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা), দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে (রোডেশিয়া), বতসোয়ানা। একই সাথে নাইজেরিয়া ও ঘানা (গোল্ড কোস্ট)।
ফ্রান্স	:	পশ্চিম আফ্রিকার বড় অংশ মৌরিতানিয়া থেকে সাদ (ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকা), গ্যাবন, রিপাবলিক অব কঙ্গো (ফ্রেঞ্চ ইকুয়েটরিয়াল আফ্রিকা)।
বেলজিয়াম	:	রাজা লিওপোল্ড ২ এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (বেলজিয়ান কঙ্গো)।
পর্তুগাল	:	মোজাম্বিক ও এঙ্গোলা।
ইতালি	:	সোমালিয়া (ইতালিয়ান সোমালিল্যান্ড) এবং ইথিওপিয়ার কিছু অংশ।
জার্মানি	:	নামিবিয়া (জার্মান সাউথ-ওয়েস্ট আফ্রিকা), তানজানিয়া (জার্মান ইস্ট আফ্রিকা)
স্পেন	:	ইকুয়েটরিয়াল গায়ানা

সূত্র : Geography : Realms, Regions, and Concepts, Harm J.de Blij, Peter O. Muller, Jan Nijman, 16 Edition, November 25, 2013.

ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে কোনো কোনো দেশ (ঘানা) এক ইউরোপীয় শক্তির কাছ থেকে অন্য একটি শক্তির নিয়ন্ত্রণে গেছে ও তাদের কলোনিতে পরিণত হয়েছে। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকাতে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এই দখলি প্রক্রিয়ার পোশাকি নাম ছিল *'Scramble for Africa'*, অর্থাৎ 'আফ্রিকার বিভক্তি' কিংবা 'আফ্রিকা দখল'। ১৯১৪ সালের মধ্যে আফ্রিকার শতকরা ৯০ ভাগ অঞ্চল ইউরোপিয়ানদের দখলে চলে যায়। এর আগে ছিল মাত্র ১০ ভাগ এলাকা।

সারণি : ১

আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ

তেল ও গ্যাস	:	বিশ্বের শীর্ষ ৫টি তেল উৎপাদনকারী দেশ আফ্রিকায় রয়েছে। আফ্রিকার বৈদেশিক আয়ের ৫৭ ভাগ আসে হাইড্রোকার্বন থেকে। আলজেরিয়া, এঙ্গোলা, ক্যামেরুন, সাদ, কঙ্গো, মিশর, ইরিত্রিয়া, গ্যাবন, ঘানা, কেনিয়া, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ সুদান, তিউনেশিয়া ও মোজাম্বিকে তেল ও গ্যাস রয়েছে। মোট তেল রিজার্ভের পরিমাণ ১৩০.৩ বিলিয়ন ব্যারেল। বিশ্বে যে ৩০টি তেল উৎপাদনকারী দেশ রয়েছে, তার মাঝে ৫টি আফ্রিকাতে রয়েছে। ২০৩৬ সালে পর্যন্ত বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ২ ট্রিলিয়ন ডলার।
হীরক	:	এঙ্গোলা, বতসোয়ানা, মধ্য আফ্রিকা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো।
সোনা	:	বেনিন, বুরকিনা ফাসো, জিবুতি, মালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া।
নিকেল ও ইউরেনিয়াম	:	বুরুন্ডি
পজ্জুলোনা	:	কেপভার্দে
কাঠ	:	লাইবেরিয়া
টিটেনিয়াম	:	গাম্বিয়া
গ্রাফাইট	:	মাদাগাস্কার
তামাক	:	মালাবি
আকরিক লোহা	:	মৌরিতানিয়া
ফসফেট	:	পশ্চিম সাহারা, মরক্কো
অ্যালুমিনিয়াম ও গ্যাস	:	গায়ানা, মোজাম্বিক
কপার	:	উগান্ডা, জাম্বিয়া

সূত্র : আল-জাজিরা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আফ্রিকার দেশগুলো এক এক করে স্বাধীন হতে থাকে। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মোট পঞ্চাশটি আফ্রিকান দেশের নাম পাওয়া যায়, যারা একসময় ইউরোপের কয়েকটি দেশের উপনিবেশ ছিল। ১৫ শতকের পর থেকেই আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসন গড়ে ওঠে। মূলত ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানি, স্পেন,

ইতালি ও বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল আফ্রিকার এই দেশগুলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো উপনিবেশ গড়ে ওঠে ১৬৫২ সালে। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার ৩০ ভাগ মানুষ ছিল ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শক্তির আওতায়, ১৫ ভাগ ছিল ফ্রান্সের, ১১ ভাগ ছিল পর্তুগালের, ৯ ভাগ ছিল জার্মানির, ৭ ভাগ ছিল বেলজিয়ামের ও মাত্র ১ ভাগ ছিল ইতালির। স্পেনেরও উপনিবেশ ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের দখলিকৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল আজকের মিশর, সুদান, কেনিয়া, উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, উত্তর-পশ্চিম সোমালিয়া, জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা, নাইজেরিয়া, ঘানা ও মালাবি। এর অর্থ হচ্ছে পুরো আফ্রিকা মহাদেশের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষের শাসনভার গ্রহণ করেছিল ব্রিটেন। অন্যদিকে ফ্রান্সের প্রথম উপনিবেশকাল শুরু হয় ১৮১৪ সালে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই 'সাম্রাজ্যের' পতন হলে ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখল করার মধ্যে দিয়ে ফ্রান্স দ্বিতীয় উপনিবেশ শাসনকাল শুরু করে। এই দ্বিতীয় উপনিবেশ শাসনকাল যদিও শুধুমাত্র আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তা বিস্তৃত হয়েছিল। তবে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শক্তির গোড়াপত্তন ঘটে। আজকের মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, গায়ানা, মালি, আইভরি কোস্ট, বেনিন, নাইজার, চাদ, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, রিপাবলিক অব কঙ্গো, গ্যাবন, ক্যামেরুন, এবং পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্রবর্তী দেশগুলো ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হয়। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে, আইভরি কোস্ট ১৮৪৩ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, দাহোমি বা বেনিন ১৮৮৩ থেকে ১৯৬০, মালি (ফ্রেঞ্চ সুদান) ১৮৮৩ থেকে ১৯৬০, গায়ানা ১৮৯১ থেকে ১৯৫৮, মৌরিতানিয়া ১৯০২ থেকে ১৯৬০, নাইজার ১৮৯০ থেকে ১৯৬০, সেনেগাল ১৬৭৭ থেকে ১৯৬০, বুরকিনা ফাসো (আপার ভোল্টা) ১৮৯৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের কলোনি ছিল। তবে ইতিহাস বলে আফ্রিকায় ফ্রান্সের প্রথম আগমন ঘটে ১৭ শতাব্দীতে। কিন্তু ঊনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীতে তাদের কলোনি সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালের পর থেকে আফ্রিকার ১৪টি দেশ ফ্রান্সের কলোনি ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে দুটি আফ্রিকার দেশের নাম পাওয়া যায়, যে দেশ দুটি কখনো পুরোপুরি কোনো ইউরোপীয় শক্তির কলোনিতে পরিণত হয়নি। এই দেশ দুটি হচ্ছে– ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া।

সারণি : ২

বিংশ শতাব্দীর আফ্রিকা

১৯০৭	:	দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানকল্পে গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন।
১৯১০	:	দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি।
১৯১২	:	ইতালি কর্তৃক লিবিয়া দখল।
১৯১৪-১৮	:	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আফ্রিকা মহাদেশ ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে বণ্টন।
১৯৩৩	:	আফ্রিকাতে প্রথম রাজনৈতিক দলের জন্ম– The Nigerian Youth Movement.
১৯৩৫	:	ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল।
১৯৩৯-৪৫	:	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।
১৯৪১	:	ব্রিটেন কর্তৃক ইথিওপিয়া থেকে ইতালীয়দের বিতাড়ন।
১৯৪২	:	মিশরের El Alamein থেকে ব্রিটেন কর্তৃক জার্মান ও ইতালির বিতাড়ন।
১৯৪৭	:	আফ্রিকায় 'ডি-কলোনাইজেশন' প্রক্রিয়া শুরু।
১৯৪৮	:	দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ রাজনীতি শুরু।
১৯৫১	:	লিবিয়ার স্বাধীনতা।
১৯৫৬	:	মরক্কো, সুদান, তিউনেসিয়ার স্বাধীনতা। নাইজেরিয়াতে তেল আবিষ্কার।
১৯৫৭	:	প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে ঘানার সার্থকতা। গান্ধিবাদী নীতি অনুসরণ করে নক্রুমার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি।
১৯৬১	:	বেলজিয়ামের কাছ থেকে জায়ারের স্বাধীনতা প্রাপ্তি।
১৯৬২	:	ফ্রান্সের কাছ থেকে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা। মধ্য ষাটের দশকে আফ্রিকায় উপনিবেশ যুগের অবসান। প্রায় সব আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি। উগান্ডার স্বাধীনতা।
১৯৬৩	:	Organization of African Unity গঠিত। কেনিয়ার স্বাধীনতা।
১৯৬৪	:	দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার ২৫ বছরের সাজা, জাম্বিয়া ও মালাবির স্বাধীনতা।
১৯৬৭-৭০	:	নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ।
১৯৭৩	:	ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু।
১৯৭৬	:	সুদান ও জায়ারে 'ইবোলা' প্রাণঘাতী রোগের বিস্তার।
১৯৮১	:	HIV রোগের বিস্তার।
১৯৯০	:	নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ।

১৯৯৪ : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা নির্বাচিত। রুয়ান্ডাতে কয়েক লাখ হুতু উপজাতীয় লোকদের হত্যা। কয়েক লাখ লোকের পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয়।

১৯৯৯ : দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকভাবে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৫২-৫৫ : কেনিয়ায় 'মাউ মাউ' (Mau Mau) বিদ্রোহ শুরু।

১৯৫৭ : ঘানার স্বাধীনতা।

১৯৬০ : সেনেগালের স্বাধীনতা।

১৯৬৫ : জাম্বিয়ার স্বাধীনতা।

১৯৬৬ : বতসোয়ানার স্বাধীনতা।

১৯৭১ : উগান্ডায় ইদি আমিন কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

১৯৭৪ : ইথিওপিয়ায় সম্রাট হাইলে সালাসি উৎখাত।

১৯৭৫ : এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের স্বাধীনতা।

১৯৭৯ : ইদি আমিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত।

১৯৮০ : জিম্বাবুয়েতে রবার্ট মুগাবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তি।

১৯৯০ : নামিবিয়ার স্বাধীনতা।

১৯৯৩ : ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা।

১৯৯৭ : জায়ারের নতুন নামকরণ– ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো।

১৯৯৯ : থাবে এমবেকি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নিযুক্তি। ডমিনিকান রিপাবলিক 'দখল'।

১৯৬৭ : বলিভিয়ায় কিউবার বিপ্লবী নেতা চেগুয়েভারাকে হত্যা।

১৯৭০ : চিলিতে সালভাদর আলেন্দে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত। আলেন্দে লাতিন আমেরিকার প্রথম নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট।

১৯৭৩ : চিলিতে সিআইএ সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে আলেন্দে নিহত।

১৯৭৪-১৯৭৬ : ইসাবেলা পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭৬ : জেনারেল ভিদেলা কর্তৃক আর্জেন্টিনার ক্ষমতা গ্রহণ।

১৯৭৭-১৯৮০ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইস্যুকে তাদের নীতি ঘোষণা।

১৯৭৯ : নিকারাগুয়ায় সান্ডানিস্টদের ক্ষমতা গ্রহণ।

১৯৮০ : পেরুতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু (Shining Path)।

১৯৮২ : ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের বিজয়। আর্জেন্টিনায় সেনা শাসনের অবসান।

১৯৮৩ : গ্রানাডার প্রধানমন্ত্রী মৌরিস বিশপের আততায়ীদের হাতে মৃত্যু। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর গ্রানাডায় অবতরণ।

১৯৮৪ : রাউল আলফনসিন (রেডিক্যাল পার্টি) আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত।

১৯৮৮ : চিলিতে গণভোটে পিনোশের পরাজয়। সামরিক শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি।

১৯৮৯ : প্যারাগুয়েতে জেনারেল স্ট্রোসনারোর উৎখাত।

১৯৯০ : নিকারাগুয়ায় নির্বাচনে সান্ডানিস্টদের পরাজয় ও ডায়োলেটা চামোরোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি। চিলিতে সিভিলিয়ান শাসন।

১৯৯২ : এল-সালভাদরে গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৯৪ : যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা North America Free Trade Agreement বা NAFTA স্বাক্ষর। মেক্সিকোর চিরাপাসে Zapatista National Liberation এর বিদ্রোহ।

১৯৯৬ : গুয়েতেমালায় শান্তিচুক্তি।

১৯৯৮ : ইংল্যান্ডে চিলির সাবেক শাসক পিনোশে গ্রেফতার।

১৯৯৯ : পানামা খালের কর্তৃত্ব পানামার কাছে হস্তান্তর।

ফ্রান্স

এখানে বলে রাখা ভালো ফ্রান্স তার কলোনিভুক্ত দেশগুলোর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৮টি দেশকে নিয়ে French West Africa গঠন করেছিল (AOF বা Afrique Occidentale Francaise)। এটা ছিল এক ধরনের ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, ফ্রেঞ্চ সুদান (মালি), ফ্রেঞ্চ গায়ানা (গায়ানা), আইভরি কোস্ট, আপার ভোল্টা (বুরকিনা ফাসো), দাহোমি (বেনিন) ও নাইজার। এর রাজধানী ছিল সেনেগালের ডাকারে। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এই ফেডারেশনের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলের জন্য একজন শাসক তথা গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। আর ১৯০৪ সালে তিনি ওই অঞ্চলের নামকরণ করেন French West Africa। গ্যাবন ও ফ্রেঞ্চ ইকুয়েটরিয়াল আফ্রিকা পরে এই ফেডারেশনে যোগ দেয়। অন্যদিকে অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বল হবার সাথে সাথে মাগরেবভুক্ত দেশগুলো (আরব আফ্রিকান) ফ্রান্স দখল করতে থাকে। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখল করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৮১ সালে তিউনেশিয়া ও ১৯১২ সালে মরক্কো ফ্রান্সের কলোনিভুক্ত হয়। তিউনেশিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬৫ সালে। মরক্কো ১৮৮৪ সাল থেকেই স্পেনের প্রটেকটরেট ছিল। কিন্তু Treaty of Fez (১৯২২) এর মধ্য দিয়ে মরক্কো ফ্রান্সের প্রটেকটরেটে পরিণত হয়।

ব্রিটেন

আফ্রিকায় ব্রিটেনের উপনিবেশ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮৭০ সালের দিকে। ওই সময় যেসব অঞ্চল ব্রিটেনের কলোনির অন্তর্ভুক্ত হয়, ওইসব অঞ্চল আফ্রিকার প্রাচীন কিছু গোত্র বা জাতি-উপজাতি দ্বারা আঞ্চলিকভাবে শাসিত হতো। যেমন বলা যেতে পারে উগান্ডার বুগানদান (Bugandan), দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু (Zulu), জাম্বিয়ার সোনা (Shona) জনগোষ্ঠীর মাবেনে মুতাপা (Mwene Mutapa) উপজাতি সম্প্রদায়, ঘানার আশান্তি (Ashanti), উত্তর নাইজেরিয়ার ফুনালি, লেক সাদ অঞ্চলের কানেম-বরনু (Kanem-Bornu), দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার ইগবো (Igbo) সম্প্রদায়। এরা নিজ নিজ এলাকায় এক ধরনের সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নিজস্ব রাজা দ্বারা শাসিত হতো। ব্রিটেন এইসব দখল করে নিলে দৃশ্যপট বদলে যায়। আফ্রিকার দেশগুলো ব্রিটেনের কলোনিতে পরিণত হবার পর মূলত চারভাবে এই অঞ্চলগুলো শাসন করতো: ১. ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে; ২. পরোক্ষ শাসন; ৩. ঔপনিবেশিকদের শাসন দ্বারা সেখানে আবাসন গড়েছিল; ৪. Condominium শাসন বা সার্বভৌম সরকারের যুগ্ম শাসন।

কলোনিয়াল যুগের প্রথম দিকে ব্রিটেন বেশ কিছু কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয় ওইসব অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করার। যেমন– United African Company, ইউনাইটেড ট্রেডিং কোম্পানি (পশ্চিম আফ্রিকা), Imperial British East African Company ও British South African Company-এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবসা করার। সেই সাথে তাদের শাসনকার্য পরিচালনারও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলো ব্রিটেনকে একটি বড় অর্থ পরিশোধ করতো তাদের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ায়। কোম্পানি স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করতো। Imperial British East Africa Company ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় কেনিয়ায়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তারা শাসনকার্য পরিচালনা করে। British South African Company প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালে। সেসিল জন রোডস (Cecil John Rhodes) ছিলেন এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। এই কোম্পানির আওতাভুক্ত অঞ্চলগুলো ছিল Nyasaland (বর্তমান মালাবি), উত্তর রোডেশিয়া (বর্তমান জাম্বিয়া), দক্ষিণ রোডেশিয়া (বর্তমান জিম্বাবুয়ে)। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল তারা শাসন করে। কোম্পানি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। অন্যদিকে Indirect rule বা পরোক্ষ শাসনের মূল উদ্ভাবক ছিলেন ফ্রেডেরিক লুগার্ড (Frederich Lugard)। এটা ছিল মূলত

স্থানীয় প্রভাবশালীদের দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে গিয়েছিল ব্রিটিশদের হাতে। লুগার্ড প্রথমে উত্তর নাইজেরিয়ার ফুলানি উপজাতিদের দিয়ে এই শাসনব্যবস্থা চালু করেন। সেখানে Sokoto খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই শাসনব্যবস্থা কিছুটা দক্ষিণ নাইজেরিয়াতেও Igbo উপজাতীয়দের মধ্যে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। পরোক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটেন এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা আফ্রিকার সংস্কৃতি তথা মূল্যবাধকে সম্মান করে। সে কারণেই উপজাতি শাসক তথা উপজাতি রাজাদের মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করতে চেয়েছিল। এ কারণেই দেখা যায়, ব্রিটিশ কলোনিয়াল সময়ে স্থানীয় 'চিফ' অর্থাৎ গোত্রপ্রধানদের ব্যবহার করে পরোক্ষভাবে তাদের ক্ষমতা পরিচালনা করেছিল। তবে গোত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, উপজাতিদের মধ্যে হানাহানি, পরবর্তীতে উপজাতিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা কারণে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন পিছিয়ে পড়ে। ব্রিটেন অত্যন্ত কৌশলে এই উপজাতি দ্বন্দ্ব ব্যবহার করে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বেশ কিছুদিন পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া কিংবা ঘানার ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ করেছি।



চিত্র : আফ্রিকার ক্রীতদাস, যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে 'বিক্রি' করা হয়েছিল।

ব্রিটেনের শাসনকার্যের আরেকটা ধারা আমরা লক্ষ করি– আর তা হচ্ছে ব্রিটিশ অভিবাসী, যারা ব্যবসার কারণে আফ্রিকাতে আবাসভূমি গড়েছিল, তাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা। অভিবাসীদের দিয়ে শাসনকাজ পরিচালিত হতে আমরা দেখি দক্ষিণ আফ্রিকায়, জিম্বাবুয়ে কিংবা নামিবিয়ায়। তবে এটা বলতে হবে–এইসব অঞ্চলে শুধু ব্রিটেনের নাগরিকরা যে বসতি স্থাপন করেছিল, তা নয়। বরং হল্যান্ড, জার্মান ও পর্তুগালের অভিবাসীরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে বলা হতো 'Natives'। শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে আলাদা করে দেখা হতো এবং তারাই সব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতো। শত শত বিঘা জমি শ্বেতাঙ্গদের দেওয়া হতো, আর কৃষ্ণাঙ্গরা ওইসব জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে এইসব শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদেরকে ব্রিটেন তার সঙ্গে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। একসময় এইসব শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা নিজেরা ব্রিটেনের কাছ থেকে আলাদা হতে চাইল ও স্বাধীনতা ঘোষণা করল। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এমনটা দেখি। ১৯১০ সালে Boer যুদ্ধের পর (১৮৯৯-১৯০২) ব্রিটেন দক্ষিণ আফ্রিকার নাতাল, কেপ, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রান্সভাল এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের হাতে ছেড়ে দেয়। একই সাথে সোয়াজিল্যান্ড, বাসুটুল্যান্ড (বর্তমানে লেসোথো) ও বেকুয়ানল্যান্ডকে (বর্তমানে বতসোয়ানা) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পৃথক করে। এই অঞ্চলগুলো পরে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করলেও, দেশটি মূলত একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

Condominium শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় এক ধরনের যুগ্ম শাসনব্যবস্থা। সুদানের ক্ষেত্রে মিশর ও ব্রিটেনের যুগ্ম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয় Anglo-Egyptian Sudan। সুদানে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল– আরব এবং আফ্রিকান। আরবরা ছিল সংখ্যালঘু। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদান ও পশ্চিম সুদানের (বর্তমান দারফুর) অধিবাসীরা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সুদানের ইতিহাসকে বারবার কলঙ্কিত করেছে। এমনকি ২০০৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির দারফুরের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বড় ধরনের সংবাদের জন্ম দিয়েছিল। ওই হত্যাকাণ্ডে ৮০ হাজার থেকে ৫ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা সুদানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু আরবদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। অথচ সেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এভাবেই দুই [illegible] মাঝে 'ডিভাইড এন্ড রুল' সৃষ্টি করে তারা

শাসনকার্য পরিচালনা করতো। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীনতা লাভ করে, আর দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে ২০১১ সালের ৯ জুলাই। ২০০৫ সালে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের ১০টি প্রদেশ নিয়ে স্বাধীন দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে সুদানের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে দিয়েই আফ্রিকায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান হতে শুরু করে। ১৯৫৭ সালে ঘানা, ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া, ১৯৬১ সালে তানজানিয়া, ১৯৬৩ সালে কেনিয়া, ১৯৬৪ সালে জাম্বিয়া ও মালাবি, ১৯৬৫ সালে গাম্বিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা জিম্বাবুয়ের মতো দেশে অনেক পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে অনেক আফ্রিকান দেশে বড় ধরনের জাতিগত দ্বন্দ্ব তথা জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো দেশে একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। একদলীয় শাসনও কোনো কোনো দেশে লক্ষ করা যায় (কেনিয়া)।

ইতালি

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পাশাপাশি ইতালি, জার্মানি, স্পেন কিংবা পর্তুগালেরও আফ্রিকাতে কলোনি ছিল। আফ্রিকাতে ইতালির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৩৫ সালের ১৫ জানুয়ারি। ইতালিয়ান সোমালিল্যান্ড থেকে ইথিওপিয়া দখলের মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় ইতালির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৪১ সালে পর্যন্ত ইতালি উত্তর আফ্রিকার যেসব দেশে তাদের উপনিবেশবাদী শাসন সম্প্রসারিত করেছে, তার মাঝে রয়েছে বর্তমানের লিবিয়া, ইথিওপিয়ার কিছু অংশ, ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া। ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির পতন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইতালির উপনিবেশবাদী শাসনের অবসান ঘটে। আফ্রিকাতে ব্রিটেন কিংবা ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক, অর্থাৎ আফ্রিকা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তা নিজ দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়া– এটা ছিল উপনিবেশবাদী শক্তির উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ইতালির উপনিবেশবাদী শক্তির স্ট্র্যাটেজি ছিল একটু ভিন্ন– ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সরকারের শক্তি প্রদর্শন ও বহির্বিশ্বে দেশটির ভাবমূর্তি বাড়ানো। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি লক্ষ করা গিয়েছিল– তা হচ্ছে আফ্রিকার কালো মানুষদের মাঝে খ্রিষ্টান ধর্মের বিস্তার করা। কিন্তু ইতালির উপনিবেশবাদী শক্তিরা ধর্ম বিস্তারের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। উত্তর আফ্রিকায় ইতালির উপনিবেশ বিস্তারকে দু'পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে শুরু হয়েছিল ১৮৯০

সালের পর, সেখানে ইতালির শাসন চালু হয়। ১৯১২ সালে লিবিয়ায় ইতালির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালি ১৮৯৫ সালে ইথিওপিয়ায় আগ্রাসন চালালেও Battle of Adwa'তে ইতালি পরাজিত হয়েছিল। পরে ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় অভিযানে ইতালি ইথিওপিয়া দখল করেছিল, তাও আবার সীমিত সময়ের জন্য। ইতালি লিবিয়া দখলের অভিযান শুরু করে ১৯১১ সালে এবং লিবিয়া থেকে তুরস্ককে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। তুরস্ক লিবিয়া দখল করে রেখেছিল। লিবিয়া তুর্কদের উৎখাত করলেও, ১৯৩২ সাল পর্যন্ত আরব লিবিয়ানদের কাছে ইতালির কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। ইতালির দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ওমর মুখতারের নেতৃত্বাধীন সানুসি (Sanussi) আন্দোলনের কথা অনেকেই জানেন। ইতালি ওমর মুখতারকে ফাঁসিতে চড়িয়ে হত্যা করেছিল। ১৯০৫ সালে সোমালিয়ায় ইতালির শাসন চালু হয়। এই দেশে ইতালি অবশ্য একটা ভালো কাজ করেছিল। তারা সোমালিয়ায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। তবে তারা এক ধরনের 'বর্ণবাদী' শাসন সেখানে চালু করে। ইরিত্রিয়ায়ও তারা ওই বর্ণবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। রাজধানী আসমারাতে তারা তিনটি 'জোন' প্রতিষ্ঠা করে। একটি 'জোন' শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্ধারণ করা হয়, একটি 'জোন' শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য এবং তৃতীয় 'জোন'টি নির্ধারিত থাকে মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্য। এই তিন ব্যবস্থা আমরা বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায়ও দেখেছিলাম। এখানে একটা কথা বলা দরকার–ইতালিতে ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ট পার্টি ও মুসোলিনির ক্ষমতা গ্রহণের পর আফ্রিকার ব্যাপারে ইতালির দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পালটে যায়। তারা দখলিকৃত কলোনিগুলোর ব্যাপারে একটি বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ করে। ইরিত্রিয়াতে ১৯৩৩ সালে ও ইথিওপিয়ায় ১৯৩৭ সালে মিশ্র বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ওই সময় ফ্যাসিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আচিলি স্টারেস (Achille Starace) বলেছিলেন, "With the creation of the Empire, the Italian race came into contact with other races. Hence it had to guard itself against hybridity and contamination"। তবে অনেক ইতিহাসবিদের মতে ইতালির এই 'বর্ণবাদ' জার্মানির বর্ণবাদের চাইতে কিছুটা ভিন্ন ছিল। জার্মানিতে হিটলার ইহুদিদের ব্যাপারে যে আচরণ করেছিলেন, মুসোলিনি তা করেননি। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী দর্শনের সাথে ইতালির উপনিবেশবাদী দর্শনের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে Encyclopedia-তে মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে "Italian colonialism in Africa, motivated largely by the desire to enhance the historic glory of Italy and to help Italy find its "Place in the Sun" along with other colonial powers, forced Italians to think about racial difference, and many Italians came to accept racial difference to some degree, even though they may have treated their colonial subjects well"।

পর্তুগাল

তুলনামূলক বিচারে আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশ বিস্তারের কাহিনি অনেক পুরানো। আজকের পশ্চিম আফ্রিকায় যে অঞ্চলটি গিনি বিসাও নামে পরিচিত, ১৫০০ সালের দিকে পর্তুগাল এখানে তাদের কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। একই সাথে একই সময় আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের মোজাম্বিক ও এঙ্গোলায়ও কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্তুগালের আফ্রিকায় কলোনি প্রতিষ্ঠার একটা উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চল থেকে 'দাস' সংগ্রহ করে তা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করে দেওয়া। যদিও পশ্চিম আফ্রিকার খনি থেকে সোনা সংগ্রহ করার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ ছিল। বর্তমানে ৫টি দেশে পর্তুগিজ ভাষা ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে এইসব দেশগুলো এক সময় পর্তুগালের কলোনি ছিল। দেশগুলো হচ্ছে–এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাও, কেপ ভার্দে, সাওটমো এবং প্রিনসিপে ইকুয়েটরিয়াল গায়ানা।

ইতিহাস বলে এঙ্গোলা পর্তুগালের কলোনিতে পরিণত হয় ১৫৭৫ সালে। বলা হয় Paulo Dias de Novais তার চারশত সৈন্য ও প্রায় একশ পরিবার নিয়ে এদেশে আসেন এবং দেশটিকে পর্তুগালের উপনিবেশ শক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় দেশটি পর্তুগালের কলোনি থাকলেও ১৬৪১ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত দেশটি Dutch West India Company'র আওতাধীনে চলে যায়। ১৬৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পুনরায় দেশটি পর্তুগালের কলোনিতে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালে দেশটিকে পর্তুগালের একটি প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। অন্যদিকে ১৫০৫ সালের দিকে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো দ্যা গামার এ অঞ্চলে আগমনের (১৪৯৮) মধ্য দিয়ে মোজাম্বিক পর্তুগালের কলোনিতে পরিণত হয়। চারশ বছরের উপরে দেশটি পর্তুগালের কলোনি ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে দুটি কোম্পানি Mozambique Company ও Niassa Company'র হাতে কিছু এলাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালে Mozambique কোম্পানি তার কর্তৃত্বভার পর্তুগাল সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়।

মোজাম্বিকের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটো দিক আছে, যা স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথমটি হচ্ছে খোদ পর্তুগালে *Movimento das Forcas Armadas (MFA)* নামে সেনাবাহিনীর বামপন্থি অফিসারদের

নেতৃত্বে সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান (২৪ এপ্রিল, ১৯৭৪) Estado Novo সরকারের পতন ঘটায়। MFA কলোনিদের ব্যাপারে পর্তুগালের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে *Front for the Liberation of Mozambique (FRELIMO)* নামে একটি বামপন্থি সংগঠনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন।* MFA মোজাম্বিকের স্বাধীনতা দেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং Lusaka Accord অনুযায়ী FRELIMO সংগঠনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। এভাবেই মোজাম্বিক স্বাধীন হয়। উনিশ শতকে পর্তুগাল গিনি বিসাওকে তাদের কলোনির অন্তর্ভুক্ত করে। দেশটি ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ও ১৯৭৪ সালে তা স্বীকৃত হয়। গায়ানা নামে আরেকটি দেশ থাকায় (ফ্রান্স গায়ানা) গিনি রাজধানী বিসাও এর নাম দেশটির সাথে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দের কলোনিয়াল ইতিহাস অনেক পুরানো। ১৯৬২ সালে দেশটিতে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৭৫ সালে।

জার্মানি

আমরা আফ্রিকায় জার্মানির কলোনিগুলো নিয়েও আলোচনা করতে পারি। অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মতো আফ্রিকায় জার্মানির কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমানে স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিত বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, নামিবিয়া, রুয়ান্ডা, তানজানিয়া ও টোগোতে। আফ্রিকার Great Lakes অঞ্চলে জার্মানি তার কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল যা German East Africa নামে পরিচিত। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা ও তানজানিয়ার কিছু অংশ। German East Africa Company'র বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে ১৮৮০ সালের দিকে জার্মান সেনাবাহিনী সেখানে পাঠানো হয়। আর এভাবেই ওই অঞ্চলে জার্মানি তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পরপরই এই উপনিবেশের পতন ঘটে। বলা হয় লীগ অব নেশনস এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী জার্মানি এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও পর্তুগালের হাতে ছেড়ে দেয়। তবে গ্রেট লেক এলাকায় জার্মান কলোনির গোড়াপত্তন করেছিলেন জনৈক কার্ল পেটারস, যিনি ওই অঞ্চলের স্থানীয় গোত্রপ্রধানদের একত্রিত করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Society for German Colonization নামে একটি সংগঠন। ১৮৮৫ সালের ৩ মার্চ তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর অটোভন বিসমার্ক একে স্বীকৃতি দেন। তার স্বীকৃতির ফলেই ওই অঞ্চল জার্মানির Protectorate এ পরিণত

* FRELIMO ও পর্তুগিজ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।

হয়। যদিও জাঞ্জিবারের সুলতানের তাতে আপত্তি ছিল। এক পর্যায়ে জার্মান চ্যান্সেলর সেখানে জার্মান সেনাবাহিনী পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন (৭ আগস্ট ১৮৮৫)। নামিবিয়া বর্তমানে একটি স্বাধীন দেশ হলেও, এক সময় দেশটি জার্মানির কলোনি ছিল। নামিবিয়া এক সময় দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলটি ১৮৮৪ সালে জার্মানির Protectorate বা আশ্রিত রাজ্যে এবং ১৮৯০ সালে কলোনিতে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় দেশটি। পরে লিগ অব নেশনস এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার নিয়ন্ত্রণে থাকে দেশটি। ১৯৯০ সালে নামিবিয়া স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্যামেরুন জার্মান কলোনির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস বলে আফ্রিকার এই দেশটি ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার পরিচিতি ছিল German Cameroon হিসেবে। ওই সময় গ্যাবনের উত্তরাঞ্চল, কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের পশ্চিম অংশ, চাদ এর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যবসার প্রয়োজনেই জার্মানরা ক্যামেরুন নদী ও অউরি (Wouri) নদীর অববাহিকায় বসতি গড়েন। ইতিহাস থেকে জানা যায় C. Woermann ও Wilhelm Jantzen নামে দুই ব্যক্তি Jantzen and Thormaehlen নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন (১৮৮৪), যা জার্মান কলোনির গোড়াপত্তন ঘটায়। এই কোম্পানি স্থানীয় উপজাতি নেতাদের সাথে সখ্য গড়ে তোলে এবং এই এলাকায় কলার বাগান তৈরি করে। ধীরে ধীরে এখানে জার্মান ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। একসময় চ্যান্সেলর বিসমার্কও এই অঞ্চলে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেন। বার্লিন সম্মেলনে ক্যামেরুনকে আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ১৯১১ সালের মধ্যে New Cameroon এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। জার্মানরা এই অঞ্চলের রেল যোগাযোগ ও ডাক যোগাযোগের উন্নতি ঘটায়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই জার্মান কলোনিতে সামরিক অভিযান চালায় (১৯১৪) এবং অঞ্চলটি তাদের দখলে চলে যায়। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মান ক্যামেরুনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়– ব্রিটিশ ক্যামেরুন ও ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুন। ১৯৬১ সালে আবার দুই ক্যামেরুন একত্রিত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অপর দেশ টোগো, ১৮৮৪ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন এর নাম ছিল টোগোল্যান্ড। টোগোর রেল ব্যবস্থাপনা জার্মানদের তৈরি। ১৯০৫ সালে জার্মানরা প্রথম Lome থেকে Ancho পর্যন্ত রেলপথ চালু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর টোগোর শাসনভার

চলে যায় ফ্রান্সের কাছে। দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, German East Africa'র আওতায় তানজানিয়াও ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় তানজানিয়া ১৮৮০ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শাসন করেছে জার্মানরা। মূলত ব্যবসা এবং ফসল উৎপাদনের জন্য জার্মানরা এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল। তারা এখানে তুলা উৎপাদন করতো। বার্লিন সম্মেলনে যেভাবে আফ্রিকাকে বিভক্ত করা হয়েছিল, তাতে আজকের তানজানিয়া ও তৎকালীন তানজানিকা জার্মানদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা তানজানিকা শাসন করে। এখানে বলা ভালো ১৯৬৪ সালে তানজানিকা ও পার্শ্ববর্তী জানজিবার একত্রিত হয়ে United Republic of Tanganyika and Zanzibar নাম ধারণ করে। পরে তানজানিয়া নামেই দেশটি পরিচিতি পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মূলত ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও ব্যবসায়িক কারণেই আফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই কলোনিয়াল শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে।

বেলজিয়াম

আফ্রিকায় বেলজিয়াম কলোনির ইতিহাস দেখা যায় মাত্র দুই দেশে। ১৯০৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বেলজিয়ান কঙ্গো ও ১৯২২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি। বর্তমানে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো নামে যে দেশটি পরিচিত, মধ্য আফ্রিকার এই দেশটি বেলজিয়ামের কলোনি ছিল ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। তখন এর পরিচিতি ছিল বেলজিয়ান কঙ্গো। উনিশ শতকের শুরুতে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ২ মধ্য আফ্রিকার Congo Basin এলাকায় তার সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যোগ নেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই সময় এই এলাকায় তিনি ব্যক্তিগত এই কলোনি প্রতিষ্ঠা করেন, যার পরিচিতি ছিল Congo Free State হিসেবে (১৮৮৫)। কিন্তু তার ব্যক্তিগত বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন চরম পর্যায়ে উন্নীত হলে রাজার ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বেলজিয়াম সরকার রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত Congo Free State-কে রাষ্ট্রের একটি কলোনিতে পরিণত করে ১৯০৮ সালে। এই অঞ্চলটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকরা উৎসাহিত হয়। বেলজিয়াম একজন গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে Belgian Congo নামে পরিচিত এই অঞ্চলটি শাসন করতো। ১৯০৮-১৯১০ সাল পর্যন্ত Theophile Wahis ছিলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল ও ১৯৫৮-১৯৬০ সময়সীমায় সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন Hendrik Corneils।

রাজার কাছ থেকে এই অঞ্চলের প্রশাসনের ভার বেলজিয়াম সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ায় এই অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন হয় এবং একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়। এই শিক্ষিত শ্রেণির মাঝে বামপন্থি চিন্তাধারা তথা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সমর্থকদের প্রভাব বেশি ছিল। ফলে দেখা যায় মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে দেশটি স্বাধীন হয়। ওই সময় প্যাট্রিক লুমুম্বা (Patric Lumumba) স্বাধীনতা পরবর্তী কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। লুমুম্বা ছিলেন গোটা আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রতীকস্বরূপ। তিনি সীমিত সময়ের জন্য (২৪ জুন ১৯৬০ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬০) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। গৃহযুদ্ধের কারণেই তার মৃত্যু হয়। কঙ্গোর স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল *Congolese National Movement (MNC)*। MNC'র জন্ম ১৯৫৮ সালে। লুমুম্বা ছিলেন এর প্রধান।

কঙ্গোতে বেলজিয়ামের কলোনিয়াল শাসনের অবসান ও ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরই দেশটি গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কঙ্গোর একটি প্রদেশ কাতাঙ্গা বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মোসে শোম্বে (Mosie Tshombe) ছিলেন এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা। অভিযোগ আছে বেলজিয়াম সরকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উসকে দিয়েছিল। লুমুম্বা ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু প্রত্যাশিত সেই সাহায্য পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে লুমুম্বা তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য কামনা করেন। লুমুম্বার এই সিদ্ধান্ত ওই সময়কার দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাসা-ভুবু (Joseph Kasa-Vubu) ও সেনাপ্রধান মবুতোর (Josep-Desire Mobutu) মধ্যকার দ্বন্দ্ব তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম লুমুম্বার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীলতাকে ভালো চোখে দেখেনি। কাতাঙ্গা বিদ্রোহ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে লুমুম্বার সরকারের পতন ঘটে, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ফায়ারিং স্কোয়াডে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। লুমুম্বার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মবুতুর নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবীরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। লুমুম্বা পরবর্তী সময়ে মবুতু পর্দার অন্তরালে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং ১৯৬৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি দেশটির নামকরণ করেন জায়ার (Zaire)। মবুতু ক্ষমতা থেকে উৎখাত হন ১৯৯৭ সালের মে মাসে। ল্যারেট কাবিলা তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন। ২০০১ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

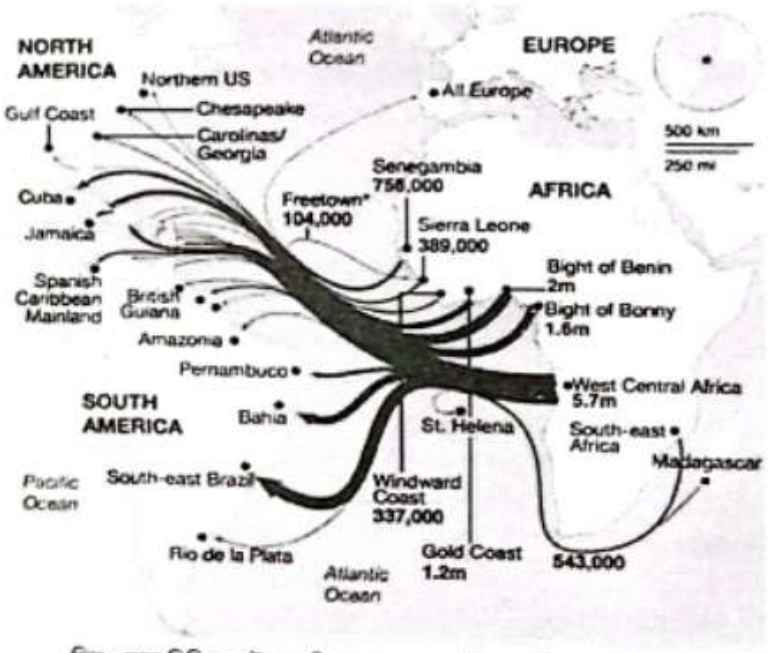
আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যে ক'জন ব্যক্তির নাম বার বার উচ্চারিত হয়, তার মাঝে লুমুম্বার নাম অন্যতম। তিনি আফ্রিকা– জুড়ে প্যান-আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। তার হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। ২০০২ সালে বেলজিয়াম লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

জার্মান আফ্রিকান কলোনিয়াল ইতিহাস আলোচনা করলে রুয়ান্ডা-বুরুন্ডির কথাও বলা যায়। এই অঞ্চলটি জার্মান ইস্ট আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯৯ সালে রুয়ান্ডা জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং তৎকালীন রুয়ান্ডার শাসক মুসিনগা'র (King Musinga) মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশটি শাসন করতো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর জাতিপুঞ্জের ম্যান্ডেট অনুযায়ী রুয়ান্ডা বেলজিয়ামের শাসনের আওতায় আসে। বেলজিয়ামের শাসনাধীন থাকার সময় এই অঞ্চলের হুতি ও তুতসি সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ জিইয়ে রেখে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতো। ১৯৬২ সালে দেশটি বেলজিয়ামের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। একই সময় বুরুন্ডিও স্বাধীন হয়।

স্পেন

আমরা আফ্রিকায় স্পেনের কলোনিগুলো নিয়েও আলোচনা করতে পারি। তুলনামূলক বিচারে আফ্রিকায় স্পেনের প্রভাব ছিল কম। ১৯৬৮ সালে স্পেন ইকুয়েটরিয়াল গায়ানা (Equatorial Guinea) ও ১৯৭৫ সালে পশ্চিম সাহারার (Western Sahara) ওপর তার কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আটলান্টিক মহাসাগর ঘেঁষে মরক্কো ও পশ্চিম সাহারা এলাকাটি এক ডিক্রি বলে ১৯৪৬ সালের ২০ জুলাই Spanish West Africa'র অন্তর্ভুক্ত হয়। Ifni (মরক্কো) ও সাহারা (Shahara) একত্রিত করে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের Ifni War এর পর স্পেন Ifni অঞ্চলকে মরক্কোর সাথে একত্রিত করে এবং ১৯৫৮ সালে Ifni ও Shara-কে দুটি আলাদা প্রদেশে পরিণত করে। তবে মরক্কো স্পেনের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল অনেক আগে। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যকার একটি চুক্তির ফলে ১৯১২ সালের ২৭ নভেম্বর মরক্কো স্পেনের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তবে মরক্কোর এক অংশে ফ্রান্সেরও প্রভাব ছিল। ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স মরক্কোতে তার আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা প্রত্যাহার করে নেয়। স্পেনও সদ্য গঠিত মরক্কো রাজতন্ত্রের কাছে তার 'ক্ষমতা' অর্পণ করে। তবে Ifni ও পশ্চিম সাহারার ব্যাপারে তার দাবি অব্যাহত রাখে। ১৮৮৪

সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম সাহারা স্পেন শাসন করেছে। মরক্কোর অব্যাহত দাবি ও আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্পেন পশ্চিম সাহারা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। পশ্চিম সাহারার স্থানীয় আদিবাসী Sahrawi সম্প্রদায় ও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী Polisario Front এর দাবিও ছিল সেই সময়। ১৯৬৬ সালে মরক্কো স্বাধীন হলে পশ্চিম সাহারার উপর তাদের দাবি অব্যাহত রাখে। একই সাথে মৌরিতানিয়াও এ অঞ্চলের ওপর তাদের দাবি তোলে। তবে ১৯৭৯ সালের পর তাদের দাবি পরিত্যাগ করে।



চিত্র : দাস বিক্রির রুট : আফ্রিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকা।

Polisario Front এ অঞ্চলকে নিয়ে Sahrawi Arab Democratic Republic নামে নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। অন্যদিকে Equatorial Guinea বা Spanish Guinea সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে মধ্য আফ্রিকার এই অঞ্চলটি, যা গালফ অব গায়ানার (Gulf of Guinea) অববাহিকায় ১৭৭৮ সালে স্পেন তার কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ সময় দেশটি স্পেনের কলোনি ছিল। ১৯৬৪ সালের পর থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত দেশটি স্পেন কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন গভর্নর বা Commissioner General দ্বারা

শাসিত হতো। স্পেনের শাসন আমলে বিংশ শতাব্দীতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। এক. ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে সময়কাল, সেই সময়কালে স্প্যানিশ গায়ানার স্ট্যাটাস 'কলোনি' থেকে পরিবর্তন করে 'প্রদেশ' হিসেবে উন্নীত করা হয়। দুই. ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যে সময়সীমা, ওই সময়সীমায় 'ডি-কলোনাইজেশন' প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং স্পেন এই 'প্রদেশের' কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের অনাগ্রহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। তিন. ১৯৬৮ সালের ১২ অক্টোবর স্পেন ইকুয়েটরিয়াল গায়ানার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

হল্যান্ড

আফ্রিকাতে কলোনিয়াল ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে সংগত কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নটি চলে আসবে। দক্ষিণ আফ্রিকা একসময় হল্যান্ডের কলোনি ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে হল্যান্ড সতেরো শতকে এই অঞ্চলে তার কলোনি গড়ে তুলেছিল। এটা ঠিক কলোনি গড়ার ক্ষেত্রে গর্তুগাল ছিল প্রথমে, দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল হল্যান্ড। পর্যায়ক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়। বিংশ শতাব্দীতে হল্যান্ড অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে কলোনি গড়ার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে দেশটি আফ্রিকায় কোথাও সেনাবাহিনী পাঠায়নি, বরং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে হল্যান্ডের কলোনি বিস্তৃত হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলোই আফ্রিকায় হল্যান্ডের স্বার্থ দেখাশুনা করতো। এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান ছিল The Dutch East India Company। ১৬০২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে মসলা ব্যবসার সাথে এই কোম্পানিটি জড়িত ছিল। ডাচ ভাষায় এর নাম ছিল *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*। হল্যান্ড হয়ে সুদূর ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া যাবার পথে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রবর্তী অঞ্চল Cape of Good Hope কে 'বিশ্রামস্থল' (কেউ কেউ দুর্গ বলেছেন) হিসেবে বেছে নেয়। Jan Van Riebeck ছিলেন এর নেতৃত্বে। Riebeck ছিলেন একজন ডাচ 'নেভিগেটর' ও কলোনিয়াল প্রশাসক। পরে তাদের দুর্গ সরিয়ে নেওয়া হয় Cape Town এ। ওই সময় কেপটাউন এলাকায় যেসব স্থানীয় আদিবাসী বসবাস করতো, তাদেরকে বলা হতো *Khoikhoi*, ডাচ ব্যবসায়ীরা এদের নাম দিয়েছিল *Hottentots*। ডাচ ব্যবসায়ী ও তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর সাথে Khoikhoi এর সংঘর্ষের খবর ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এভাবেই ডাচ নাগরিকরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি গড়ে। তারা নিজেদেরকে পরিচয় দিত Afrikaners হিসেবে। তারা এ অঞ্চলে ডাচ ভাষারও প্রচলন করেন, যা আজও সেখানে চালু রয়েছে। পরবর্তীতে আঠারো শতকে ব্রিটিশরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি

গড়ে তোলে। পরবর্তীতে আরো একটি কোম্পানি Dutch West Indian Company গঠন করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কলোনি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটিও বড় অবদান রাখে।

Worldatlas এর মতে দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, বরং আজকের ঘানায় ষোলো শতকে প্রথম ডাচ কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা কি না ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে Dutch Gold Coast হিসেবে। তারাও স্বর্ণ ও দাস ব্যবসা করতো। Dutch Gold Coast এর পতন ঘটে ব্রিটেনের কাছে ১৮৭২ সালে। ঘানায় পর্তুগিজরা Fort Elmina প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৪৮২ সালে, যা ডাচরা দখল করে নেয় ১৬৩৭ সালে। ডাচরা ১৮৭২ সালে এই দুর্গের দায়িত্বভার অর্পণ করে ব্রিটেনের হাতে। কিন্তু ডাচরা এইসব অঞ্চলে কোনো কলোনিয়াল শাসন প্রবর্তন করেনি। শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তারা কলোনিয়াল শাসন প্রবর্তন করেছিল। কেপটাউনে ১৬৫২ সালে তারা এটি প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত তাদের দখলে রাখে। ব্রিটিশরা এটা দখল করে নিলেও ১৮০৩ সালে ডাচরা তা পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ১৮০৬ সালে আবার তা ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়।

ডাচ কলোনিয়াল প্রভুরা Cape এ তাদের দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠার পর ১৬৫৭ সালের দিকে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ কিছু অভিবাসীকে (Free Burghers) একাধিক কৃষি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে ডায়মন্ড ও ১৮৮৪ সালে স্বর্ণ খনি আবিষ্কারের পর এই অঞ্চলে ব্যাপক শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীর আগমন ঘটে। এভাবে কলোনিয়াল শাসন সম্প্রসারিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যত্র। ১৮৩৫ সালের দিকে কৃষি ফার্মের মালিক, যারা Boers নামে পরিচিত (অর্থাৎ ডাচ ভাষায় কৃষক), তারা আজ যে অঞ্চল Free State ও Kwazulu-Natal নামে পরিচিত, সেখানে তাদের ফার্ম সম্প্রসারিত করেন। আর এভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র শ্বেতাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

Boer'রা এই অঞ্চলে আলাদা প্রদেশও প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে First Anglo Boer War (১৮৮০-১৮৮১) ও Second Boer War (১৮৯৯-১৯০২) এর খবরও আমরা জানি। ব্রিটিশ অভিবাসীদের সাথে Boer বা তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এই যুদ্ধে তারা জড়িয়ে গিয়েছিল। Anglo-Zulu War, 1879 এর খবরও ইতিহাসে আছে। এখানে বলা ভালো, ১৭৯৪ সালে Dutch East India Company দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ১৭৯৫ সালে ব্রিটিশরা অঞ্চলটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ১৭৯৫ সালেই ডাচরা আত্মসমর্পণ করে যা চিহ্নিত হয়ে আছে Capitulation of Rustenburg হিসেবে। সংক্ষেপে বললে বলা যায় ১৬৫২-১৮১৫ সময়কাল ছিল ডাচদের নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ এই সময়সীমায় দক্ষিণ আফ্রিকা ডাচদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৮১৫-১৯১০ সময়কাল ছিল ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসন ও Boer Republic এর শাসন। আজকের যে দক্ষিণ আফ্রিকা, তার জন্ম ১৯১০ সালের ৩১ মে। South Africa Act 1909 ছিল এর ভিত্তি। এর মধ্য দিয়ে ওই সময়কার ব্রিটিশ কলোনিগুলোকে (Cape Colony, Colony of Natal, Transvaal Colony ও Orange River Colony) একত্রিত করা হয়েছিল এবং স্বশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্ম হয়েছিল। দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৩৪ সালে। এর পর ১৯৬১ সালের ৩১ মে সেখানে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং Republic of South Africa'র জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, এইসব পরিবর্তনের পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর কোনো ভূমিকা ছিল না। শুধুমাত্র ১৯৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল সাধারণ নির্বাচনে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিজয়ের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত বিচারে শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটে ও কৃষ্ণাঙ্গ শাসন প্রবর্তিত হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, French Guiana, Mauritius, Surinam –এও ডাচ কলোনিয়াল শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। ডাচরা আজকের যে মরিশাস তা আবিষ্কার করেছিল এবং ১৬৩৮ থেকে ১৭১০ পর্যন্ত দেশটি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তবে আবিষ্কারের প্রথম ৪০ বছর সেখানে কোনো বসতি গড়ে ওঠেনি। ১৬৩৮ সালে কর্নেলিয়াস গোয়ের (Cornelius Gooyer) এখানে বসতি গড়ার উদ্যোগ নেন। ফ্রান্স দেশটি শাসন করে ১৭১০ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত। এর পর এখানে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হয় (১৮১০-১৯৬৮)। ১৯৬৮ সালে দেশটি স্বাধীন হয়।

মূল্যায়ন

আফ্রিকার কলোনিয়াল ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এক. ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কলোনি আফ্রিকায় সম্প্রসারণের ব্যাপারে ব্যবসায়িক স্বার্থ কাজ করেছে বেশি। বিশেষ করে স্বর্ণ, হীরাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল সম্ভার ছিল আফ্রিকাতে। ইউরোপের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করা হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। দুই. প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কলোনিয়াল শক্তিগুলো প্রথমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। পরে তারা সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। তিন. পুরো আফ্রিকা কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিংবা কোন ইউরোপীয় শক্তিকে কোন অঞ্চল শাসন করতে দেওয়া হবে, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল বার্লিন সম্মেলনে। বার্লিন সম্মেলনেই আফ্রিকাকে ভাগ করা হয়েছিল। চার. যুক্তরাষ্ট্র বার্লিন সম্মেলনে যোগ দিলেও, আফ্রিকাতে তাদের কোনো কলোনি

স্থাপন করেনি। একই কথা প্রযোজ্য রাশিয়ার ক্ষেত্রেও। নরডিকভুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত ডেনমার্ক, নরওয়ে-সুইডেন বার্লিন সম্মেলনে যোগ দিলেও, এই দেশগুলো কোনো কলোনি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়নি। পাঁচ. আফ্রিকায় ব্যাপক ঔপনিবেশিকীকরণের ফলে সেখানকার সংস্কৃতিতে বড় পরিবর্তন আসে। স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি হারিয়ে যায়। যে কারণে দেখা যায় সেখানে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি, পর্তুগিজ, এমনকি সীমিত পরিসরে জার্মান ভাষা এখনও ব্যবহার হয়। কলোনিয়াল শাসনের ফলে স্থানীয় অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষার মৃত্যু ঘটেছে। ছয়. আফ্রিকায় উপনিবেশবাদ বিস্তারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যে কলোনি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বেলজিয়ামের রাজাই একমাত্র শাসক, যিনি আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাত. কলোনিয়াল ইতিহাসের একটা কালো অধ্যায় হচ্ছে–পর্তুগালই প্রথম একমাত্র দেশ, যে দেশটি আফ্রিকা থেকে 'দাস' ব্যবসা প্রবর্তন করেছিল। পরে ডাচরাও দাস ব্যবসায় জড়িয়ে যায়। শত শত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে পর্তুগালের ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছিল। অন্য কোনো ইউরোপিয়ান শক্তিকে দাস ব্যবসা করতে দেখা যায়নি। আট. একাধিক ইউরোপীয় শক্তি আফ্রিকায় তাদের শক্তিবৃদ্ধি করলেও প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খুব কম ক্ষেত্রেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, এমনটা দেখা যায়নি। নয়. আফ্রিকার কলোনিয়াল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সেখানে বেশ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের জন্ম হয়েছে, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাদেরকে আজও মানুষ স্মরণ করে তাদের ভূমিকার জন্য। এদের মাঝে রয়েছেন জুমো কেনিয়াত্তা (কেনিয়া), নক্রুমা (ঘানা), জুলিয়াস নায়ারে (তানজানিয়া), লিওপোল্ড সেংঘর (সেনেগাল), প্যাট্রিক লুমুম্বা (কঙ্গো)। এমনকি নেলসন ম্যান্ডেলাও (দক্ষিণ আফ্রিকা) আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন।

আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিগুলোর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা কখনোই গবেষকদের কাছে প্রশংসিত হয়নি। বরং আফ্রিকার সম্পদ লুটপাট করে নিজেদের শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখা, কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়নে আদৌ কোনো ভূমিকা না রাখার জন্য ইউরোপের কলোনিয়াল শক্তিগুলো বারবার সমালোচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্রে (Joshua Dwayne Settles, *The Impact of Colonialism on African Economic Development*, 1996) কীভাবে আফ্রিকান দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষক Joshua Dwayne Settles মন্তব্য করেছেন এভাবে 'Had colonialism never been

imposed on Africa, its development would be significantly different and many of the problems that plague it today would not exist'। UNESCO-এর উদ্যোগে General History of Africa প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। উক্ত গবেষণায় ঘানার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Adu Boahen তার লিখিত একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, the colonial rulers had one principal end in view, the ruthless exploitation on the resources of Africa, for the sole benefit of colonial powers and there mercantile, mining and financial companies in the metropolitan countries। অন্যদিকে Roland Oliver ও J. D. Fage'র মতো গবেষকরা কলোনিয়াল শাসনকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাদের মতে– কলোনিয়াল শাসন আফ্রিকাতে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' করেছে ও 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে ইউরোপিয়ানরা ছিলেন 'Colonizer', আর আফ্রিকান জনগোষ্ঠী 'colonized'। এদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট–একপক্ষ শাসক, অন্যপক্ষ শাসিত। শাসকরা সবসময় তাদের স্বার্থ দেখে। ইউরোপিয়ানরাও আফ্রিকায় তাদের স্বার্থ দেখেছে। Martin Chemberlin (2010) তার গ্রন্থ *The Scramble for Africa*-তে উল্লেখ করেছেন 'the European powers divided the African continent into colonies for themselves that led to artificial creation of national boundaries. The boundaries were arbitrary and the locals were not consulted or taken into consideration. A boundary could run through the middle of one community and several communities with different cultural practices were under one colony'। বাস্তবতা হচ্ছে এটাই। কলোনিয়াল প্রভুরা নিজেদের স্বার্থেই আফ্রিকান কমিউনিটিকে বিভক্ত করেছিল। যার ফলে আফ্রিকার দেশগুলো তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। বাস্তবিক অর্থেই আফ্রিকায় কলোনিয়াল শাসন প্রবর্তনের ফলে তাদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এর একটা নেতিবাচক প্রভাব আজও অনুভূত হয়। কাঁচামালে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকা আজও পিছিয়ে আছে।

লাতিন আমেরিকা

বিশ্বরাজনীতিতে লাতিন আমেরিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। লাতিন আমেরিকা বলতে আমরা এখানে বুঝবো মেক্সিকোসহ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা নর্থ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত। এই দেশ দুটির পরিচিতি আলাদা। লাতিন আমেরিকার আলোচনায় এই দেশ দুটির ইতিহাস আলোচিত হয়নি।

৭ দশমিক ৪১২ মিলিয়ন বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট লাতিন আমেরিকার স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৩৩টি। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী পুরো লাতিন আমেরিকার জনগোষ্ঠী ৫৩৯ মিলিয়ন। আর এই দেশগুলোর মোট জিডিপির পরিমাণ ৫৫,৭৩,৩৯৭ মিলিয়ন ডলার, পিপিপিতে (ক্রয় ক্ষমতা) যার পরিমাণ ৭৫,৩১,৫৮৫ মিলিয়ন ডলার। ১৮৫৬ সালে *"Initiative of the Americas. Idea for a Federal Congress of the Republics"* শীর্ষক এক সম্মেলনে প্রথমবারের মতো লাতিন আমেরিকা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। চিলির রাজনীতিবিদ ফ্রান্সিসকো বিলবাও (Francisco Bilbao) এই শব্দটি ব্যবহার করেন, যা পরবর্তীতে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নও ব্যবহার করেন। ভৌগোলিকভাবে চারটি অঞ্চল নিয়ে লাতিন আমেরিকা গঠিত। এগুলো হচ্ছে মেক্সিকো, পেরু, ব্রাজিল ও ক্যারিবিয়ান। বিশাল এক অঞ্চল নিয়ে গঠিত লাতিন আমেরিকা। এখানে এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ক্যারিবীয় অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে ব্রাজিল কিংবা মেক্সিকোর সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। ভাষাগত অমিল লক্ষ করা যায়; যেমন– ব্রাজিলের মানুষ পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলেন, আর মেক্সিকোর ভাষা স্প্যানিশ। আবার ক্যারিবীয় অঞ্চলের ভাষা ইংরেজি। মূলত চারটি কলোনিয়াল শক্তি পর্তুগাল, ব্রিটেন, স্পেন ও ফ্রান্সের কলোনি ছিল এই অঞ্চলের দেশগুলো। ফলে কলোনিয়াল শক্তির প্রভাবে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আসে। এক সময় এ অঞ্চলের যে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল, তাও হারিয়ে যায়। পেরুর সভ্যতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হলেও, কালের বিবর্তনে এই সভ্যতার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় এই অঞ্চলের দেশগুলোকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকা। ভাষাগত কারণে এই দেশগুলোকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়– Hispanic America, Portuguese America এবং French America। নিচে এই বিভক্তি দেখানো হলো :

দক্ষিণ আমেরিকা	:	আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা।
মধ্য আমেরিকা	:	কোস্টারিকা, এল সালভাদর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, পানামা।
ক্যারিবিয়ান	:	কিউবা, গুয়াদেলোপ*, হাইতি, মার্টিনিক*, পুয়ের্তোরিকো, সেইন্ট বারথেলেমি*, সেইন্ট মার্টিন।
উত্তর আমেরিকা	:	মেক্সিকো, সেইন্ট পিয়েরে ও মিকোলেন।*

* এই অঞ্চলগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়।

Hispanic America বলতে বোঝায় স্প্যানিশ ভাষাভাষী দেশগুলো। যেমন : আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, পুয়ের্তোরিকো, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা। *Portugese America* বলতে বোঝায় পর্তুগিজ ভাষাভাষী দেশগুলো। যেমন : ব্রাজিল, উরুগুয়ের শহর Colonia do Sacramento, ভেনিজুয়েলার Guanare। *French America* বলতে বোঝায় ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী দেশগুলো ও অঞ্চল। যেমন : ডমিনিকা, হাইতি, সেইন্ট লুসিয়া, সেইন্টমার্টিন, গুয়াদ্দেলোপ, ফ্রান্স গিয়েনা, মার্টিনিক, সেইন্ট বারথোলেমি, সেইন্ট পিয়েরে ও মিকোলেন।

সারণি : ৩
বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকা

১৯০১	:	কিউবায় Platt Amendment সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপের অধিকার।
১৯০৩	:	কলম্বিয়া থেকে পানামার পৃথকীকরণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ।
১৯০৪	:	যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের ঘোষণা–যুক্তরাষ্ট্র হবে ক্যারিবীয় অঞ্চলের পুলিশম্যান।
১৯০৪-১৪	:	পানামা খাল খনন।
১৯০৯-৩৩	:	যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন সেনা কর্তৃক নিকারাগুয়া, হাইতি, ডমিনিকান রিপাবলিক দখল।
১৯১০-১৯২০	:	মেক্সিকোর বিপ্লব।
১৯২৬-১৯২৯	:	মেক্সিকোতে সরকার ও ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও Cristero বিদ্রোহ।
১৯২৭	:	অগুস্টো সিজার সানডিনো (Augusto Cesar Sandino) কর্তৃক নিকারাগুয়ায় সান্ডানিস্টা বিদ্রোহ।
১৯২৯	:	প্লুটারকো কেল্লেস (Plutarco Calles) কর্তৃক National Revolutionary Party (পরে PRI) গঠন, যা পরবর্তী ৭০ বছর দেশটিকে একদলীয় শাসনে পরিণত করেছে। লাতিন আমেরিকায় প্রথম দেশ হিসেবে ইকুয়েডরে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জন।
১৯৩৫-১৯৩৫	:	বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে Chaco War.
১৯৩৪	:	যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Platt Amendment বাতিল ঘোষণা। কিউবাতে মহিলাদের ভোটাধিকার।
১৯৩৬-১৯৭৯	:	নিকারাগুয়ায় সামোজা যুগের সূচনা।

১৯৩৭-১৯৪৫	:	ব্রাজিলে Gatulio Vargas এর যুগ শুরু।
১৯৩৮	:	Lazaro Cardenas সরকার মেক্সিকোর তেল সম্পদ জাতীয়করণ করেন।
১৯৩৯-১৯৫৯	:	কিউবাতে Fulgencio Batisla যুগ শুরু।
১৯৪০	:	মেক্সিকোতে লাতিন আমেরিকার প্রথম 'আদিবাসী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত। আদিবাসীদের সংগঠন Instituto Indigenista Interamericana প্রতিষ্ঠা।
১৯৪২	:	ডমিনিকান রিপাবলিকের মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত।
১৯৪৪	:	গুয়েতেমালায় অভ্যুত্থানে Gorge Ubico উৎখাত। Juan Jose Arevalo নয়া প্রেসিডেন্ট।
১৯৪৫	:	গুয়েতেমালা ও পানামায় মহিলাদের ভোটাধিকার।
১৯৪৬	:	জুয়ান ডমিনগো পেরস আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট।
১৯৪৭	:	আর্জেন্টিনা ও ভেনিজুয়েলায় মহিলাদের ভোটাধিকার।
১৯৪৮	:	Organization of American States গঠিত। কোস্টারিকায় সেনাবাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষণা।
১৯৪৯	:	চিলি ও কোস্টারিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার।
১৯৫০	:	এল সালভাদরে মহিলাদের ভোটাধিকার।
১৯৫২	:	পুয়ের্তোরিকোর যুক্তরাষ্ট্র কমনওয়েলথ এ যোগদান। বলিভিয়াতে National Revolutionary Movement এর ক্ষমতা গ্রহণ। নেতৃত্বে Victor Paz.
১৯৫৩	:	কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা।
১৯৫৪	:	সিআইএ কর্তৃক গুয়েতেমালার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জ্যাকোমো আরবেনজকে উৎখাত। প্যারাগুয়েতে জেনারেল স্ট্রোরোসনামের ক্ষমতা গ্রহণ। কলম্বিয়াতে নারীর ভোটাধিকার।
১৯৫৫	:	হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও পেরুতে নারীর ভোটাধিকার।
১৯৫৬	:	নিকারাগুয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত আনাসটাসিও সামোজা আততায়ীর গুলিতে নিহত।
১৯৫৭-১৯৮৬	:	হাইতিতে পাপা ডক ও বনিডক দ্যুভেলিয়রের রাজত্ব।
১৯৫৯	:	কিউবা বিপ্লব।
১৯৬১	:	প্যারাগুয়েতে মহিলাদের ভোটাধিকার। নিকারাগুয়ায় সান্ডানিস্টা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত।
১৯৬৪	:	ব্রাজিলে গণতান্ত্রিক শাসন চালু।
১৯৬৫	:	বামপন্থি কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের আশঙ্কা।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এক সময় তিনটি বড় ইউরোপীয় শক্তির কলোনি ছিল। এই তিনটি বড় শক্তি হচ্ছে পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স। বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এদের

কলোনিয়াল ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার (১৪৯২) মধ্য দিয়ে পুরো লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রভাব বিস্তার তথা তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন স্পেনের নাবিক। কলম্বাস মূলত সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে এশিয়া যাবার পথ বের করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ইতিহাসে তার চারটি সমুদ্রযাত্রার কথা জানা যায়– ১৪৯২, ১৪৯৩, ১৪৯৮ ও ১৫০২ সালে। ১৪৯২ সালের ৩ আগস্ট তিনি স্পেন থেকে তার প্রথম যাত্রা শুরু করেন। তিনি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেন। তিনি প্রথম সমুদ্রযাত্রায় (১৪৯২) আজকে যে বাহামা, সেখানে অবতরণ করেছিলেন। পরে তিনি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে তার জাহাজবহর ভিড়িয়েছিলেন। এভাবেই ক্রিস্টোফার কলম্বাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইউরোপিয়ানরা লাতিন আমেরিকায় তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এর মধ্য দিয়ে ওই সময় ইনকা (Incas) এবং আজটেকদের (Aztec) মতো আদিবাসীরা তাদের ক্ষমতা হারায়। ওই সময় Harnan Cortes de Monroy y Pizarro Altamirano নামে একজন স্প্যানিশ নাবিক তথা অভিযাত্রিকের নাম জানা যায়, যিনি Aztec সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন। ওই সময় Mexico-Tenochtitlan, Texcoco এবং Tlacopan নামের তিনটি নগররাষ্ট্র মিলে Mexico Valley'তে ১৪২৮ সালের পর থেকে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, যা Aztec সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। স্প্যানের অভিযাত্রীরা ওই সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। অন্যদিকে আরেকজন স্পেনিশ অভিযাত্রী Francisco Pizarro, যিনি পেরুতে ১৫৩২ সালে অভিযান পরিচালনা করে Inca সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ১৫৭২ সালে স্পেনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পুরো ইনকা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। একই সময় পর্তুগালের অভিযাত্রীরাও এই অঞ্চলে তাদের অভিযান পরিচালনা করেন। স্পেন ও পর্তুগালের অভিযাত্রীদের মাঝে যাতে কোনো সংঘর্ষ না ঘটে ও ব্যবসায়িক স্বার্থ বিঘ্নিত না হয় সে জন্য ১৪৯৪ সালের ৭ জুন তারা একটি *Line of demarcation* সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ কার নিয়ন্ত্রণে কোন অঞ্চল থাকবে। এটা ইতিহাসে Treaty of Tordesillas নামে পরিচিত। স্পেনের একটি স্থান Tordesillas এ ওই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বিধায় তা *Treaty of Tordesillas* নামে পরিচিতি পায়। এই চুক্তিবলে ওই সময় যেসব এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছিল, তা পর্তুগিজ সাম্রাজ্য ও স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে (Crown of Castile) ভাগ করা হয়। ওই সময় কেপ ভার্দে (Cape Verde) দ্বীপপুঞ্জ ও কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিভক্তি রেখা টানা হয়। Cape Verde দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগিজ শাসন চালু হয়েছিল, আর কলম্বাস Crown of

Castile (যা পরে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়) এর পক্ষে অভিযান শুরু করেছিলেন। এভাবেই লাতিন আমেরিকা দুটি বড় উপনিবেশ শক্তি স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ১৭৫০ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্তুগালের রাজা জন পঞ্চম (John V) ও স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড (Ferdinand VI) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির কথা উল্লেখ করা যায় (Treaty of Madrid)। ওই চুক্তির মাধ্যমে তারা স্বীকার করেন Treaty of Tordesillas অকার্যকর ও বাতিল হয়ে গেছে। এর ফলে নতুন চুক্তিতে একদিকে ব্রাজিল ও অন্যদিকে স্প্যানিশ আমেরিকা, এভাবেই নতুন সীমানা নির্ধারিত হয়। চুক্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সীমানাও নির্ধারিত হয়। ফিলিপাইনস এর ওপর স্পেনের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, আর আমাজান বেসিনের ওপর পর্তুগালের অধিকার স্বীকৃত হয়। আজকের উরুগুয়ের Colony of Sacramento এর উপর পর্তুগাল তার অধিকার হারায়, তবে Missiones Orientales (স্পেন), যা কি না আজকের ব্রাজিলের Rio Grande do Sul, এই অঞ্চলে পর্তুগাল তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

ফ্রান্সের কলোনিয়াল ইতিহাসের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে নর্থ আমেরিকায়, বিশেষ করে কানাডাতে ফ্রান্স সতেরো শতকে তার কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল। লাতিন আমেরিকাতে তাদের প্রভাব ছিল কম। ১৭৯৭ সালে গায়ানাতে ফ্রান্স তার কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিল (French Guiana)। ১৮০৩ সালের দিকে নর্থ আমেরিকায় ফ্রান্সের যে কলোনি ছিল, তা ছেড়ে দেয়। শুধু গায়ানা (Guiana) তার নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়, যেখানে খোদ ফ্রান্সে যেসব দাগি আসামি ছিল, তাদের শাস্তি ভোগ করার জন্য পাঠানো হতো। দাগি আসামিরা 'বাধ্যতামূলক শ্রমিক' তথা কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হতো। আজকে যে যুক্তরাষ্ট্র, সেখানকার কয়েকটি এলাকায়ও ফ্রান্সের অভিবাসীরা বসতি স্থাপন করেছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় নর্থ আমেরিকায় ফ্রান্সের তিনটি কলোনি ছিল। Gulf of St. Lawrence এর মুখে Acadia (১৭১৩ সালের মধ্যে), Canada এবং Louisiana। এই Louisiana-কে যুক্তরাষ্ট্র কিনে নিয়েছিল ১৮০৩ সালে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধে ফ্রান্স হেরে যায়। আজকের যে নিউইয়র্ক রাজ্য; এই রাজ্যটিও এক সময় ডাচদের (হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডস) কলোনি ছিল। ১৬৬৪ সালে ডাচরা নিউইয়র্ককে ব্রিটিশদের কাছে ছেড়ে দেয়। নিউইয়র্ককে বলা হতো 'Breadbasket Colony', কেননা প্রচুর গম উৎপাদিত হতো এই এলাকায়। আর এই গম ইংল্যান্ডে রপ্তানি হতো।

বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার রাজনীতি যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দুটি ধারা আমরা লক্ষ করবো– একটি বাম রাজনীতির ধারা,

অন্যটি দক্ষিণপন্থি রাজনীতির ধারা। এই বাম ধারা, যা পরিচিত ছিল Pink Tide হিসেবে। স্প্যানিশ ভাষায় এটি *marea rosa*, আর পর্তুগিজ ভাষায় *onda rosa* বলা হয়। এই শব্দটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ব্যবহার করতেন। একই সময় কেউ কেউ *giro a la izquireda* (স্প্যানিশ) ও *guinada a esquerda* শব্দটিও ব্যবহার করতেন। এর অর্থ 'turn to the left'। অর্থাৎ বামপন্থি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়া। লাতিন আমেরিকার ওই সময়কার রাজনীতি বোঝাতে এইসব শব্দ ব্যবহার করা হতো।

বিংশ শতাব্দীর লাতিন আমেরিকার রাজনীতি জুড়ে আছে ধনী গরিবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অসমতা, জাতীয়তাবাদী 'রাজনীতি', সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি। এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ যেমনি নেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি এ অঞ্চলে তা ব্যর্থও হয়েছে এবং সেই ব্যর্থতার রেশ ধরে দক্ষিণপন্থি জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানও ঘটেছে। David Masci তার একটি প্রবন্ধে *(Mexico's Future, The CQ Researcher, Sept 19, 1997)* উল্লেখ করেছেন, "Democracy appears to be most solid in the so-called southern core countries of Argentina, Brazil, Chile and Uruguay, while it is on shakier ground in the Andean countries-Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, and Venezuela and in Central America."। মেক্সিকোতেও এক ধরনের গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, যেখানে *Institutional Revolutionary Party (PRI)* গত ৭১ বছর ধরে ক্ষমতা পরিচালনা করে আসছে।

বিংশ শতাব্দীতে *Pink Tide Nations*-গুলো তাদের বাম রাজনীতি এবং Post-neoliberalism রাজনীতির জন্য বারবার আলোচিত হয়েছে। এই দেশগুলোর মাঝে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো এবং ভেনিজুয়েলা মার্কিন বিরোধিতা ও 'পপুলিজম' এর জন্ম দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর আর্জেন্টিনার ইতিহাস *Drago Doctrine* জন্ম দিয়ে, ব্যক্তি পেরনের উত্থান ও তার ব্যক্তিগত ইমেজকে কেন্দ্র করে *'পেরেনিস্টা ম্যুভমেন্টের'* জন্ম, ফকল্যান্ডের কর্তৃত্বের প্রশ্নে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধ, একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান, একটি দক্ষিণপন্থি রাজনীতি—ইত্যাদি নানা কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ১৯০২ সালে আর্জেন্টিনার ওই সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুইস মারিয়া দ্রাগো (Luis Maria Drago) যুক্তরাষ্ট্রকে যে একটি কূটনৈতিক নোট দিয়েছিলেন, তাই *Drago Doctrine* হিসেবে পরিচিত। দ্রাগো তার নোটে লিখেছিলেন—কোনো ইউরোপীয় শক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে তাদের বকেয়া অর্থ আদায়ে কোনো শক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু ১৯০৪ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট যে সিদ্ধান্ত নেন, যা State corollary

নামে পরিচিত, তাতে মার্কিন ব্যবসায়ী তথা লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার স্বার্থে হস্তক্ষেপের কথা বলা হয়। তার ওই সিদ্ধান্ত ১৮২৩ সালে গৃহিত Monroe Doctrine-এর পরিপন্থি ছিল। ১৯০২ সালে ভেনিজুয়েলা বড় ধরনের ঋণ পরিশোধজনিত সংকটে পড়লে ব্রিটেন, জার্মানি ও ইতালি নৌ অবরোধ সৃষ্টি করে কয়েকটি বন্দরে জাহাজ থেকে 'শেল' নিক্ষেপ করে। এর প্রেক্ষাপটেই দ্রাগো ওই চিঠি লিখেছিলেন যা পরে তার নাম অনুসরণে *Drago Doctrine* হিসেবে পরিচিতি পায়।

বিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকা

বিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা লক্ষ করবো—এই অঞ্চলে একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপক প্রভাব, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কর্পোরেট হাউজগুলোর ব্যবসায়িক প্রভাব বৃদ্ধি, অন্যদিকে এর প্রতিবাদে কোথাও কোথাও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশ। কোথাও কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে হস্তক্ষেপও করেছে, আবার কোথাও কোথাও ওই দেশের সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। তাদের ওই ক্ষমতা দখলের পেছনে প্রকারান্তরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল।

লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ ছিল স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে (১৮০৩-১৮১৫) শেষ পর্যন্ত তারা স্বাধীনতা পেলেও, বিশ্ব রাজনীতিতে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। দেশগুলো স্বাধীন হলেও, সেখানে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ওইসব দেশে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার পুঁজি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বহুজাতিক সংস্থা সেখানে শত শত বিঘা জমিতে পণ্য উৎপাদন করতো (যেমন কলা), এবং তা নিয়ে যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এক্ষেত্রে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতো। আমরা United Fruit Company'র কথা বলতে পারি, কলা উৎপাদনে যাদের বিপুল বিনিয়োগ তাদেরকে ওই অঞ্চলে অন্যতম শক্তিতে পরিণত করেছিল। এরা স্থানীয় ভূস্বামী এবং সরকারের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো। প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারগুলোর ভূমিকা ছিল গৌণ। এজন্যই এই দেশগুলো এক সময় *Banana Republic* হিসেবে পরিচিতি হয়ে ওঠে। মার্কিন পুঁজি ওই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা, ব্যাংক, হোটেল ইত্যাদি সব নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে দেখা যায় মার্কিন পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় রাখার স্বার্থেই ওই অঞ্চলের সরকারগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতো।

সারণি : ৪

লাতিন আমেরিকার শীর্ষ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

র‍্যাংকিং	নাম	ব্যবসার ধরন	দেশ
১.	পেট্রোব্রাস (Petrobras)	কয়লা ও গ্যাস	ব্রাজিল
২.	ব্যাংকো দো ব্রাজিল (Banco do Barazil)	ব্যাংকিং	ব্রাজিল
৩.	ব্রাডেসকো (Bradesco)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ব্রাজিল
৪.	ইটাউ উনিব্যাংকো (Itau Unibenco)	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ব্রাজিল
৫.	ভালে দো রিও দোসে (Vale do Rio Doce)	খনি	ব্রাজিল
৬.	আমেরিকা মোভিল (America Movil)	টেলিকমিউনিকেশন	মেক্সিকো
৭.	মেটালুরগিসা গারদাউ এসএ (Metalurgicon Gerdau SA)	স্টিল	ব্রাজিল
৮.	দাগরদাউ একোস লংগোস (Gerdau Acos Longos)	স্টিল	ব্রাজিল
৯.	ওয়ালমার্ট দি মেক্সিকো (Wal-mart de Mexico)	রিটেল	মেক্সিকো
১০.	সিমেক্স এসএ (Cemex SA)	সিমেন্ট	মেক্সিকো

সূত্র : http : //latintrade.com/trg/It-500

এবং প্রয়োজনে নিজেদের প্রতিনিধিদের দিয়ে সরকার গঠন করতো। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের কোনো ভূমিকা ছিল না। স্থানীয় ভূস্বামী, বড় বড় ব্যবসায়ীদের তারা 'নিয়ন্ত্রণে' রাখতো এবং তাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায় করতো। অর্থাৎ বলা যায় স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন ছিল। যদিও এটা ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উপনিবেশ ছিল না এবং স্বাধীনতা পরবর্তী মার্কিন নেতৃবৃন্দ উপনিবেশ গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগও নেয়নি। কিন্তু অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি তাদের প্রভাবাধীন একটি অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিল। আমরা ইতিহাস থেকে দেখেছি এ অঞ্চলের একাধিক দেশে যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে অভিযান চালিয়েছিল। হাইতিতে ১৯১৫-৩৪ সালে, ১৯৯৪-৯৬ সালে, পানামাতে ১৯০৩-৩৬ সালে, ১৯৮৯ সালে, গ্রেনেডায় ১৯৮৩ সালে,

ডমিনিকান রিপাবলিকে ১৯১৬-২৪ সালে ও ১৯৬৫-৬৬ সালে, কিউবাতে ১৮৯৮-১৯০২ সালে, ১৯০৬-১৯০৯, ১৯১৭-১৯২২, নিকারাগুয়ায় ১৯০৯-৩৩ সালে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের খবর আমরা জানি। এইসব সামরিক হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখেছিল। এ অঞ্চলে মার্কিনি অধিপত্য ও সেই সাথে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ তথা কৃষকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল বামপন্থি সংগঠনগুলো। তারা বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিলেও, কিউবা বাদে তারা খুব একটা সফল হয়নি।

সারণি : ৫

লাতিন আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলোর তালিকা

১. গুগল (Google), ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র
২. মাইক্রোসফট (Microsoft), কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার, যুক্তরাষ্ট্র
৩. কিমবারলি ক্লার্ক (Kimberly Clark), ব্যক্তিগত সুরক্ষার কাজে তৈরি পণ্য, স্যানিটারি পেপারস যুক্ত।
৪. টেলিফোনিকা (Telefonica), টেলিকমিউনিকেশন, স্পেন
৫. এসর (Accor), হোটেল ও রির্সোট ব্যবসা, ফ্রান্স
৬. ম্যাকডোনাল্ড (Mcdonald), ফাস্টফুড, যুক্তরাষ্ট্র
৭. ডেল (dell), কম্পিউটার টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র
৮. দিয়াজিও (Diageo), মদের ব্যবসা, ব্রিটেন
৯. বেলকরপ্ (Belcorp), মহিলা প্রসাধনী ব্যবসা, পেরু
১০. ওরাকল (Oracle), কম্পিউটার টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র
১১. বিবিভিএ (BBVA), স্পেশাল ব্যাংক, স্পেন
১২. ডাইরেকটিভি (Directv), স্যাটেলাইট সার্ভিস প্রোভাইডার, যুক্তরাষ্ট্র
১৩. মেপাফ্রি (Mapfree), ইন্সুরেন্স কোম্পানি, যুক্তরাষ্ট্র
১৪. রয়্যাল এন্ড সান অ্যালিয়ান্স (Royal & Sun Alliarce), ইন্সুরেন্স, ব্রিটেন
১৫. ফেডএক্স (FedEX), পরিবহন, যুক্তরাষ্ট্র
১৬. এসসি জনসন (SC Johnson), ক্লিনিং ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা, সামগ্রী, যুক্তরাষ্ট্র
১৭. গ্রুপো ফালাবেল্লা (Grupo Falabella), ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, চিলি
১৮. মনসানো (Monsano), এগ্রোকেমিক্যাল কোম্পানি, যুক্তরাষ্ট্র
১৯. দোক্সকেটেল (Nextel) ওয়্যারলেস কোম্পানি, যুক্তরাষ্ট্র
২০. নোভারটিস (Novartis) ওয়্যারলেস কোম্পানি, যুক্তরাষ্ট্র

সূত্র : WWW. Greatplacetowo.kk.net

সারণি : ৬

লাতিন আমেরিকার শীর্ষ দশ কোম্পানির আয়

(মিলিয়ন ডলার)

র‍্যাংক (২০১৩)	র‍্যাংক (২০১২)	কোম্পানি দেশ	আয়	পরিবর্তন (ভাগ)	লাভ	পরিবর্তন
১	১	Pet robras (ব্রাজিল)	১৩৭৬৯৪.৯	৫.৮	১০৩৬৫.৮	৪৩.৬
২	৩	Pemex (মেক্সিকো)	১২৭০১৯.৭	১৩.৭	২১৮.৫	১০৩.৩
৩	২	PDVSA (ভেনিজুয়েলা)	১২৪৪২৯.০	-০.২	৪২১৫.০	৬.৩
র‍্যাংক (২০১৩)	র‍্যাংক (২০১২)	কোম্পানি দেশ	আয়	পরিবর্তন (ভাগ)	লাভ	পরিবর্তন
৪	৫	America Movil (মেক্সিকো)	৫৯৭৭৮.০	১৪.০	৭০৫২.৫	১৮.৯
৫	৪	Vale (ব্রাজিল)	৪৫৭৬০.৫	১৬.৮	৪৭৬৩.৩	৭৬.৪
৬	৭	Telogonic a (স্পেন)	৪০২৫৫.৯	৭.৫	৭৯৩৩.৮	০.২
৭	৬	BR Distribuid ora (ব্রাজিল)	৩৯২১০.৭	-১১	৯২৭.০	৩৭.২
৮	৯	Ecopetrol (কলম্বিয়া)	৩৭৭৩৫.২	১৩.৭	৮৪৫১.৯	৬.৩
৯	৮	Odebrecht (ব্রাজিল)	৩৭৪০৪.৭	১২.২	৭৭.৬	৬.৩
১০	১০	JBS (ব্রাজিল)	৩৭০৪২.৭	১২.৪	৩৫১.৮	৯৩.৭

সূত্র : LBC 500, E-conomatica, htt://latintrade.com

লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন

প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ কলোনিয়াল শাসনে, বিশেষ করে স্পেন ও পর্তুগালের শাসনে থাকার পর ১৮০৮ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করে। ব্যতিক্রম ছিল কিউবা ও পুয়ের্তোরিকো, যে দেশ দুটি ছিল স্পেনের কলোনি। হাইতি ছিল এ অঞ্চলের প্রথম দেশ, যা ছিল ফ্রান্সের কলোনি (তখনকার নাম ছিল Saint Domingue), স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে ফ্রান্স বিপ্লবের দু'বছরের মধ্যে। ১৭৯৫ সালে 'দাসরা' এখানে বিদ্রোহ করে এবং বিপ্লবের সূচনা করে স্বাধীন

দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮১০ সালে ফ্রান্সের সেনা শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেন আক্রমণ করার সাথে সাথে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এক এক করে স্বাধীন হতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৮২০ সালের দিকে সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই আন্দোলন সমর্থন করেছিল। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল, সে কারণে লাতিন আমেরিকায় স্পেনের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে লাতিন জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে সমর্থন ছিল।

লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন সিমন বলিভার। স্পেনের কলোনিয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভেনিজুয়েলার একজন সৈনিক। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা স্বাধীন করেন। ১৮১৯-৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, পেরুর শাসক (১৮২৩-২৬)। আজকের যে বলিভিয়া, তা তার নামেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এখানে বলা ভালো, স্পেনিশ শাসনের সময় এই অঞ্চলে একটি মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল, যাদেরকে চিহ্নিত করা হতো Creole হিসেবে। সাধারণত ইউরোপিয়ান (ফ্রান্স অথবা স্পেন) বাবা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের আফ্রিকার বংশোদ্ভূতদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এই মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। যাদের পরিচিতি Creole হিসেবে। এরা ক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবং ওই সময়কার সেনাবাহিনী, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। সিমন বলিভার ছিলেন এই গোত্রভুক্ত। অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন স্থানীয় আদিবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি, পরিচালিত হয়েছে মিশ্র জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে। এরা নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার জন্যই দক্ষিণ আমেরিকা স্বাধীন করেছে। বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৪টি দেশ– আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ফকল্যান্ড, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, গায়ানা, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা। সিমন বলিভার পুরো দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এসব দেশের (বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পানাম, পেরু, ভেনিজুয়েলা) স্বাধীনতার নেতা হিসেবে স্বীকৃত। ইতিহাস বলে মেক্সিকোর স্বাধীনতা আন্দোলনে (১৮১০) ৪২৫০০ মানুষ এবং ভেনিজুয়েলায় (১৮১০-২৩) ১০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বলতে দ্বিধা নেই, ফ্রান্স ও আমেরিকান বিপ্লব দ্বারা লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাদের বিদ্রোহ করার একটা অন্যতম কারণ ছিল তাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছিল। সারা লাতিন

আমেরিকা জুড়ে যখন এসব স্বাধীনতা আন্দোলন বিস্তৃত হচ্ছিল, তখন ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিখ্যাত *মনরো ডকট্রিন* প্রয়োগ করেছিল। জেমস মনরো ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম প্রেসিডেন্ট (১৮১৭-১৮২৫)। তার অনুসৃত নীতিকেই মনরো ডকট্রিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই মতবাদের মূল কথা হচ্ছে–যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করবে না এবং যুক্তরাষ্ট্র চায় কোনো ইউরোপীয় শক্তি যেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ না করে। এটা ছিল এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা 'Isolationism'- নিজেকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এ কারণেই লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থান নেয়নি। যদিও পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র এই অবস্থান থেকে সরে আসে। ইতিহাস বলে যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে অন্তত ৩৫ বার লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশগুলোতে (মোট দেশ ২০টি) সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে এবং এ অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করছিল। প্রথমত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগণ্য হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতাসীন গণবিরোধী সরকারগুলোকে সমর্থন, যাদের সাথে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থনপুষ্ট বহুজাতিক সংস্থাগুলোর এই অঞ্চলে একচেটিয়া ব্যবসা ও শোষণ। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের দারিদ্র এবং দারিদ্র দূরীকরণে সরকারগুলোর ব্যর্থতা ও উদাসীনতা। চতুর্থত, দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা। মূলত এসব কারণেই ওই অঞ্চলে বামপন্থি রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটে এবং কোনো কোনো রাষ্ট্রে তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতও হয়। রাজনৈতিকভাবে তারা কিছুটা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতির ঘেষা ছিল এবং তারা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিশ্চিত করেছিল। আদর্শগতভাবে সোভিয়েত তাত্ত্বিকরা মধ্য ষাটের দশকে তাদের নীতিতে আদর্শগতভাবে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। তারা জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিয়ে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারা মনে করতেন এইসব জাতীয়তাবাদী নেতারা যেহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সুতরাং তাদের দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাদের কাছে কিউবা ছিল একটি দৃষ্টান্ত। ফিদেল ক্যাস্ত্রোকে সামনে রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করতে চেয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে একটি শব্দ ব্যাপক পরিচিত ছিল– *Banana Republic*। এ অঞ্চলের কিছু কিছু দেশকে *Banana Republic* হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এর কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলের কিছু দেশ প্রচুর কলা উৎপাদন করতো। কিন্তু এই কলা রপ্তানি হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন কর্পোরেট হাউজগুলো এই অঞ্চলে প্রচুর বিনিয়োগে করেছিল এবং এই ব্যবসাটা পুরোটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যেমন *United Fruit Company*। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ক্যাফে, হোটেল সব কিছুই পরিচালিত হতো মার্কিন পুঁজি দ্বারা। এই অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সরকারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। স্থানীয় ভূস্বামী, বড় ব্যবসায়ী আর সামরিক নেতৃত্বের সাথেও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক রক্ষা করতো, যাতে করে তাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ রক্ষা করতে পারতো। আর এভাবেই *Banana Repablic* এর ধারণা বৃদ্ধি পায়। Banana বা কলা যেহেতু এই অঞ্চলের দেশগুলোর অন্যতম উৎপাদিত ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য ছিল, সে কারণে কলাকেই সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করে *Banana Repablic* ধারণার বিস্তার ঘটে। মূলত, এর মধ্য দিয়ে এটা বোঝানো হতো যে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীন হলেও, মার্কিনি পুঁজির কাছে দেশগুলো বাধা ছিল। পরোক্ষভাবে মার্কিনি পুঁজির স্বার্থেই সরকারগুলো সব ধরনের সিদ্ধান্ত নিত। এটাই হচ্ছে *Banana Republic*-এর মোদ্দাকথা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠিত লেখক উইলিয়াম সিডনি পোর্টার (William Sydney Porter, 1862-1910) ১৯০৪ সালে তার একটি গ্রন্থ Republic-এ প্রথমবারের মতো *Banana Republic* টার্মটি ব্যবহার করেন। ১৮৯৭ সালে ৬ মাস তিনি হন্ডুরাসে ছিলেন। ওই সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি গল্পগুচ্ছ Republic লেখেন। এর পর থেকেই লাতিন আমেরিকা বোঝাতে এই *Banana Repablic* শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছিল। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়–তিনটি মার্কিনি কলা কোম্পানি *United Fruit Company*, Standard Fruit Company ও Cuyamel Fruit Company এ অঞ্চলে (হন্ডুরাস, গুয়েতেমালা বিশেষ করে) কলা চাষ, কলা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদির পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করতো। শত শত একর জমিতে তারা কৃষকদের কলা উৎপাদন করতে বাধ্য করতো। এজন্য কৃষকদের তারা ন্যায্য মজুরি দিত না। কৃষকদের ওইসব কোম্পানি শোষণ ও নির্যাতন করতো। কৃষকরা কোম্পানির হাতে জিম্মি হয়ে গিয়েছিল এবং সরকারগুলো কখনোই কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি, বরং তারা কোম্পানির স্বার্থ দেখতো। আর এভাবে

কৃষকদের শোষণ নির্যাতনের প্রতিবাদ থেকেই এ অঞ্চলে বাম রাজনীতির জন্ম হয়েছিল।

লাতিন আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বাম রাজনীতি বললে, আমাদের কিউবার পাশাপাশি, নিকারাগুয়া, এল-সালভাদর, গ্রানাডা, গুয়েতেমালা, ডমিনিকান রিপাবলিক, চিলি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও পেরুর কথা উল্লেখ করতে হবে। কিউবায় বাতিস্তা (Fulgencio Batista) সরকারের বিরুদ্ধে ফিদেল ক্যাস্ত্রোর নেতৃত্বে যে বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল (১৯৫৯), তা ছিল কিউবার দারিদ্র, দুর্নীতি ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। তবে প্রথমদিকে ক্যাস্ত্রো যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন, তখন কিন্তু তিনি সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না। এবং কিউবার বিপ্লব কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও ছিল না। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ গ্রহণ করেন, কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং কিউবার নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে রাজনৈতিক সখ্য গড়ে তুলেছিলেন। ওই অঞ্চলে কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ দেখতো। শুধু তাই নয়, মধ্য সত্তরের দশকে আফ্রিকার ১৭টি দেশে (এঙ্গোলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) ও তিনটি বিদ্রোহ সংগঠিত করতে কিউবার সেনাবাহিনী জড়িয়ে গিয়েছিল (Foreign Affairs article 'Cuba in Africa', Summer 1987, by Pamela S. Falk)।

কিউবার এই ভূমিকা ব্যাপকভাবে বিশ্বে সমালোচিত হয়েছিল। আমরা যেন ভুলে না যাই, কিউবার বিপ্লবের পর বিপ্লবের অন্যতম নায়ক চে গুয়েভারা কিউবা সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে লাতিন আমেরিকায় বিপ্লব সংগঠিত করতে কিউবা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু চে গুয়েভারা সফল হননি। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে বলিভিয়ায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিউবা অবশ্য এখন আর বিপ্লব রপ্তানির ধারণা প্রমোট করে না।

কিউবার দীর্ঘ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে, দেশটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য) যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও, দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। ক্যাস্ত্রো পরবর্তী কিউবায় অর্থনীতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্মুক্ত করা হয়েছে। একনায়ক শাসন বজায় রেখেই সেখানে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

নিকারাগুয়ার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন সিজার অগাস্টো স্যান্ডিনো (Cesar Augusto Sandino)। নিকারাগুয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধিপত্যের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘ ৬ বছরব্যাপী গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন ১৯২৬ সালে। কিন্তু স্বৈরশাসক সামোজা গার্সিয়ার ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী তাকে হত্যা করে ১৯৩৪ সালে। তার আদর্শকে কেন্দ্র করে ১৯৬২ সালে গঠিত হয়

স্যান্ডানিস্ট ফ্রন্ট অব ন্যাশনাল লিবারেশন (এফএসএলএন)। তারা সেখানে সোমোজা সরকার তথা মার্কিন প্রভুত্বের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। তারা ছিলেন বামমনা ও কিউবার বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত। দীর্ঘ গেরিলা লড়াইয়ের পর ১৯৭৯ সালে ফ্রন্ট পাল্টা সরকার গঠন করে যখন সামোজা যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। ১৭ জুলাই তারা রাজধানী মানাগুয়ায় প্রবেশ করে ও সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ড্যানিয়েল ওর্তেগা এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র স্যান্ডানিস্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সান্ডানিস্টরা ক্ষমতায় ছিল ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ওই সময় স্যান্ডানিস্ট বিরোধী কনট্রা (Contras) বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করে (১৯৮১-১৯৯০)। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে এক ধরনের Proxy War-এর জন্ম হয়েছিল। একদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, যারা স্যান্ডানিস্টদের সমর্থন করতো, অন্যদিকে কনট্রা বিদ্রোহী, যাদের সমর্থন করতো যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই পরাশক্তির মাঝে এক ধরনের Proxy War-ই আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বিংশ শতাব্দীর শেষের দিনগুলোতে। ১৯৮৯ সালে Tela Accord অনুযায়ী স্যান্ডানিস্ট ও কনট্রা বিদ্রোহীরা তাদের প্যারামিলিশিয়া বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিল এবং ১৯৯০ সালে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর ওই নির্বাচনে স্যান্ডানিস্ট বিরোধীরা ক্ষমতাসীন হয়েছিল। তবে ২০০৭ সালে স্যান্ডানিস্টরা আবারও ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল। এখনও ওতের্গা দেশের প্রেসিডেন্ট। তবে স্যান্ডানিস্টরা তাদের বাম মতাদর্শে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

আমরা এল সালভাদর-এর কথাও বলতে পারি। ওই দেশটিতেও মার্কিন প্রভুত্ব তথা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস রয়েছে। ১৯৩২ সালে গড়ে ওঠা ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফেরাবুন্দো মার্তি (Farabundo Marti)। মার্তি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক মূর্ত প্রতীক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমর্থিত সরকার তাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। পরে আঠারো দশকে তার আদর্শকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল Farabundo Murti National Liberation Front (FMLN)। এরা ছিলেন বামমনা ও মার্কসবাদী। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এল সালভাদরে গৃহযুদ্ধ চলে। ১৯৯২ সালে দক্ষিণপন্থি সরকার ও FMLN-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (Chapultepec Peace Accord)। চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচন হয়। যদিও ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতিটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেই FMLN বিরোধী ও দক্ষিণপন্থি Nationalist Republican Alliance (ARENA) পার্টি বিজয়ী হয়। ২০০৯ সালের নির্বাচনে FMLN প্রার্থী মাওরিসিও ফানেস (Mauricio Funes) বিজয়ী হয়। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন

২০১৪ সাল পর্যন্ত। ২০১৪ সালের নির্বাচনে FMLN এর প্রার্থী সালভাদর সানচেজ সেরেন (Salvador Sanchez Ceren) বিজয়ী হন। কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন নাঈব বুকেলে (Nayib Bukele), যিনি Grand Alliance for National Unity'র প্রার্থী ছিলেন। ওই নির্বাচনে FMLN প্রার্থী (হুগো মার্টিনেজ) তৃতীয় হয়েছিলেন (১৪.৪১ ভাগ ভোট)। এল সালভাদরে প্রেসিডেন্ট পদে একজন প্রার্থীর দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ নেই। নিকারাগুয়ার মতো এল সালভাদরেও বামপন্থিরা অন্যতম একটি শক্তি।

বামপন্থিদের ক্ষমতা গ্রহণের ইতিহাসে গ্রানাডার কথাও আমরা আলোচনা করতে পারি। ক্যারিবীয় অঞ্চলের একটি ছোট দেশ গ্রানাডা। গ্রানাডার শাসক ছিলেন এরিক গ্যারি, যিনি ছিলেন দক্ষিণপন্থি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয়ভাজন। তার বিরুদ্ধে *New Jewel Movement* নামে একটি বামপন্থি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন মরিস বিশপ (Maurice Bishop)। ১৯৭৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে গ্যারি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং বিশপের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮৩ সালের ২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৬টি ক্যারিবীয় দেশ (Operation Urgent Fury) গ্রানাডায় সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে বিশপকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বিশপের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি সেখানে কিউবান ও সোভিয়েত সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কারণে বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যাতে বড় বড় সোভিয়েত বিমান নামতে পারে। বিশপ ছিলেন মার্কসবাদী। সেখানে সম্ভাব্য কিউবান ও সোভিয়েত সেনা মোতায়েনকে যুক্তরাষ্ট্র দেখেছিল তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তারই প্রতিফলন ঘটেছিল গ্রানাডায় মার্কিন হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বিশপকে হাত বেঁধে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাবার দৃশ্য ওই সময় সারা বিশ্বে নিন্দিত হয়েছিল। বিশপের উৎখাতের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী রাজনীতি সেখানে আর বিকশিত হয়নি।

গুয়েতেমালার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখবো, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা মার্কিন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট সরকার ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করে সেখানে সাধারণ মানুষের আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল। এই ক্ষোভকে পুঁজি করে ১৯৫১ সালে আরবেনজ (Arbenz) গুয়েতেমালার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে কমিউনিস্ট হিসেবে গণ্য করতো। তিনি ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে কৃষকদের মাঝে

বণ্টন করেছিলেন। গুয়েতেমলায় কলা উৎপাদিত হতো। আর এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো United Fruit Company। এই কোম্পানির স্বার্থে তা আঘাত করে। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা নিয়ে আরবেনজ বিরোধী একটি পক্ষ ক্যাস্টিলো আরমাসের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকার পার্শ্ববর্তী হন্ডুরাসে গঠন করে। তারা গুয়েতেমালা আক্রমণ করলে ১৯৫৪ সালে আরবেনজ পদত্যাগ করেন। সিআইএ সমর্থনপুষ্ট ক্যাস্টিলো এর পর সরকার গঠন করলেও ১৯৫৭ সালে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলে, গুয়েতেমালায় পরবর্তী সরকারের উপর মার্কিনি প্রভাব বেড়ে যায়। আর এই প্রভাবের বিরুদ্ধেই ১৯৬২ সালে বাম আদর্শে বিপ্লবী Rebel Armed Forces (FAR) একটি গেরিলা সংগঠনের সেখানে জন্ম হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ সময় গুয়েতেমালা প্রত্যক্ষ করেছে সেনা অভ্যুত্থান, পালটা অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বামপন্থি গেরিলারা সেখানে শক্তিশালী হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর থেকে গৃহযুদ্ধের খবর তেমন পাওয়া না গেলেও, সেখানে গণহত্যা, আদিবাসী হত্যা, এই হত্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের যোগসাজশের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানা যায়। গুয়েতেমালায় ইতোমধ্যে ডানপন্থি উত্থান ঘটেছে। গেল জানুয়ারিতে (২০২০) আলেজান্দ্রো গিয়াম্মাতাই (Alejandro Giammattei) সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণপন্থি Vamos পার্টির প্রধান।

ডমিনিকান রিপাবলিকে দীর্ঘ ৩১ বছর ক্ষমতায় ছিলেন জাতীয়তাবাদী রাফায়েল ট্রুজিল্লো (Rafael Trujillo)। তিনি মার্কিনি স্বার্থ রক্ষা করতেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৬১ সালে তিনি নিহত হলে সিআই-এর প্ররোচনায় Dominican Revolutionay Party (DRP)'র নেতা জুয়ান বশ সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বশ ছিলেন জাতীয়তাবাদী। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মাঝে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সেনাবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেখানে জাতীয়তাবাদী সামরিক নেতা ক্যামানো ডেনোর (Caamano Deno) উত্থান ঘটে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল তার বিরোধী। এক পর্যায় তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত হন কিন্তু প্রবাস থেকে সরকারবিরোধী গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসলে শহিদ হন। এভাবেই ডমিনিকান রিপাবলিকে বাম রাজনীতির অবসান ঘটে।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় কোনো বামপন্থি সরকারকে যে ক্ষমতায় রাখতে চাইতো না, তার বড় প্রমাণ চিলি। চিলিতে বামপন্থি আলেন্দে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৭০

সালে। তিনি *Popular Unity Front*-এর নেতা ছিলেন। আলেন্দে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থে মার্কিনি পুঁজির বিরুদ্ধে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেক শিল্প জাতীয়করণ করেছিলেন। এইসব সিদ্ধান্ত মার্কিনি স্বার্থের পরিপন্থি ছিল। ফলে সিআইএ ১৯৭৩ সালে সেখানে জেনারেল পিনোশের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করে ও আলেন্দেকে হত্যা করে। এর পর থেকে চিলিতে বাম রাজনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। মার্কিন সমর্থন নিয়ে পিনোশে (Pinochet) ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। আলেন্দের মতো মিশেল বেসলেট (Michelle Bachelet) সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে দু-দুবার (২০০৬-২০১০, ও ২০১৪-২০১৮) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আলেন্দের মতো জনপ্রিয় ছিলেন না, ও জনপ্রিয় সিদ্ধান্তগুলো তিনি নিতে পারেননি। চিলি হচ্ছে একটা দৃষ্টান্ত যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করে সরকার উৎখাত করেছিল।

আর্জেন্টিনার ইতিহাসে দীর্ঘ সময় সেখানে সেনাবাহিনী শাসন করেছে। এই সেনাবাহিনীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সখ্য অনেক পুরানো। তবে এই সেনা শাসনের মধ্যে থেকে একজন সেনাশাসক জুয়ান পেরন (Juan Peron) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তিনি জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করে আর্জেন্টিনাকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে ছিল ব্যাংক জাতীয়করণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৈদেশিক সংস্থা ক্রয় করা, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শিল্পায়ন ইত্যাদি। তিনি তিন তিনবার আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ১৯৪৬ সালের জুন থেকে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর পর সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি উৎখাত হন। আবার ফিরে আসেন ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে এবং ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তার ক্ষমতার একটা উৎস ছিল সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তার জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করেই তার সমর্থকরা গঠন করেছিল *'পেরেনিস্ট পার্টি'*। তার জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করেই তার স্ত্রী ইসাবেল পেরন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়েছিলেন (১৯৭৪-৭৬)। পেরেনিস্টরা বর্তমানে Justicialist Party ব্যানারে সংগঠিত। *পেরোনিজম* আর্জেন্টিনায় একটি রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়েছিল। আলবার্তো ফার্নানডেজ ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে সে দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

পেরোনিস্টরা আর্জেন্টিনায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি শুরু করেছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ছিল অনেকটা বামঘেঁষা, জনমুখী ও মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পরিপন্থি। ফলে দক্ষিণপন্থি সামরিক অভ্যুত্থানের (১৯৭৬) মধ্য দিয়ে যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি আর্জেন্টিনায় শুরু হয়েছিল, তা অনেকদিন বজায় ছিল।

ব্রাজিল হচ্ছে আরেকটি দেশ যেখানে দারিদ্র বামঘেঁষা সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ফলে অনিবার্যভাবে সেখানে দক্ষিণপন্থি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন সেখানে সেনা শাসন ছিল। ভার্গাস (Vargas) ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়ে ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন। তখন সিআইএ তাকে উৎখাতের চেষ্টা করলে তিনি আত্মহত্যা করেন। ১৯৬০ সালে বামমনা কাদরোস (Quadros) প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরে মার্কিনি চাপে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬১ সালে গউলার্ট (Goulart) প্রেসিডেন্ট হয়ে ব্যাপক ভূমিসংস্কার করেন, যা দক্ষিণপন্থি ও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানকে প্ররোচিত করে। এরপর দীর্ঘদিন সেখানে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট (২০১৯) বলসোনারো (Bolsonaro) কট্টর দক্ষিণপন্থিদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রাজিলের রাজনীতি দুভাবে বিভক্ত হয়ে আছে– বামমনা ও দক্ষিণপন্থি। স্নায়ুযুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণপন্থিদের উৎসাহিত করে ক্ষমতা দখল করতে।

পেরুর কাহিনিও এ থেকে ভিন্ন নয়। এখানেও ব্রাজিলের মতো পরিস্থিতি আমরা লক্ষ করি। অর্থাৎ পেরুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের মার্কিন কোম্পানির প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৬৮ সালে আলভারাদো (Alvarado) সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে জাতীয়করণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাতে করে মার্কিন কোম্পানির টার্গেটে পরিণত হন তিনি। ১৯৬৯ সালে ভূমিসংস্কার আইন পাস করে জমি কৃষকদের মাঝে বিলি করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিনপন্থি সামরিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এখানেও একই সমস্যা লক্ষ করা যায়–দক্ষিণপন্থি বনাম বাম ধারার রাজনীতি। এই বাম ধারা জাতীয়তাবাদী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

পেরুর রাজনীতিতে আলভারাদোর নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থানের (১৯৬৮) আগেও সেনা অভ্যুত্থানের ইতিহাস রয়েছে (১৯৬৩, ১৯৬২, ১৯৫০, ১৯৩১ ইত্যাদি)। মজার ব্যাপার আলভারাদো নিজেও উৎখাত হয়েছিলেন আরেক সেনাশাসক ফ্রান্সিসকো মোরালেস বারমুদেজ চেরুট্রি দ্বারা ১৯৭৫ সালে। এর পর থেকে সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানের খবর আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে (২০১৮ সালের পর) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন *Peruvians for Change*-এর মার্টিন ভিজকারা (Martin Vizcarra)।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন লাতিন আমেরিকার ইতিহাস হচ্ছে একদিকে দক্ষিণপন্থি সেনা অভ্যুত্থান, অন্যদিকে জনগণের অধিকার নিয়ে বাম রাজনীতির উত্থান। বাম ধারার এই মতবাদীরা মার্কসবাদী ছিলেন না। তারা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। মার্কিন পুঁজি তথা বহুজাতিক সংস্থাগুলোর একচেটিয়া ব্যবসা, স্থানীয় অর্থনীতি তথা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, কোথাও কোথাও ক্ষমতায় গিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে জমি বিতরণ, বড় শিল্প জাতীয়করণ করা ইত্যাদি কারণে বাম তথা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এ অঞ্চলে জনপ্রিয় করেছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কিউবা এই বাম রাজনীতিকে সমর্থন করতো। ফলে এই বাম রাজনীতিকে কমিউনিস্ট মাতাদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং মার্কিনি ঘেঁষা দক্ষিণপন্থি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে প্ররোচিত করেছিল। সমাজতন্ত্রের পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর সামরিক অভ্যুত্থানের প্রবণতা কমে গেছে। একুশ শতকের শুরুতেই সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। যদিও রাজনীতিতে একটা দক্ষিণপন্থি প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

উপনিবেশবাদের নব্যরূপ

আফ্রিকাতে ইউরোপের উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছিল অনেক আগেই। আফ্রিকার দেশগুলো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এক এক করে স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু অবাক করার বিষয়, কোনো কোনো আফ্রিকান দেশ এখনও উপনিবেশ কর (Colonial Tax) পরিশোধ করছে। এ রকম একটি সংবাদ কিছুদিন আগে ছাপা হয়েছিল একটি গণমাধ্যমে। উক্ত গণমাধ্যমে ১৪টি আফ্রিকান দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এখনও বাধ্যতামূলকভাবে কর পরিশোধ করছে। *CS Globe* এর এক রিপোর্টে এ ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে (Liam S. Whittaker, 14 African Countries who Still pay Colonial Tax to France. Jan 9, 2016)। ফ্রান্স কীভাবে ওইসব দেশকে শোষণ করেছে, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে কম শিক্ষার হার রয়েছে, এমন ১০টি দেশের মাঝে শতকরা ৮০ ভাগ দেশই একসময় ফ্রান্সের কলোনি ছিল, যারা *Francophone Africa* হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ এইসব দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ফ্রান্স আদৌ কোনো অবদান রাখেনি। দেশগুলোতে শিক্ষার হার অনেকটা এ রকম : বেনিন (৪০ ভাগ), বুরকিনা ফাসো (২৬ ভাগ), চাদ (৩৪ ভাগ), আইভরি কোস্ট (৪৯ ভাগ), গায়ানা (২৯ ভাগ), মালি (২৩ ভাগ), নাইজার (২৯ ভাগ), ও সেনেগাল (৪২ ভাগ)। ইতিহাস বলে ফ্রান্সের ২০০ বছরের উপনিবেশবাদী যুগে দেশটি মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল

কলোনিগুলোতে। এটা ছিল ইন্দো-চীনে, অর্থাৎ আজকের যে অঞ্চল ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস নামে পরিচিত। আর ১৯৬০ সালে ১৫০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন ওই দেশে মাত্র একজন ছিলেন পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী। মজার কথা হচ্ছে, উপনিবেশ যুগে ফ্রান্স এইসব অঞ্চলে যেসব ভবন নির্মাণ করেছিল, আজও ওইসব ভবন থেকে দেশটি ভাড়া আদায় করে। ১৪টি আফ্রিকান দেশ থেকে ফ্রান্স এখনও কর আদায় করে। আরো একটা তথ্য দেই– যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ডিসির প্রেসিডেন্টের ভবন 'হোয়াইট হাউজ' যা ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এবং যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৭৯২ সালে, এর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখনও ব্রিটেনকে ভাড়া দেয় (ওই)। এমনকি স্নায়ুযুদ্ধকালীন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে যেসব স্থাপনা নির্মাণ করেছিল, সেখান থেকে রাশিয়া এখনো ভাড়া আদায় করে। পার্থক্যটা এখানেই যে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দীর্ঘ সময় পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন ছিল। কিন্তু ১৯৯০ এর পর থেকে পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব থেকে বেরিয়ে গেলে, আজ তারা সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীন। রাশিয়ার ওপর তাদের কোনো নির্ভরতা নেই। উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলো এখনো শতকরা একশ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে পারেনি। প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যায় তারা এখনো ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল। নিজস্ব ভাষা তাদের হারিয়ে গেছে। ফরাসি ভাষা এখনো ব্যাপকভাবে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২৯টি Francophone দেশের ৪৩০ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৪৩ কোটি মানুষ এখনও ফরাসি ভাষায় দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ থেকেই বোঝা যায় ভাষা কীভাবে উপনিবেশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় (৬ জানুয়ারি ২০০৬) আফ্রিকা মহাদেশের মানুষ ২০০০টি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এর মাঝে ৩৭টি ভাষা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হারিয়ে যাবে। ৩০০ ভাষা আছে, যা মাত্র ১০ হাজার মতো লোকের ভাষা। আর Sheng নামে নতুন এক ভাষার জন্ম হয়েছে, যা ইংরেজি, সোহেলি ও স্থানীয় মাতৃভাষার সংমিশ্রণ। ১৯৬০ সালের দিকে কেনিয়ার নাইরোবিতে এ ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিবেশবাদের বিস্তার : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া

> In the last half of the 18th century, all the major states of Southeast Asia were faced with crisis. The great political and social structures of the classical states had begun to decay, and, although the reasons for this disintegration are not altogether clear, the expanded size of the states, the greater complexity of their societies, and the failure of older institutions to cope with change all must have played a part.
>
> **Pattern of a Colonial Age**
> **Britannica**

আমরা সংক্ষেপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশবাদ বিস্তারের ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করবো। প্রথমেই আলোচনা করা যাক থাইল্যান্ড নিয়ে। দশম শতাব্দীতে মন এবং খেমাররা চীনের দক্ষিণ-পূর্বাংশে যে রাজত্ব গড়ে তোলে তা ধীরে ধীরে সিয়াম হিসেবে পরিচিত হয়। থাইল্যান্ডের ইতিহাস মানেই রাজতন্ত্রের ইতিহাস। শুরু থেকেই থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্রের বিস্তৃত প্রভাব বিদ্যমান। ৮০০ বছরের থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১. সুকোথাই (Sukhothai) রাজতন্ত্র : ১২৩৮-১৩৪৭, ১৪৩০-১৪৩৮ খ্রিষ্টাব্দ; ২. আয়ুথায়া (Ayuthaya) রাজতন্ত্র : ১৩৫০-১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ; ৩. থাওবুড়ি (Thouburi) রাজতন্ত্র : ১৭৬৭-১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ; ৪. রাত্তানকসিন (Rattanakosin) রাজতন্ত্র : ১৭৮২-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ (বর্তমান সময় পর্যন্ত)। এদের মধ্যে রাত্তানকসিন রাজতন্ত্র রামা রাজা (King Rama 9th) হিসেবে পরিচিত। প্রয়াত রাজা ভূমিবল এই রাজতন্ত্রেরই উত্তরসূরি। বর্তমান রাজা মাহা ভাজিরালংকর্ন (Vajiralongkorn) ২০১৯ সাল থেকে থাইল্যান্ডের রাজা। থাইল্যান্ড কখনো কোনো ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ ছিল না। তবে ১৯০৩ সালে থাইল্যান্ডের সাথে মালয়ের রেল যোগাযোগ তৈরি হয়, যা থাইল্যান্ডের সাথে ব্রিটেনের যোগাযোগকে সহজ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী

সময়ে থাইল্যান্ডের স্বাধীনতার উপর বেশ কয়েকবার আঘাত আসে। ওই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপকহারে ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা কলোনি স্থাপন করে। থাইল্যান্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো একের পর এক ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের কলোনি হতে থাকে। ওই সময়ে থাইল্যান্ড দুই ঔপনিবেশিক শক্তির মাঝে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ হচ্ছে ফিলিপাইনস। চল্লিশ হাজার বছরের পুরানো জনবসতির দেশ হলেও ফিলিপাইনস নামকরণ করা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। ওই সময় স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে এদেশের নামকরণ করে ফিলিপাইনস। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনাপ্রবাহের মধ্যদিয়ে ফিলিপাইনস আজকের এ অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইনস মূলত ৭১০৭টি ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ। এর উত্তরে তাইওয়ান, পশ্চিমে ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া। ৭১০৭টি দ্বীপকে মূলত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। লুজন (Luzon), ভিসায়াস (Visayas) ও মিন্দানাও (Mindanao)।

১৫২১ সালে প্রথমবারের মতো কোনো ইউরোপিয়ান হিসেবে পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত স্প্যানিশ অভিযাত্রী ফার্ডিনান্ড ম্যাগিলান ফিলিপাইনসে আগমন করেন। তিনি দ্বীপটিকে স্পেনের বলে দাবি করেন। তবে ফিলিপাইনসের ঔপনিবেশিকরণ শুরু হয় ১৫৬৫ সালে। ওই সময় মেক্সিকো থেকে অভিযাত্রী Miguel Lopez De Legazpi সেবু (Cebu) দ্বীপে প্রথম বসতি গড়ে তোলেন। ১৫৭১ সালে ম্যানিলা ও তোন্দো রাজ্য দখল করে নেয় স্প্যানিশরা এবং ম্যানিলাকে রাজধানী করে স্প্যানিশ ইস্ট ইন্ডিজ প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় ফিলিপাইন শাসিত হতো মেক্সিকো থেকে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যসমূহের অনৈক্য সেখানে স্প্যানিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে অনেক সহজ করে তুলেছিল। সমগ্র ফিলিপাইনসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর স্প্যানিশরা স্থানীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। এছাড়া বিভিন্ন ইউরোপীয় সভ্যতার উপাদান এখানে নিয়ে আসে, যেমন– বিধি, আইন, ছাপাখানা, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ইত্যাদি। এছাড়া তারা লাতিন আমেরিকা থেকে ভুট্টা, আনারস, চকলেট ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীও এ অঞ্চলে নিয়ে আসে। ১৭৬২-১৭৬৪ সময়কালে ফিলিপাইনসে ব্রিটিশরা আক্রমণ করে। তবে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে তার মীমাংসা করা হয়েছিল। ১৫৬৫ সাল থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত ফিলিপাইনস মেক্সিকো থেকে শাসিত হলেও ১৮১০ সালে মেক্সিকোতে বিদ্রোহের ফলে ১৮২১ সাল থেকে ফিলিপাইনস সরাসরি মাদ্রিদ থেকে শাসিত হতে শুরু

করে। ওই সময় মিশনারিরা ফিলিপাইনসে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ১৮৬৩ সালে এক ডিক্রির মাধ্যমে ফিলিপাইনসে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয় এবং স্প্যানিশ ভাষায় শিক্ষা প্রদান শুরু হয়। চুক্তির মাধ্যমে স্পেন ২০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিউবা, পুয়ের্তোরিকো ও গুয়ামের পাশাপাশি ফিলিপাইনসের কর্তৃত্বও আমেরিকার কাছে ছেড়ে দেয়। সেটা ১৮৯৮ সালের কথা। এরপর ফিলিপাইনসে আমেরিকান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ফিলিপিনোরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত চলা এ যুদ্ধে কমপক্ষে ৩৪ হাজার ফিলিপিনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে এবং আরও প্রায় দুই লক্ষ লোক যুদ্ধ পরবর্তী মহামারিতে মারা যায়।

১৯১৬ সালের জোন্স অ্যাক্ট (Jones Law) ও ১৯৩৪ সালের টাইডিংস-ম্যাকডুফি (Tydings Mcduffie Act) অ্যাক্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ১৫ নভেম্বর ফিলিপাইন কমনওয়েলথ গঠিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ম্যানুয়েল কুজন (Manual Quezon)। তিনি সার্বভৌম ফিলিপাইনের প্রস্তুতি শুরু করেন। এ প্রস্তুতি বিঘ্নিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি আগ্রাসনের জন্য। সেসময় কুজন দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং হোসে লরেলের নেতৃত্বে পুতুল সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। জাপানের কর্তৃত্বে ফিলিপাইনস চলে যায় ১৯৪২-৪৫ সময় সীমায়। তবে ১৯৪৪-৪৫ সালে জাপানি বাহিনী চলে গেলে কুজনের উত্তরসূরি সার্গিও ওসমানিয়া দেশে ফেরেন। জাপানি আগ্রাসনের সময় প্রায় এক লক্ষ লোক মারা যায়। ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিপাইনের স্বাধীনতা প্রদান করে। স্বাধীনতা প্রদান করলেও আজও ফিলিপাইনে ক্লার্ক বিমানঘাঁটি পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিপাইন চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯৪৬ সাল থেকেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরকারবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে।

তৎকালীন সময়ে মিয়ানমার ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একটি প্রদেশ। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে মিয়ানমার বা বার্মা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য এর আগেই ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের বলে দেশটি আলাদা ডোমিনিয়নের মর্যাদা পায়। চল্লিশের দশক থেকেই ভারত ও বার্মার রাজনৈতিক অবস্থান পৃথক হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা জাপানের দখলে চলে যায়। ব্রিটিশ শাসিত ভারত তখন মিত্র পক্ষে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্মা আবার ব্রিটিশদের দখলে আসে। ওই সময় বার্মায় বর্তমান মিয়ানমারের অধিসংখ্যক নেত্রী অং সান সুচির পিতা জেনারেল অং সানের নেতৃত্বে সশস্ত্র স্বাধীনতা

আন্দোলন চলছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে বার্মার স্বাধীনতা লাভের আগেই আততায়ীর গুলিতে বেশ ক'জন রাজনৈতিক সহযোগীসহ জেনারেল অং সান নিহত হন। উল্লেখ্য, বার্মা শব্দটি বার্মিজ শব্দ বামার থেকে এসেছে, যা মিয়ানমার নামের সমার্থক। ব্রিটিশ শাসন আমলে মিয়ানমার বার্মা নামেই প্রচলিত ছিল।

আজকের মালয়েশিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হলে মালয়েশিয়ার উপনিবেশের ইতিহাস নিয়ে প্রথমে আলোচনা করতে হবে। কেদাহ্‌র সুলতান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পেনাং দ্বীপ লিজ দেন, যার মাধ্যমে ১৭৮৬ সালে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশরা তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮২৪ সালের অ্যাংলো-ডাচ চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশরা মালাক্কা দখল করে। এই চুক্তি অনুযায়ী পুরো মালয় দ্বীপপুঞ্জকে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়, যেখানে মালয় ব্রিটিশদের ভাগে পড়ে। ১৮২৬ সালে মালয়-এর ৪টি স্থানে ব্রিটিশরা তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে (পেনাং, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর, লাভুয়ান দ্বীপ)। এই চারটি স্থানের একত্রীকরণের ফলে ব্রিটিশরা Straits-Settlement-এর রাজপ্রতিনিধিদের উপনিবেশ স্থাপন করে, যার প্রশাসনিক কাজ প্রথম দিকে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে এই উপনিবেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রথমে পেনাং এবং পরে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হয়। এ কেন্দ্র পরবর্তীতে লন্ডনের ঔপনিবেশিক অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক মালয় রাজ্য তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। Straits-Settlement অনুযায়ী যেহেতু ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন মালয় রাজ্যের টিন খনিসমূহের সংশ্লিষ্ট ছিল, তারা মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। Pangkor Treaty of 1874 চুক্তি অনুযায়ী (ব্রিটেনের সাথে পেরাকের সুলতানের) মালয়ে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। বিংশ শতাব্দীতে পাহাং, মেলাংগোর, পেরাক এবং নেগেরি সেম্বিলান (সংযুক্ত মালয় রাজ্য হিসেবে পরিচিত) কার্যত ব্রিটিশ অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যাদের কাজ ছিল মালয় শাসকদের নির্দেশনা দেওয়া। ব্রিটিশরা উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত থাকলেও তারা মালয় শাসকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতো। যে পাঁচটি রাজ্য ওই সময় অসংযুক্ত মালয় রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে লন্ডনের শাসনাধীন ছিল না, তারাও এক পর্যায়ে ব্রিটিশ উপদেষ্টাদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে উত্তরের চারটি রাষ্ট্র পার্লিস, কেদাহ, কেলন্তান এবং তেরেঙ্গানু প্রথমে ইংল্যান্ডের সিয়ামিজ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অপর অসংযুক্ত রাষ্ট্র জোহর ছিল একমাত্র রাষ্ট্র যা

উনিশ শতকের প্রায় পুরো সময়ই স্বাধীন ছিল। ব্রিটিশরা উত্তর বোর্নিয়া থেকে সাবাহ নিয়ন্ত্রিত করতো এবং সারাওয়াক রাজ্য ব্রুনাই কর্তৃক ব্যক্তিগত রাজ্য হিসেবে Brook পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল, যারা শ্বেত রাজা (White Rajahs) হিসেবে শাসন করতো। মালয়ে উপর্যুপরি জাপানি আক্রমণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দখল সেখানে স্বাধীনতার দাবিকে জনপ্রিয় করে তোলে। যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ পরিকল্পনা ছিল মালয় প্রশাসনকে একক রাজপ্রতিনিধিদের উপনিবেশের অধীনে আনা। এই পরিকল্পনা মালয়দের বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তারা চীনাদের নাগরিকত্ব অনুমোদনের বিরোধিতা করে। একমাত্র সিঙ্গাপুর ব্যতীত মালয়ের সকল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যের সমন্বয়ে ১৯৪৬ সালে মালয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে তা Federation of Malaya কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ নিরাপত্তার আড়ালে মালয় শাসকদের স্বৈরশাসন। Federation of Malaya (Malay Persekutuan Tanah Malaya) নামের ফেডারেশনটি ১১টি রাজ্য নিয়ে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৮ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিল। নয়টি মালয় রাজ্য, পেনাং ও মালাক্কার ব্রিটিশ বন্দোবস্ত একত্রে মিলে এই ফেডারেশন গঠন করে এবং পরে এটি মালয়েশিয়ায় রূপ লাভ করে। সিঙ্গাপুর এই ফেডারেশনে থাকলেও, ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর বেরিয়ে যায় এবং আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ১৩টি রাজ্য ও ৩ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্রটি গঠিত।

ইন্দোনেশিয়া শব্দটি মূলত একটি ভৌগোলিক পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ। ভৌগোলিক অর্থে এক সময় ইন্দোনেশিয়া ও মালয় উপদ্বীপকে একত্রে মালয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত সকল দ্বীপপুঞ্জগুলোকে বোঝাতে ইন্দোনেশিয় কথাটি ব্যবহার করতেন। বর্তমানে যে অঞ্চলটি ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত ওই অঞ্চলটি অতীতে 'নুশানতারা' (Nusantara) নামে পরিচিত ছিল। নুশানতারা শব্দটির মূল অর্থ হলো অন্য দ্বীপপুঞ্জ। অর্থাৎ, এখানে অন্য দ্বীপপুঞ্জ বলতে বোঝানো হয়েছে বালি ও জাভা থেকে দৃশ্যমান সকল দ্বীপপুঞ্জকে।

১৪৮৭ সালে পর্তুগালের বার্তোলোমিয়াউ দিয়াস (Bartolomeu Dias) উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করেন। দশ বছর পর ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে পৌঁছান। ১৫০০ সালে পর্তুগিজরা কালিকটের দক্ষিণে কোচিন শহরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৫০৭ সালে Socotra'র Suq এ ১ম কেল্লা ও ১৫১৫ সালে ওরমুজে (Ormuz) ২য় কেল্লা নির্মাণের মাধ্যমে লোহিতসাগর এবং পারস্যসাগরে তাদের আধিপত্য চলে আসে। মালাক্কা সম্পর্কে পর্তুগিজরা

আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৫১১ সালে মালাক্কা তারা অধিকার করে, কিন্তু স্থানীয় জনসমাজের উপর তারা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৫২৬ সালে পর্তুগিজদের সাথে স্থানীয়দের মিত্রতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে ও একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ওই সময় ব্রুনাইয়ের সুলতান ছিলেন বালকিয়া। ১৫৩০ সালে সেখানে পর্তুগিজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। একই সাথে পুরো মালাক্কায় পর্তুগিজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মালাক্কা বা মসলা দ্বীপপুঞ্জের সাথে একটি চুক্তির বলে পর্তুগিজরা মসলা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। গোয়া থেকে মালাক্কায় তারা কার্পাস বস্ত্র নিয়ে যেত। মালাক্কায় এগুলো মসলার সাথে বিনিময় করা হতো। একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল পর্তুগিজদের এবং পুরো সামুদ্রিক কর্তৃত্বও ছিল তাদের। ১৫৪৩ সালে তারা জাপানের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ১৫৫৭ সালে ম্যাকাও দখল করে। পর্তুগাল থেকে অনেক খ্রিষ্টান ধর্মযাজক মালাক্কায় আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ফ্যান্সিস জেভিয়ার। ১৫১১ সালে তারা মালাক্কা দখল করলে ভারতীয় বণিকগণ শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমান বণিকরা মালাক্কা ত্যাগ করে উত্তর সুমাত্রার আচেহতে আশ্রয় নেয়। ভারতীয় বণিকরা পশ্চিম জাভা, ব্রুনাই ও মাকাসারে চলে আসে। গুজরাটি বণিকরা বাণিজ্যপথ পরিবর্তন করে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রাচীন পথ বা মারগুই বা টেনাসেরিম দিয়ে শ্যাম অঞ্চল পেরিয়ে আরেকটি বাণিজ্য পথ খুঁজে নেয়। সামগ্রিকভাবে ভারতমহাসাগরীয় বাণিজ্যে গুজরাটিদের বিপুল ক্ষতি হয়। পর্তুগিজরা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিল। ওই বন্দরে তারা একটি দ্বিভাষী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পর্তুগিজদের নানাভাবে সহায়তা করে। প্রায় দুই শতকেরও বেশি সময় পর্তুগিজ ভাষা এশীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। ষোড়শ শতকের শেষে পর্তুগিজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এসেছিল ডাচ ও ইংরেজরা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে পর্তুগালের স্থান নিয়েছিল ইংরেজরা। হল্যান্ডের (ডাচ) প্রতিরোধের সামনে ব্রিটেনকে পিছু হটতে হয়েছিল। ডাচরাও পর্তুগিজদের মতো বাণিজ্যের জন্য এখানে এসেছিল। তবে তারা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেনি। ১৫৮০ সালে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেন ও পর্তুগালের সম্মিলন ঘটলে লিসবনের বন্দর ডাচ বা ওলন্দাজের হাতে আসে এবং ডাচরা নিজেদের উদ্যোগে প্রাচ্যে আসেন। ১৫৯৬ সালে তারা এখানে পৌঁছায়। Cornelius Van Houtman ছিলেন ওই অভিযানের নেতা। ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ইংরেজরা ছিল স্পেনের শত্রু। ওই অঞ্চলে সর্বপ্রথম যে ইংরেজ আসেন, তিনি জেমস ল্যাঙ্কাস্টার (James Lancaster)। তিনি মালাক্কায় বিভিন্ন পর্তুগিজ জাহাজ লুণ্ঠন করেন। ১৬০২ সালে কয়েকটি

প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে ডাচরা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (Vereenigde Ostindische Companie) প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বলা হয়–বাণিজ্য, জাহাজ চালনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে এই কোম্পানির হাতে। স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ স্বার্থে প্রাচ্যে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ওই কোম্পানির হাতে। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড ১৬১৯ সালে লন্ডনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইংরেজরা ক্ষমতা বিস্তারে অধিক মনোযোগী হয়। ১৬৪৪ সালে যাবতীয় পর্তুগিজ অঞ্চল ওলন্দাজ অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৮০ সাল নাগাদ নেদারল্যান্ড ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৭৯৮ সালে ডাচ সরকার কোম্পানির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়াতে সরাসরি ডাচ শাসন শুরু হয়। ১৮০৮ সালে গভর্নর জেনারেল H. W Daendels আইন ও শাসন কাঠামোর সংস্কার সাধন ও জাভার ভূসম্পত্তির উপর ডাচ মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১১-১৮১৬ সাল পর্যন্ত জাভা ইংরেজদের অধীনে ছিল। ওই সময় জমির খাজনা আদায় প্রবর্তন করা হয়। ১৮১৬ সালে ইন্দোনেশিয়া পুনরায় ডাচদের হাতে ফিরে আসে। ১৮২৫-৩০ সালে ডাচ সরকার ও জাভার শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ১৮৩১-১৮৭৭ সালের মধ্যে নেদারল্যান্ডের রাজকোষে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৮২৩,০০০,০০০ গিল্ডার অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এই অর্থ দিয়ে সরকার ঋণশোধ করে, বেলজিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যয়ভার বহন ও রেলপথ তৈরি করে। ১৯০০ সালে ডাচ শাসন নীতিতে বৈচিত্র্য আসে। ফলে দুই দেশের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়। ডাচ ঔপনিবেশিক নীতির এই সব কার্যক্রম ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এদের পাশাপাশি যুব সংগঠনগুলোও একটি ভূমিকা পালন করেছিল। হাজি আগাস সলিম কর্তৃক তরুণ মুসলিম লীগ গঠন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৬ সালে এই যুব সংগঠনটি ধর্মনিরপেক্ষ একটি যুব সম্মেলন আহ্বান করে। উক্ত সম্মেলনে *ইন্দোনেশিয়া এক, এক জাতি, এক ভাষা* এইরূপ স্লোগান দেওয়া হয় এবং জাভার প্রাচীন রাজ্য মাতারামের লাল-সাদা পতাকা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া হল্যান্ডে অধ্যয়নরত ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইন্দোনেশিয়া জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ডাচ সরকার দমননীতি গ্রহণ করলে ওই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে *সারেকাত ইসলাম* নামে একটি সংগঠনের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯১২ সালে জাভাবাসীর স্বার্থ রক্ষায় এটি গঠিত হয়েছিল। এর মূল দায়িত্ব ছিল ব্যবসা ও বিশ্ব মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণ। গ্রামের মুসলমান সমাজে এর প্রভাব পড়ে

ব্যাপকভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইন্দোনেশিয়ায় বামপন্থি দলগুলো তাদের কার্যকলাপের সুযোগ পায়। ১৯২০ সালে ইন্দোনেশিয়ায় সাম্যবাদী দল PKI গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে এই দল গণবিদ্রোহের সৃষ্টি করতে চাইলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। ওই সময় তেরো হাজার যুবককে গ্রেফতার করা হয় এবং প্রায় ৪৫০০ যুবককে জেলে প্রেরণ করা হয়। সারেকাত ও সাম্যবাদী দলের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে ১৯২৭ সালে একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হয় যা ১৯২৮ সালে নামকরণ করা হয় PNI বা *Partai Nasional Indonesia*। এর উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা বা মারদেকা অর্জন। এটি মূলত গড়ে ওঠে সুকর্নোর বান্দুং পাঠচক্র বা Bundung Study Group-কে কেন্দ্র করে। সুকর্নো তার আকর্ষণীয় ও জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে দ্রুত এটিকে একটি গণপার্টিতে রূপান্তরিত করেন। ১৯২৯ সালে পিএনআইর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। ১৯৩১ সালে পিএনআই-এর প্রাক্তন সদস্য সারাতোনো PNI-এর মতো সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে আরেকটি দল পারতিন্দো (Partindo) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালের শেষের দিকে মুক্ত হয়ে সুকর্নো পার্টির সভাপতির দায়িত্ব নেন। তার গতিশীল নেতৃত্বে পারতিন্দো (Partindo) পার্টি দ্রুত গণপার্টিতে পরিণত হয়। ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এর ৫০টি শাখা খোলা হয় এবং সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার। সরকার এরূপ জনপ্রিয় দলকে সহ্য করতে না পেরে সুকর্নোকে নির্বাসনে পাঠায়। ১৯৩৯ সালে Fedaration of Indonesian Political Parties দেশের গুরুত্বপূর্ণ নয়টি দলকে একত্রিত করে একটি জাতীয়তাবাদী মহাসম্মেলন আহ্বান করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৪২ সালে জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে নেয়। জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে : (ক) সেনাবাহিনীর সপ্তম ব্রিগেড দ্বারা শাসিত সুমাত্রা অঞ্চল; (খ) সেনাবাহিনীর সপ্তদশ ব্রিগেড দ্বারা শাসিত জাভা মাদুরা অঞ্চল; (গ) নৌবাহিনী দ্বারা শাসিত পূর্বাঞ্চল। জাপানিরা ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সুকর্নো এবং হাতার মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা ১৯৪৩ সালের মার্চে একটি সংগঠন গঠন করে জনগণকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেন। তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করেন। এই বাহিনীর কার্যক্রম জাভা, মাদুরার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও যেহেতু অসংখ্য জাতীয়তাবাদী এতে সক্রিয় ছিল এবং সদস্যরা দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এতে এসেছিলেন তাই সংস্থাটি জাভানিজ না হয়ে ইন্দোনেশীয় জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী কোইসো ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং নৌবাহিনীর তহবিল হতে সুকর্নো ও হাতাকে জাতীয়তাবাদী প্রচার অভিযানে সাহায্য করা হয়। এদিকে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সরকারি উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য ৬২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ছাড়াও একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। এই উপকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সুকর্নো। সরকার সকল দায়িত্বভার কমিটি ও উপকমিটির হাতে ছেড়ে দেয়। সরকারের এত উদার হবার পিছনে বিশ্বাস ছিল যে, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে জাতীয়তাবাদীরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে না। ওই কমিটি একটি ঝগড়া শাসনতন্ত্র রচনা করে। ১৯৪৫ সালের ১ জুন সুকর্নোর *পঞ্চশীলা* নীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সুকর্নো স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট সকালে সুকর্নো জাকার্তায় নিজ বাসভবনের সামনে অনাড়ম্বর, কিন্তু ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশাল জনতার সামনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৮ আগস্ট জাতি পায় একটি শাসনতন্ত্র ও জাতীয় সেনাবাহিনী (এমএনআই)। সুকর্নো রাষ্ট্রপতি ও হাতা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন গোষ্ঠী হতে ১৩৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে ৮টি প্রশাসনিক প্রদেশে ভাগ করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট ইন্দোনেশিয়া জাপানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় সত্য, কিন্তু তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র দেড় মাস। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এজন্যই এই স্বাধীনতার স্বাদ মাত্র দেড়মাস তারা ভোগ করতে পেরেছিল। ১৯৪৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ডাচ স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে। এর ফলে মুক্তিকামী ইন্দোনেশীয় ও ডাচদের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ১৯৪৬ সালের ১৫ নভেম্বর ডাচ এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীরা Linggadjati* চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী জাভা ও সুমাত্রার উপর ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। বাকি দ্বীপপুঞ্জের জন্য স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। তখন বলা হয়, কালক্রমে এসব দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হবে *ইউনাইটেড স্টেটস* অব ইন্দোনেশিয়া এবং এই ইন্দোনেশিয়া ডাচ ও যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা মাত্র তিন মাস পর অচল হয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালের মে মাসে একটা আপস-মীমাংসার জন্য পুনরায় উভয়পক্ষের একত্রে বসানের ব্যবস্থা করা হয়। রোয়েম-ভান-রোয়েম (Roem-Van-Roijen)

* Linggadjati নামে একটি গ্রাম, যেখানে জাভা, সাদুরা ও সুমাত্রার এক কর্তৃত্ব (Kuningan Regency) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডাচদের তাতে স্বীকৃতি ছিল।

আলোচনায় (৭ মে, ১৯৪৯) হেগ সরকার পুনরায় আগের চুক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে। ওই গোলটেবিল বৈঠকে ইউনাইটেড ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের শর্তাদি নির্ধারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই গোলটেবিল বৈঠক ১৯৪৯ সালের ২৩ আগস্ট হতে ২ নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ তিন মাস হেগে অনুষ্ঠিত হয়। এই গোলটেবিল বৈঠকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও নয়া প্রজাতন্ত্রকে ৪৩ লক্ষ গিল্ডার ঋণের বোঝা গ্রহণ করতে হয় এবং পশ্চিম ইরিয়ানার সমস্যা পরবর্তীকালে মীমাংসার জন্য রাখা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর আমস্টারডামে রানি জুলিয়ানা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ওই দিন জাকার্তার গভর্নর জেনারেল ভবন হতে ডাচ পতাকা নামিয়ে ইন্দোনেশীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আর এভাবেই জন্ম হয় স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার।

নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন সুকর্নো এবং হাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদসহ সাময়িক গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং শাসনতন্ত্র ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ১৯৫০-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সময়টিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর পর গণতন্ত্রের নামে সুকর্নো সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়টি ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গাইডেড ডেমোক্র্যাসির অধ্যায়। এই সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সুকর্নো 'গাইডেড ডেমোক্রেসি' বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তবে বেশিমাত্রায় তিনি পিকেআই বা কমিউনিস্টদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। পরিণামে ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জেনারেল সুর্হাতো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। প্রসঙ্গক্রমেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

১৯২০ সালের পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সত্যিকার অর্থে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিদেশি কর্তৃত্ব ও ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ কিছু ব্যক্তি, কিছু দল ও সংগঠন বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বুদিউতোমো (Budi Utomo) এমন একটি সংগঠন, যারা ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটা বড় অবদান রেখেছিল। বুদিউতোমো সমিতি গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি চেতনার সমষ্টিগত উন্মেষ ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের লক্ষে এটি ছিল ইন্দোনেশিয়ার প্রথম সংগঠন। এই সংগঠন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র এতে নিহিত ছিল। তাই পরবর্তীকালে এর প্রতিষ্ঠা দিবস ২০ মে

জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই সংগঠনের মূলমন্ত্র ছিল : *দশজনে একত্রিত হয়ে দশের জন্য কাজ করার প্রবল ইচ্ছা*। এটিই ছিল জাতীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ। ১৯০৮ সালে বুদিউতোমোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াহিদীন সোয়েদির সোয়েইসোদো (Wahidin Soedirohoesodo)। ১৯০৯ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার অভিজাত মানুষ। ১৯১৩ সালের দিকে সংগঠনটিতে তরুণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে। সংগঠনটি গণমুখী হলেও কখনও গণসংগঠনে রূপ নেয়নি। ১৯২৪ সালে সুতোমো সুরাবায়ার একটি ইন্দোনেশীয় পাঠচক্র (Indonesia Study Club) গঠন করেন। এই পাঠচক্রের উদ্দেশ্য ছিল এর সদস্যদেরকে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার যোগ্য নাগরিকতার শিক্ষাদান। এছাড়া ১৯২৬ সালে বান্দুং-এ তরুণ প্রকৌশলী সুকর্নো সাধারণ পাঠচক্র (General Study Club) গঠন করেন। ১৯৩০ সালের দিকে জাতীয়তাবাদীরা ও সুকর্নো স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কারারুদ্ধ হলে সুতোমোর মতো পুরনো মধ্যপন্থী ব্যক্তিত্বই স্বাধীনতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩১ সালে সুতোমার উদ্যোগে Union of the Indonesian People নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের দিকে বুদিউতোমো তার দলের সাথে একত্রিত হলে 'পারিন্দা' (Parinda) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

ডাচ শাসনের বিরোধিতা করে ১৯১২ সালে সংস্কারবাদী ধর্মীয় সংগঠন মুহাম্মদিয়া গড়ে ওঠে। খ্রিস্টান মিশনারির কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই সংগঠন কাজ করতে থাকে। ১৯২০ সালের দিকে এই আন্দোলন বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সালে জাভায় এর ১২টি, ১৯৩৭ সালে ৯১৩টি শাখা ও সুমাত্রায় মোটে ৩৭০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি কোনো দিন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ভিয়েতনাম। পশ্চিমাদের ভিয়েতনামে প্রবেশের মধ্যে দিয়েই আধুনিক ভিয়েতনামের জন্ম। পশ্চিমারা কখন থেকে ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ করে তার নির্দিষ্ট তারিখ বলা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে ধারণা করা হয় একটি অভিযাত্রী পর্তুগিজ দল ১৫১৬ সালে ইন্দোচীন প্রদক্ষিণ করে। মিশনারিজরা ১৫২৭ সালে ভিয়েতনাম পরিদর্শন করে। প্রথম সামরিক ব্যক্তি হিসেবে ক্যাপ্টেন Antonio da Faria ১৫৩৫ সালে ভিয়েতনামে আসেন। তিনি একটি পর্তুগিজ বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন Dang-এর ১৫ মাইল দক্ষিণে Faiso-তে। ১৫৯৬ সালের মধ্যে Faiso-তে অনেকগুলো মিশনারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় পর্তুগিজ,

স্প্যানিশ এবং ফরাসি অনেক Jesuits, অর্থাৎ, ধর্মপ্রচারকের আগমন ঘটে। এদের মধ্যে Alexgender of Rhodes নামে Jesuit ছিলেন অন্যতম। তিনি ৬ মাসের মধ্যে ভিয়েতনামিদের প্রশিক্ষণ দেন, যার মাধ্যমে ভিয়েতনামি ভাষাকে ল্যাটিন রূপ দেওয়া হয়। তবে পর্তুগিজরা সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও, ফরাসিরা সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পুরো ইন্দোচীনই ছিল ফরাসিদের দখলে। ফরাসি শাসক নেপোলিয়ন ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে ভিয়েতনামে সামরিক অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নে মিশনারিজ প্রতিষ্ঠা করা। দূরপ্রাচ্যের নৌ কমান্ডার অ্যাডমিরাল Rigault de Genouilly-কে পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। চারটি যুদ্ধজাহাজে আড়াই হাজার সৈন্য ছাড়াও মিশনারিজ উপদেষ্টা Monsignor Pellerin ৩১ আগস্ট ১৮৫৮ সালে Tourane পৌঁছান। একদিন পরে তারা পুরো উপত্যকা এবং Tourane শহর দখল করে নেয়। ১৮৫৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ফরাসি বাহিনী দক্ষিণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সফলভাবে সায়গন অধিকার করে। ১৮৯৩ সালের মধ্যে ফরাসিরা লাওস এবং কম্বোডিয়ায় তাদের সীমানা বিস্তৃত করে। তাদের দখলিকৃত রাজ্যগুলোকে ইন্দোচীন ইউনিয়ন নামকরণ করা হয়। ফরাসিদের ভিয়েতনাম কলোনি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা এবং ফ্রান্সের শিল্পায়নে সহায়ক কাঁচামাল সংগ্রহ করা। ফরাসি বিনিয়োগকারীরা চাল, কয়লা, দুর্লভ খনিজ সম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতো। অধিকাংশ শিল্পকারখানাগুলো স্থাপিত হয়েছিল সায়গন, হ্যানয় এবং বন্দরনগরী হাইফংএ। ভিয়েতনামে ফরাসি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পরিবর্তে দ্রুত লাভ নিয়ে যাওয়া। মুনাফার কোনো অংশই তারা পুনরায় বিনিয়োগ করতো না। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতি ভিয়েতনামিদের শুধুমাত্র শোষণই করেছে, কিন্তু কোনো উন্নয়ন বয়ে আনেনি। ফরাসি ঔপনিবেশিক আমলে ভিয়েতনামে এক ধরনের স্থানীয় ভূস্বামী শ্রেণি গড়ে উঠেছিল যারা স্থানীয় দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করে বিত্তবান হয়েছিল।

ফান বই চাও (Phan Boi Chau) ভিয়েতনামের একজন আধুনিক চিন্তাবিদ সর্বপ্রথম সরাসরি ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি ভিয়েতনামের উন্নয়নের জন্য রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেন। ১৯০৫ সালে তিনি জাপানে যান এবং ভিয়েতনামের *Gia Long* সাম্রাজ্যের যুবরাজ Chongpe-কে তার রাজতন্ত্রের রাজা ঘোষণা করেন। চাও-এর ছত্রছায়ায় শত শত ভিয়েতনামিকে জাপানে পাঠানো হয় উচ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত

হওয়ার পাশাপাশি সশস্ত্র কার্যকলাপে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। ১৯০৭ সালে হ্যানয়-এর একদল বুদ্ধিজীবী *Free School of Tongue* গঠন করেন, যা ফরাসি বিরোধী কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। চাও চীনেও যান এবং ১৯১২ সালে একটা রিপাবলিকান সরকার গঠন করেন। তিনি ভিয়েতনামের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের গ্রুপগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু ফরাসি সরকারের চাপে চীনারা তাকে গ্রেফতার করে এবং ১৯১৭ সালে মুক্তি দেয়। কিন্তু ফরাসিরা একদল বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট সমর্থকের মাধ্যমে চাওকে সাংহাই থেকে অপহরণ করিয়ে ভিয়েতনামে নিয়ে আসে এবং গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

ওই সময় বেশ কিছু গুপ্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিল *Viet Nam Quoe Dan Dang*, যা VNQDD নামে পরিচিত ছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে। ২৩ বছর বয়সি একজন শিক্ষক Nauyen Thai Hoe Tong King এটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সশস্ত্র আক্রমণের নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তী নেতাদের মধ্যে হো চিন মিন (Ho Chi Minh) ছিলেন অন্যতম। তিনি ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ছিলেন। ১৯৪০ সালের দিকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়ার জন্য হো চি মিন ভিয়েতনামে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইন্দোচীন প্রত্যক্ষভাবে জাপানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ১৯৪০ সালের আগস্টে। ওই সময়ে নভেম্বর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তম প্লেনামে জাপানি ফ্যাসিবাদী ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সময় পার্টি চীনের কোয়াং-এ একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ভিয়েতনামি বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভিয়েতনামি কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম দিকে চীন ও রাশিয়া দুটো দেশ থেকেই সাহায্য পেয়েছে। ১৯৪১ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আট মাস ধরে গেরিলা যুদ্ধ চলে। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়। এদিকে ১৯৪৫ সালের ৯ মার্চ জাপানিরা সমগ্র ইন্দোচীনে তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। কিন্তু ভিয়েতনামের গেরিলাদের অগ্রযাত্রা তারা রোধ করতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর তারা হ্যানয় অবরোধ করেন ও শত্রুমুক্ত করেন। হো চি মিন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। পুরো উত্তরাঞ্চল, অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনামে ওই সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বাও দাইকে প্রধান করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত হয় আরেকটি সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়তায় ফরাসিরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফিরে আসে। ১৯৪৫

সাল থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত যে সময়সীমা, ওই সময়সীমায় উত্তর ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকারের উপর 'চাপ' অব্যাহত রাখে। ১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে ভিয়েতকংদের আক্রমণে ফরাসি ঘাঁটি দিয়েন ফু'র পতন ঘটে। পরবর্তীতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি গণভোটের মাধ্যমে বাও দাইকে পদচ্যুত করে নাগো দিয়েম নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। দিয়েম সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছিল। ১৯৬৩ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে দিয়েম সরকারের পতন ঘটেছিল। এর পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৬৪ সালে টংকিং উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর উপর উত্তর ভিয়েতনামের বোমাবর্ষণের ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেয়। এর আগে ১৯৬১ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওই যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। এমনি এক পরিস্থিতিতে উত্তর ভিয়েতনামের উদ্যোগে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত হয়েছিল জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট বা National Liberation Front। এদিকে ১৯৬৭ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন প্রভাবাধীন একটি নির্বাচনে নগুয়েন ভন থিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। শহরাঞ্চলে থিও সরকারের কিছুটা প্রভাব থাকলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো চলে গিয়েছিল লিবারেশন ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ফলে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ ও বিপ্লবীদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য প্যারিসে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি একটি চুক্তির মারফত যুদ্ধের সাময়িক বিরতি হয়। এর পর ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিও পদত্যাগ করলে জেনারেল ভ্যান মিন তার স্থলে প্রেসিডেন্ট হন। অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনামের হো চি মিনের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন টুন ডাক থাঙ। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল সায়গন দখল করে। এর মধ্যে দিয়ে ভিয়েতনাম ঔপনিবেশিক শক্তি মুক্ত হয়।

কম্বোডিয়া প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কম্বোডিয়ার রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুরু হয় ফুনান রাজতন্ত্রের দ্বারা। আর সেটা প্রথম শতাব্দীর ঘটনা। কম্বোডিয়ার মেকং নদীকে ঘিরে ফুনান রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ফুনান রাজ্যের রাজধানী ছিল বধ্যপুরা যা বর্তমানে প্রে ভেং প্রদেশের বানাম শহরে অবস্থিত। ফুনানরা অস্ট্রো এশিয়াটিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বলে ধারণা করা হয়। ফুনানদের মাঝে ভারতীয় ধর্ম, বা হিন্দুদের বিষ্ণুবাদ, রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা এবং রীতিনীতির সাথে মিল ছিল। প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজতন্ত্রের একটি অংশ হিসেবে ফুনান রাজ্যকে (৬৮-৬২৭) গণ্য করা হতো। ভারতীয়রা এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার

করেছিল। ভারতীয়দের এ আগমনের পরিচয় মিলে ফুনানদের ভাষায়। ফুনানদের ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো। ফুনান রাজ্যের বিস্তার পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত লাওস ও থাইল্যান্ডের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফুনান রাজ্যের অধীনে ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে এ সকল রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা লাভের জন্য ফুনান রাষ্ট্রের বিরোধিতা শুরু করলে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ফুনান রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। সপ্তম শতাব্দীতে ফুনান রাষ্ট্র তার ক্ষমতা হারায়। চেলনা ফুনান রাষ্ট্রেরই অধীনস্থ একটি রাষ্ট্র ছিল যা ফুনান রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে কম্বোডিয়ার ক্ষমতা দখল করেছিল। চেলনা রাজ্যের লিখিত যোগাযোগের মাধ্যম ছিল খেমার ভাষা। চেলনা রাজ্যের (৫৫০-৮০২) রাজা শ্রুতবর্মণের শাসন আমলে, চেলনা রাজ্য ফুনান রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ তিন শতাব্দী তাদের জয় অভিযাত্রা চলতে থাকে। এর পর কিছুদিন জাপানিদের হাতে চলে যায় চেলনা রাজ্য। পরে খেমারি শাসক দ্বিতীয় জয়াবর্মণ জাপানিদের থেকে খেমার জাতির স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন এবং খেমার সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু করেন (৮০২-১৪৩১)।

অ্যাংকর সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু হয় দ্বিতীয় জয়াবর্মণ দ্বারা খেমার রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অ্যাংকর সাম্রাজ্য নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে ছিল। এ সময় খেমার সভ্যতা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়। অ্যাংকর সাম্রাজ্যের সময়েই বর্তমান কম্পুচিয়া বা কম্বোডিয়া নামের উৎপত্তি ঘটে, যা পূর্বে কম্বুজা নামে পরিচিত ছিল। জাভানীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে দ্বিতীয় জয়াবর্মণ একক রাজধানী স্থাপনের পরিবর্তে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রাজা প্রথম ইন্দ্রবর্মণ খেমার সাম্রাজ্য পশ্চিমে বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রাজা দ্বিতীয় সুরীয়াবর্মণ (Suryavarman) অ্যাংকরীয় রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন চম্পা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার মাধ্যমে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চম্পা রাজ্য একসময় ফুনান রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। অ্যাংকরীয় রাজাদের মধ্যে সুরীয়াবর্মণ একজন সফল রাজা ছিলেন। তার রাজ্যজয় মধ্য ভিয়েতনাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার শাসন আমলেই অ্যাংকর ওয়াট মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সুরীয়াবর্মণ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে ভিয়েতনামিদের সহযোগিতায় চম্পা রাষ্ট্রের দ্বারা খেমার রাষ্ট্র আক্রান্ত হতে থাকে। পরবর্তীতে সপ্তম জয়াবর্মণ কর্তৃক চম্পা শাসকদের বিতাড়িত করা হয়। সপ্তম জয়াবর্মণ তার পূর্বসূরিদের অনুসৃত হিন্দুধর্ম থেকে সরে এসে মাহায়না (Mahayana) বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হন ও এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার মৃত্যুর পর কম্বুজা ছোট ছোট রাজ্যে

বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বল হয়ে যায়। এবং পশ্চিম দিক দিয়ে থাইল্যান্ড কর্তৃক আক্রমণের শিকার হতে থাকে। এ সময় কম্বুজায় শ্রীলঙ্কার থেরাভেদা (Theravada) বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। ওই সময় হিন্দু ও মাহায়না বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের প্রভাব হ্রাস পায়। থাই সৈন্যদের আক্রমণে অ্যাংকর অঞ্চল তার গৌরব হারায়।

১৮৬৩ সালে থাইল্যান্ড নরোদেমকে কম্বোডিয়ার রাজা হিসেবে মনোনীত করে। তিনি কম্বোডিয়ার প্রথম আধুনিক কম্বোডিয়ার রাজা হিসেবে বিবেচিত। তিনি প্রতিবেশী থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামিদের হাত থেকে কম্বোডিয়াকে রক্ষার্থে ফ্রান্সের কাছে আশ্রিত রাজ্যের দাবি জানান। ১৮৬৭ সালে থাই রাজা ফ্রান্সের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এই শর্তে যে কম্বোডিয়ার কিছু প্রদেশ থাই রাজ্যের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে থাই রাজা প্রদেশগুলো কম্বোডিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ফ্রান্স ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল অর্থাৎ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এভাবে ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কম্বোডিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থায়ী ছিল। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কম্বোডিয়া দখল করার চেষ্টা করেছিল। ইন্দোচীনে ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থাপন করার লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করা এবং এ অঞ্চলের উৎপাদিত ভোগ্য দ্রব্য নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। ১৯০৪ সালে নরোদম মৃত্যুবরণ করলে সিসোয়াত সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিসোয়াত নরোদেমের ভাই ছিলেন, যিনি ফ্রান্স কর্তৃক রাজা হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তৎকালীন রাজা মনিভং মৃত্যুবরণ করলে সিংহাসন খালি হয়ে যায়। মনিভং সিসোয়াতের পুত্র ছিলেন। ওই সময় ফ্রান্স মনিভং-এর পুত্র মনিরেথকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তার পরিবর্তে রাজা সিসোয়াতের পৌত্র নরোদম সিহানুক সিংহাসনে আরোহণ করেন মাত্র ১৮ বছরে বয়সে। ১৯৪৯ সালে কম্বোডিয়াকে ফরাসি কর্তৃত্বাধীনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। ওই সময় নরোদম সিহানুক কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা দাবি করেন। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর কম্বোডিয়া চূড়ান্ত স্বাধীনতা লাভ করে ফ্রান্সের কাছ থেকে। ত্রিশ বছর তিনি কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। প্রথমদিকে এ স্বাধীনতা সুখের হলেও তা বেশিদিন সুখের হয়নি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন সিহানুক। মার্কিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামি গেরিলাদের ঘাঁটি ছিল কম্পুচিয়ায়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে সিহানুক রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ ভ্রমণ করলে, সিআইএ-এর ষড়যন্ত্রে জেনারেল লন নল নমপেনে ক্ষমতা দখল করেন।

মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। মিয়ানমার কোনো এক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র নয়। একাধিক নৃ-গোষ্ঠী এই দেশটিতে বসবাস করে। ব্রিটিশরা সর্বপ্রথম মিয়ানমারে আসে ১৮২৪ সালে। মিয়ানমার ৬২ বছরেরও বেশি সময় ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। ১৮৮৬ সালে মিয়ানমার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত মিয়ানমান ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অঞ্চলের বাণিজ্য বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশরা চাইনিজ ও ভারতীয়দের এখানে নিয়ে আসে। এখনও অনেক ভারতীয় জনগোষ্ঠী রেঙ্গুন ও মান্দালয় বসবাস করছে। ব্রিটিশ শাসনামলে আরও অনেক স্কুল, রাস্তাঘাট এমনকি অনেক কারাগার তৈরি করা হয়েছে যার অনেক অংশ এখনও বিদ্যমান।

বার্মিজদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অনেক পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, যা প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩০ সালের এক আন্দোলনের মাধ্যমে, যা পুরো ইয়াঙ্গুন শহরকে প্রায় অচল করে ফেলেছিল। তৎকালীন বেশিরভাগ অসন্তোষের মূলে ছিল ব্রিটিশদের বার্মিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন মনোভাব। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশরা বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানে জুতা খুলে যেতে অস্বীকার করতো, যা ছিল বার্মিজদের জন্য চরম অবমাননাকর। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৯ সালে Shwedagon প্যাগোডায় বার্মিজরা জুতা পরিহিত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ওই মঠের নেতাকে আজীবন কারাবাস দেয়া হয়। এই ঘটনা বার্মিজদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আরো বেশি উৎসাহিত করে এবং বার্মিজরাও বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে আরো গতি সঞ্চার করে। এই ঘটনার পর থেকেই বৌদ্ধদের মঠগুলো বার্মিজদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। অনেক আন্দোলনকারী এ সময় মারা যায়। উ উয়িসারা (U Wisara) নামে একজন সাধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনস্বরূপ ১৬৬ দিন অনাহারে থাকার পরে মারা যান ১৯২৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে মিয়ানমার ভারতীয় প্রশাসন থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও ভারতীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকা ও না থাকা নিয়ে মিয়ানমারবাসীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা যায়। ১৯৪০ সালে অং সান ৩০ জন কমরেড নিয়ে *বার্মিজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি* গঠন করেন, যার প্রত্যেক সদস্যই জাপান থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিয়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাপানি সৈন্যদের আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের পতন ঘটে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে থাকে।

প্রাথমিকভাবে জাপানের এই মিয়ানমার অভিযান সফল হয়েছিল এবং ব্রিটিশরা প্রায় বিতাড়িত হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা মূলত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা পুনরায় আক্রমণ করে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা দেশটিকে পুনরায় তাদের আয়ত্তাধীন করে। যদিও বেশিরভাগ বার্মিজ যুদ্ধে জাপানিদের সাহায্য করেছে। কিন্তু তারপরও প্রান্তিক পর্যায়ের উপজাতীয়রা ব্রিটিশদের সাহায্য করেছে। যুদ্ধের শেষদিকে আমেরিকানরাও জাপানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করেছে। ১৯৪২-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অং সান-এর নেতৃত্বে *বার্মিজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি* এবং *আরাকান ন্যাশনাল আর্মি* জাপানের সাথে যুদ্ধ করে মিয়ানমার হতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায়। ১৯৪৭ সালে কিছু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অং সানসহ তার কিছু ক্যাবিনেট সদস্যকে হত্যা করেন।

লাওসের ইতিহাস থেকে জানা যায় ফানগুম নামের একজন রাজকুমার ১৩৫৩ সালে বিভক্ত লাওসকে একত্রিত করে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। নতুন রাজ্যের নাম হয় লান জাং-Lan Xang। স্থায়িত্ব ছিল ১৩৫৩-১৭০৭ পর্যন্ত। ১৮৮৩ সালে ফ্রান্স লাওসকে তার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে। তখন সমগ্র ইন্দোচীন ছিল ফরাসি শাসনাধীন। শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল হ্যানয়। এখান থেকেই এক ফরাসি গভর্নর জেনারেল সমগ্র ইন্দোচীনের শাসনকর্ম পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে জাপান ফ্রান্সকে হটিয়ে সমগ্র ইন্দোচীন দখল করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে জাপানের পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালে রাজা সিসাভাং ওডং (১৯৪৬-১৯৫৯) এর সহযোগিতায় ফ্রান্স আবার লাওস ফিরে পায়।

১৯৪০-এর দশকে সমগ্র ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ঢেউ প্রবাহিত হয়েছিল, তার প্রভাব লাওসেও লাগে। প্রিন্স ফেটসারাথের (Phetsarath) নেতৃত্বে স্বাধীন লাও আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের অন্যান্য নেতার মধ্যে ছিলেন প্রিন্স সুভানা ফুমা ও তার বৈমাত্রেয় ভাই সুভানা ভং। ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় সুভানা ভং বামপন্থি মতাদর্শে দীক্ষা নেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রিন্স ফেটসারাথ সমগ্র লাওসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল করে দেন। কিন্তু রাজা সিসাভাং ভং ফ্রান্সের সাথে আবার চুক্তি করেন। ১৯৪৬ সালে লাওসের তিনটি অঙ্গরাজ্য লুয়াং প্রবাং, ভিয়েনসিয়েন ও চামপাশা একত্রিত করা হয়। সিসাভাং ভং ছিলেন লুয়াং প্রবাংয়ের রাজা। ফরাসিরা তাকে ঐক্যবদ্ধ লাওসের রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে লাওসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি সংবিধান প্রণয়ন করে ১৯৪৭ সালের মে মাসে। সংবিধান অনুযায়ী লাওসকে একটি নিয়মতান্ত্রিক

রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং রাজাকে সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা জাতীয় পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। এদিকে স্বাধীন লাও আন্দোলনকারীরা ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংককে প্রিন্স ফেটসারাথের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠন করে। কিন্তু কিছুদিন পরই এই আন্দোলন ডান ও বাম দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে থাইল্যান্ডে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটলে নতুন সরকার স্বাধীন লাও আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। প্রিন্স সুভানা ভং ভিয়েতনামি কমিউনিস্টদের সহায়তায় তার আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ডানপন্থি জিয়েং মাও ও মধ্যপন্থি সুভানা ফুমা আন্দোলনের সাথে তার সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও লাওসে ফিরে যান। ১৯৪৯-এর জুলাইয়ে ফরাসি ইউনিয়নের অধীনে লাওসকে স্বাধীন রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালে সুভানা ফুমা রাজতন্ত্রী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সুভানা ভংয়ের নেতৃত্বে লাও পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। ফ্রন্টের সশস্ত্র শাখা প্যাথেট লাও নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে রাজকীয় সরকার ও লাও দেশপ্রেমিক পেট্রিয়টিক ফ্রন্টের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ ও দেশকে একত্রিত করার ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়। কিন্তু অচিরেই তা আবার ভেঙে যায়। দেশটি কার্যত দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতোমেধ্যে ইন্দোচীনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। লাওসের ব্যাপারেও তারা হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৯৬২-এর জুনে সুভানা ফুমার নেতৃত্বে রাজতন্ত্রী, মধ্যপন্থি ও প্যাথেট লাও-এর সমন্বয়ে একটি সরকার গঠিত হয়। পরের মাসে অনুষ্ঠিত ১৪ জাতি সম্মেলনে লাওসের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারি সৈন্যরা একযোগে প্যাথেট লাও বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালে প্যাথেট লাও কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসে।

প্যাথেট লাও নিয়ন্ত্রিত এলাকা দিয়ে ভিয়েতনামি মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ পথ হোচি মিন ট্রেইলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ওই সমস্ত এলাকায় বারবার বোমাবর্ষণ করে। অবশেষে ১৯৭১-এর ৯ ফেব্রুয়ারি মার্কিন বিমানবাহিনীর ছত্রছায়ায় দক্ষিণ ভিয়েতনামি সৈন্যরা লাওসের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদিকে সমগ্র ইন্দোচীনের প্রেক্ষাপট পালটে যেতে শুরু করে। ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে প্যারিসে ভিয়েতনাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে লাওসের সংঘর্ষ অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে লাওসে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। সুভানা ফুমা প্রধানমন্ত্রী ও সুভানা ভং জাতীয় রাজনৈতিক কাউন্সিলের

চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে কম্পুচিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনপন্থি সরকারের পতন ঘটে। লাওসেও রাজতন্ত্র বিলোপের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৫ সালেই কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে এবং লাওসকে 'পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' (এলপিডিআর) হিসেবে ঘোষণা করে। এর মধ্যে দিয়ে লাওসের ৬৫০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ও দেশটিতে একদলীয় শাসন চালু হয়।

দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়ার উপনিবেশবাদের ইতিহাস মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন তথা ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করার আগে এই অঞ্চলে সীমিত সময়ের জন্য পর্তুগিজ ও ফরাসিরা এসেছিল। এমনকি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে যুদ্ধের খবরও আমরা জানি। ইতিহাস বলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত। এরপর সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বার্মা বা মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত না হলেও দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ। দেশটিতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৪ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্তুগিজ বণিকরা এ অঞ্চলে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করা। ইতিহাস বলে ভাস্কো দা গামা ভারতের কালিকটে (কেরালার রাজ্যে) এসেছিলেন ১৪৯৮ সালের ২৭ মে। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে উপনিবেশ শাসনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। ১৫০৫ সালে তিন বছর মেয়াদে পর্তুগালের রাজ প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন আলমাইদা (Francisco de Almeida), চার বছর পরে এলেন আলবুকার্ক (Albuquergue) প্রাচ্যে পর্তুগিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার বড় অবদান ছিল। তিনি গোয়ার (১৫১০) পাশাপাশি মালাক্কা (১৫১১) ও পারস্য উপসাগরে অরমুজ (Ormuz) (১৫০৭), পর্তুগিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে পর্তুগিজরা সুরাট, দমন, বেমসিন সালসেট, মুম্বাই, কালিকট, কোচিন, নেগপাওমাং-ত্রানিটম ইত্যাদি বন্দর দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগিজ শাসন ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর কারণ ছিল পর্তুগিজদের সাথে ওলান্দাজ, অর্থাৎ হল্যান্ডের দ্বন্দ্ব। তারপর পর্তুগিজদের সাথে ইংরেজদের এবং এক পর্যায়ে ওলন্দাজ আর ইংরেজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বিস্তার করার প্রতিযোগিতা। এইসব প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে পর্তুগিজদের

ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে ইউরোপে ওলান্দাজ ইংরেজি আর ফরাসিদের সাথে পাল্লা দিতে ব্যর্থ হয়ে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ১৫৬৫ সালে বিজয় নগরা (Vijaynagara) সম্রাজ্যের পতন ঘটলে (দক্ষিণ ভারতে, ১৩৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত), পর্তুগিজদের সর্বশেষ আশ্রয়ও আর থাকলো না। পর্তুগিজদের ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ায় ওই জায়গায় ওলান্দাজরা তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে, সুরাট, কালিকট, কোচিন, বাংলায় কাশিমবাজার, উড়িষ্যার বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ওলান্দাজরা তাদের ঘাঁটি গাড়ে। ১৭৫৯ সাল পর্যন্ত ওলান্দাজ আর ইংরেজদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। ইতিহাস বলে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলান্দাজ, ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের দিকে। এক্ষেত্রে ডেনমার্কের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৭৫৫ সালে শেরামপুরে (Serampore, West Bengal), বেলজিয়াম ১৭২৩ সালে ব্যারাকপুরের কাছে বাকীবাজারে, ১৭৩১ সালে সুইডেনও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার ব্যর্থতাই ইংরেজদের ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী শাসন করার পথ প্রশস্ত করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা। ১৬০৮ সালে এই কোম্পানি সুরাটে প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এর নেতৃত্বে East India Company তৎকালীন বাংলা ও বিহার থেকে শুল্ক আদায় করার অনুমতি পায়। এক তথ্যে দেখা যায়, ১৭০৮-৪৮ এই চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষ থেকে কোম্পানির উদ্যোগে ইংল্যান্ডে আমদানি প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা বেড়ে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছিল, আর রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ওই সময় কোম্পানি বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়। এখানে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া নিয়েও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ১৬৬৪ সালে এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৭০ সাল নগদ ফরাসিরা ভারতবর্ষের দিকে নজর দেয়। এর পূর্বে তারা সুরাটে একটি কুঠি বানায় ও গোলকুন্ডার সুলতানের ফরমান নিয়ে মসলিন কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়। কিন্তু ব্রিটিশদের সাথে দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে ফরাসিরা হেরে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল। পাঠকমাত্রই পলাশী যুদ্ধের কথা স্মরণ করতে পারেন। পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছিলেন।

সারণি : ৭

ভারতে ব্রিটিশ শাসন

কোম্পানি আমল (১৭৭৪-১৮৫৮)

১৭৭৪-৮৫	ওয়ারেন হেস্টিংস
১৭৮৫-৮৬	জর্জ ম্যাকফারসন (হীরেন মুখোপাধ্যায়)

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ক্রমবিকাশ

	ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন
১৬০০	ডাচ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন
১৬০২	কালিকটের জামোরিনের সঙ্গে ওলন্দাজের চুক্তি
১৬০৪	ইংরেজ ক্যাপ্টেন হকিন্স এর ভারত আগমন ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের
১৬০৮	কাছ থেকে চারটি কারখানা স্থাপনের অনুমতি সংগ্রহ।
	সুরাটে ইংরেজদের প্রথম কারখানা স্থাপন
	'আম্বয়না'তে ওলান্দাজদের হাতে ইংরেজদের পরাজয়
১৬২৩	হুগলীতে পর্তুগিজ দমন
১৬৩২	ইংরেজদের বোম্বাই লাভ
১৬৬১	শায়েস্তা খান কর্তৃক পর্তুগিজ দমন
১৬৬৫	ফ্রাঁসোয়া মাত্যা কর্তৃক পন্ডিচেরির প্রতিষ্ঠা
১৬৭৪	ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিয়ে আওরঙ্গজেবের ফরমান জারি
১৬৮০	ইংরেজদের হুগলী শহর আক্রমণ ও লুণ্ঠন
১৬৮৬	ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী বাকীবাজারে বেলজিয়ামের কারখানা স্থাপন
১৭২৩	সুইডেন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা
১৭৩১	দ্যুপ্লেক্সের পন্ডিচেরির শাসনভার গ্রহণ
১৭৪২	প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ
১৭৪৪-৪৮	দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ
১৭৫০-৫৪	শ্রীরামপুরের কাছে ডেনিসদের কারখানা স্থাপন
১৭৫৫	ক্লাইভের কলিকাতা অধিকার
১৭৫৭	২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ
	পন্ডিচেরির পতন
১৭৬১	বাংলায় নবাবী আমলের অবসান।
১৭৬৯	ইংরেজ কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্তি
১৭৬৬	ইংরেজদের সাথে নিজামের চুক্তি
১৭৮৪	টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে সন্ধি
১৮০১	কর্নাটকের ইংরেজ শাসনচুক্তি
১৮০৯	ইংরেজ কর্তৃক শিখদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন
১৮২৪-২৬	বার্মার সাথে ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ
১৮৫২	ব্রিটিশ বাহিনি কর্তৃক রেঙ্গুন অধিকার
১৮৫৭-৫৮	সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজ কর্তৃক দিল্লি দখল

এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির কাছ থেকে ভারত শাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের হাতে। রানি ভিক্টোরিয়া ছিলেন ব্রিটেনের রানি। ১৮৭৬ সালে রানি ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবেও ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চল শাসন তথা ব্যবসা বাণিজ্য করা। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ব্রিটেন ভারতবর্ষ থেকে ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ ও সম্পদ লুট করেছিল (১৭৬৫-১৯৩৮)। এই পরিমাণ অর্থ যুক্তরাজ্যের বর্তমান যে মোট জিডিপি তার ১৭ গুণ বেশি। উৎস পাটনায়েকের (Utsa Patnaik) এর এক গবেষণায় এই তথ্যটি উঠে এসেছে। Shubhra Chakrabarti and Utsa Patnaik সম্পাদিত গ্রন্থ Agrarian and other Histories এ এই তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে (Aljazeera, 19 December 2018)।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে এমন যে কেউই চোখ বুজে বলে দিতে পারবে, ব্রিটিশরা এই সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ থেকে যথেচ্ছ সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ব্রিটেনে এখনও মানুষকে ভুল ধারণার বশবর্তী করে রাখা হচ্ছে। সেখানে এখনও তথাকথিত মিথের প্রচলন রয়েছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাকি তাদের জন্য একেবারেই লাভজনক ছিল না, বরং প্রশাসনিক কাজে প্রচুর পরিমাণে অর্থ তাদেরকে গচ্ছা দিতে হয়েছে। তারপরও এটি ব্রিটিশদের বদান্যতা যে তারা দয়া করে ভারতবর্ষে মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে, ভারতবর্ষের 'প্রজা' দেরকে কৃপা করে শাসন করে গেছে! এই ধারণা যে কতখানি ভুল, তা ধরিয়ে দিতেই যেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে *Dispossession, Deprivation, and Development* নামক আরো একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ উৎস পাটনায়েক। সেখানে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রায় দুই শতকের কর ও বাণিজ্যের খতিয়ান বয়ানের মাধ্যমে তিনি সোজা সাপটা হিসাব তুলে ধরেছেন। ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের সম্পদ পাচার করে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা এই অভিমত উৎস পাটনায়েকের। এই ৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আজকের দিনেও যুক্তরাজ্যের জিডিপি (গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট)-এর ১৭ গুণ বেশি! সম্পদ পাচারের বিষয়টি প্রধানত সংঘটিত হয়েছে বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে। সাম্রাজ্য স্থাপনের আগ পর্যন্ত ব্রিটেন ভারতবর্ষ থেকে টেক্সটাইল ও চালের

মতো পণ্য ক্রয় করতো সরাসরি ভারতীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে। আর এসব পণ্যের বিনিময়মূল্য তারা পরিশোধ করতো সাধারণ উপায়ে- প্রধানত রূপার মাধ্যমে, যেমনটি তারা অন্যান্য দেশের বেলায়ও করে থাকত। কিন্তু ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কুক্ষিগত করার পর থেকেই এই ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। তারা ভারতীয় বাণিজ্যে মনোপলি স্থাপন করে। এবং এই মনোপলির মূলভিত্তি ছিল কর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশ থেকে কর সংগ্রহ শুরু করে, এবং চতুরতার সাথে তারা সংগৃহীত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করতে থাকে ভারতবর্ষ থেকে পণ্য ক্রয়ের কাজে। সহজ কথায় বলতে গেলে, ভারতীয় পণ্য কিনতে নিজেদের পকেট থেকে টাকা খরচের পরিবর্তে, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা সেগুলো কোনো অর্থব্যয় না করেই সংগ্রহ করতে থাকে।



চিত্র : ভারতে দুর্ভিক্ষ : ঔপনিবেশিক শাসনের ফল

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তারা কৃষক ও তাঁতিদের কাছ থেকে পণ্য দাম দিয়েই কিনছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিনিময়ে সেই অর্থই প্রদান করছে, যা তারা কিছুকাল আগে এই কৃষক-তাঁতিদের কাছ থেকেই হাতিয়ে নিয়েছে! কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ ভারতীয়ই এই বিষয়গুলো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। কারণ যে প্রতিনিধিরা তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে আসত, ঠিক তারাই তো আবার তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতে আসত না। অশিক্ষিত ভারতীয়দের পক্ষে তখন এটি বোঝা সম্ভবপর হয়নি যে গ্রহীতা ও দাতা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হলেও, তাদের মূল উৎস আসলে অভিন্ন এবং তাদের মাঝে যোগসাজশ বিদ্যমান রয়েছে।

সারণি : ৮

ভারতে ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারল ও ভাইসরয়

কোম্পানির আমল [১৭৭৪-১৮৫৮]

১৭৭৪-৮৫	ওয়ারেন হেস্টিংস	১৮২৩-২৮	লর্ড আমহার্স্ট
১৭৮৫-৮৬	স্যার জন ম্যাকফারসন	১৮২৮	উইলিয়ম বেইলি
১৭৮৬-৯৩	লর্ড কর্নওয়ালিস	২৮-৩৫	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
৯৩-৯৮	স্যার জন শোর	৩৫-৩৬	*চার্লস মেটকাফ
৯৮	স্যার এ. ক্লার্ক	৩৬-৪২	লর্ড আকল্যান্ড
১৭৯৮-১৮০৫	লর্ড ওয়েলেসলি	৪২-৪৪	লর্ড এলেনবরা
১৮০৫	লর্ড কর্নওয়ালিস	১৮৪৪	উইলিয়ম বার্ড
১৮০৫-০৭	*স্যার জন বার্লো	৪৪-৪৮	লর্ড হার্ডিং
০৭-১৩	প্রথম লর্ড মিন্টো	৪৮-৫৬	লর্ড ডালহৌসি
১৩-২৩	লর্ড হেস্টিংস	৫৬-৫৮	লর্ড ক্যানিং
১৮২৩	*জন অ্যাডাম		

ব্রিটিশ সরকারের আমলে [১৮৫৮-১৯৪৭]

১৮৫৮-৬২	লর্ড ক্যানিং	১৮৯৯-১৯০৫	লর্ড কার্জন
৬২-৬৩	প্রথম লর্ড এলগিন	১৯০৪	লর্ড অ্যাম্পটহিল
১৮৬৩	*স্যার রবার্ট নেপিয়র	০৫-১০	দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো
১৮৬৩	স্যার উইলিয়ম : ডেনিসন	১০-১৬	দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং
		১৬-২১	লর্ড চেমসফোর্ড
৬৪-৬৯	স্যার জন লরেন্স,	২১-২৫	লর্ড রিডিং
৬৯-৭২	লর্ড মেয়ো	১৯২৫	*দ্বিতীয় লর্ড লিটন
১৮৭২	*স্যার জন স্ট্রেচি	২৬-৩১	লর্ড আরউইন
১৮৭২	*লর্ড নেপিয়র	১৯২১	লর্ড গসচেন
৭২-৭৬	লর্ড নর্থব্রুক	৩১-৩৬	লর্ড উইলিংডন
৭৬-৮০	লর্ড লিটন	১৯৩৪	স্যার জর্জ স্ট্যানলি
৮০-৮৪	লর্ড রিপন	৩৬-৪৩	লর্ড লিনলিথ্ গো
৮৪-৮৮	লর্ড ডাফরিন	৪৩-৪৭	মার্চ লর্ড ওয়াভেল
৮৮-৯৪	লর্ড ল্যান্সডাউন	১৯৪৭	মার্চ–১৪ আগস্ট '৪৭ লর্ড মাউন্টব্যাটেন
৯৪-৯৯	দ্বিতীয় লর্ড এলগিন		

ভারত ডোমিনিয়নের গভর্নর-জেনারল

১৯৪৭-৪৮	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
১৯৪৮ জানুয়ারি–১৯৫০ সাল	চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি

ভারতবর্ষে উৎপাদিত পণ্যের সুনাম ছিল গোটা ইউরোপ জুড়েই এবং সেগুলো যেহেতু অন্য আর কোনো দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে পাওয়া যেত না, তাই ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা সেই সকল পণ্যের উপর এমনকি শতভাগ লাভও করতে পারত। ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত পণ্যের এরূপ পুনঃরপ্তানির মাধ্যমেই ব্রিটেন সরাসরি কিছুর উৎপাদক না হয়েও ইউরোপের বাজারের অন্যতম বড় খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে আত্মসাৎ করা যেসকল পণ্য ব্রিটিশরা নিজেরাই ভোগ করতো, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো লোহা, তার ও টিম্বার; কেননা এগুলো ব্রিটেনের শিল্পায়নের কাজে লাগত এবং এভাবেই, ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল থাকে ভারতবর্ষ থেকে করা পদ্ধতিগত চৌর্যবৃত্তির উপরই।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের ফলস্বরূপ ব্রিটিশ রাজ সরাসরি ভারতবর্ষের ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এর ফলে ঔপনিবেশিকদের লাভের গুড় খাওয়া কিন্তু এতটুকুও হ্রাস পায় না, বরং কর ও পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থায় আরও নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়। ভারতবর্ষ থেকে যে দেশই পণ্য ক্রয় করতে চাইত না কেন, তাদেরকে সেই পণ্য কিনতে হতো বিশেষ ধরনের কাউন্সিল বিল ব্যবহারের মাধ্যমে। কাউন্সিল বিল হলো এমন এক ধরনের কাগজের মুদ্রা, যা কেবল ব্রিটিশ রাজের তরফ থেকেই প্রদান করা হতো এবং এই কাউন্সিল বিল হাতে পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল সরাসরি লন্ডনে গিয়ে সোনা বা রূপার বদলে তা ক্রয় করা। তাই ব্যবসায়ীরা লন্ডন থেকে সোনা বা রূপা দিয়ে বিল সংগ্রহ করতো, আর তারপর সেই বিল কাজে লাগিয়ে ভারতীয় উৎপাদকদের দাম মেটাত। তারপর ভারতীয় উৎপাদকরা যখন স্থানীয় কলোনিয়াল অফিসে গিয়ে সেই বিল ক্যাশ করতো, তারা হাতে পেত সেসব ভারতীয় রুপি, যা ব্রিটিশ রাজ কর সংগ্রহের মাধ্যমে এই ভারতীয়দের কাছ থেকেই পেয়েছে। সুতরাং আরও একবার, ভারতীয় উৎপাদকরা যেভাবে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থ আয় করতো, সেখানেও ছিল ব্রিটিশদের বড় ধরনের জালিয়াতি। কেননা যে সোনা ও রুপাগুলো সরাসরি ভারতীয় উৎপাদকদের হাতে যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো হাতিয়ে নিয়েছে তারা নিজেরাই। আর তার বদলে ভারতীয় উৎপাদকদেরকে তারা দিয়েছে সামান্য কিছু কাগজের মুদ্রা। আর কে না জানে, কাগজের মুদ্রার দাম বাড়ে খুবই ধীরগতিতে, কিন্তু সোনা ও রুপার দাম বাড়তে থাকে হু হু করে। এভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি ব্যবস্থার শিকার হয়ে ভারতবর্ষ বাকি বিশ্বের চেয়ে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বড় ধরনের লোকসান করতে থাকে, যার ফলে বাকি বিশ্ব ক্রমশই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও, ভারতবর্ষ যে

তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে থাকে। আর তাদেরকে ঠকিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে থাকে ব্রিটেন।

ভারতবর্ষের সম্পদে ব্রিটেনের উন্নয়ন এই সবকিছুর প্রভাবে সময়ের সাথে সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ঘাটতি বাড়তে থাকে যা পর্যবেক্ষণ করে সাদা চোখে অনেকেরই মনে হতে পারে, ভারতবর্ষ বুঝি ব্রিটেনের কাছে বোঝা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা ছিল একদমই ভিন্ন। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের কাছে সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো। ভারতবর্ষ পিছিয়ে যাচ্ছিল বলেই ব্রিটেন এগিয়ে যেতে পারছিল।

ভারতবর্ষ থেকে আত্মসাৎকৃত অর্থের মাধ্যমেই ব্রিটেন প্রচণ্ড রকমের ধনী হয়ে ওঠে, আর নব্যলব্ধ অর্থ তারা নতুন করে বিনিয়োগ করতে থাকে নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি ও পুরানো উপনিবেশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার কাজে। যেমন- ভারতবর্ষ থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের সাহায্যেই ১৮৪০ এর দশকে চীন আক্রমণের সাহস দেখাতে পেরেছিল ব্রিটেন। আবার ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহি বিপ্লব দমনের হাতিয়ারও ছিল এই অর্থই। এজন্যই পাটনায়েক বলেন, "ভারতবর্ষের সীমানার বাইরেও নতুন সাম্রাজ্য দখল করতে ব্রিটেন যেসব যুদ্ধে জড়িয়েছে, সবসময়ই তার প্রধান ও পুরো ভাগটা এসেছে ভারত থেকে অর্জিত আয়ের মাধ্যমেই।" এবং এখানেই গল্পের শেষ নয়। ভারতীয় অর্থনীতির আশীর্বাদধন্য হয়েই ব্রিটেন ইউরোপ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় উপনিবেশ, যেমন কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়, পুঁজিবাদের বিস্তার ঘটাতে পেরেছিল। তাই বলা যায়, কেবল ব্রিটেনের শিল্পায়নই নয়, গোটা পশ্চিমা বিশ্বের শিল্পায়নেই নেপথ্য ভূমিকা রেখেছে এই ভারতবর্ষই।

পাটনায়েক ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষকে চারটি পৃথক অর্থনৈতিক সময়কালে বিভক্ত করেন, এবং প্রতিটির মধ্য পর্যায় হতে বর্তমান পর্যন্ত ন্যূনতম ৫ শতাংশ মুনাফার হার ধরে হিসাব করে দেখান যে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে পাচারকৃত সম্পদের মোট পরিমাণ বর্তমান হিসেবে ৪৪.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু তার মতে এটিও খুবই রক্ষণশীল একটি অঙ্ক, যেহেতু এখানে ব্রিটিশ রাজ চলাকালীন ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেন কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া ঋণের বোঝাকে হিসাব করা হয়নি। হিসাবগুলো নিঃসন্দেহে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে পাচার হওয়া এই বিপুল অর্থের ফলে ভারতবর্ষের ঠিক কতখানি ক্ষতি হয়েছে, তা কেবল তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে হিসাব করে বের করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন এ অঞ্চলের মানুষের মাথাপিছু আয়ে কোনো উন্নতিই ঘটেনি, বরং উনিশ শতকের

শেষার্ধে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে যাওয়ার সময়কালে মাথাপিছু আয় অর্ধেকে নেমে এসেছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ভারতীয়দের প্রত্যাশিত গড় আয়ু এক-পঞ্চমাংশ হ্রাস পেয়েছিল। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অকালে প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯০৯-১৪ পর্যন্ত যেখানে এ অঞ্চলের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ছিল ১৯৭.৩ কেজি, ১৯৪৬ সাল নাগাদ তা কমে দাঁড়ায় ১৩৬.৮ কেজিতে। তাই একথা দ্ব্যর্থহীন চিত্তে বলাই যায়, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত ব্রিটেনের কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং পাটনায়েকের গবেষণাপত্র থেকে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের কাঁধে চেপেই অ জকের উন্নত ব্রিটেনের জন্ম।

তৃতীয় অধ্যায়

চীন বিপ্লব ১৯১১

The 1911 Revolution was a momentous event in bringing down the monarchical institution with a history of 2,000 years. Yet its consequences were ambiguous, it was overshadowed by the more radical revolution that followed in 1949, and it was stigmatized by the defeat of the Kuomintang, which claimed it as its own. Its 'revolutionariness' has been in question even as it has been celebrated as a turning point in modern Chinese history. This discussion reaffirms the revolutionary significance of the event, but also suggests that it is best viewed as a 'high peak' in a revolution of long duration that is yet to be completed. The current regime in China has revived aspects of monarchical culture and practices that revolutionaries sought to abolish in 1911

Arif Dirlik

১৯৪৯ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে চীনে আরো একটি বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল ১৯১১ সালে, যাকে বলা হয় ঝিনহাই বিপ্লব (Xinhaic Revolution)। চীন বিপ্লব হিসেবেই তা ইতিহাসে স্বীকৃত। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিঃসন্দেহে চীনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল ১৯১১ সালের ঝিনহাই বিপ্লব। এই বিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৯১১ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯১২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। এই বিপ্লবে মধ্যে দিয়ে চীনে Qing সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং প্রথমবারের মতো *রিপাবলিক অব চায়না* রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে হান সম্প্রদায়ভুক্ত (Han) চীনারা ২৬৮ বছর পর ক্ষমতা পেয়েছিল। উল্লেখ্য, Qing সাম্রাজ্য ছিল চীনের সর্বশেষ রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৩৬ সালে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা

১৬৪৪ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত চীন শাসন করেছে। সম্রাট হং তাইঝি (Hong Taiji) ছিলেন এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পুইউআই (Puyi) ছিলেন সর্বশেষ সম্রাট (১৯০৮-১৯১২)। চীন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল Wuchang গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে (১০ অক্টোবর ১৯১১), আর শেষ হয়েছিল ৬ বছর বয়সি সম্রাট পুইউআইকে অপহরণের মধ্যে দিয়ে (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২)। এর মধ্যে দিয়ে দু'হাজার বছরের চীনা সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ইতিহাসে এই চীন বিপ্লবের গুরুত্ব অনেক বেশি। চীন বিপ্লব না হলে ১৯৪৯ সালে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতো না। চীনে সাধারণ মানুষের মাঝে ক্ষোভ ছিল। চীন বিপ্লবের আগে চীনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল, যা চীন বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল (সারণিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে), যা বিপ্লবকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তবে এটা ঠিক কুইয়ং (Qing) সাম্রাজ্যের বা মাঞ্চু সাম্রাজ্যের (Manchu) উৎখাতের ব্যাপারে অনেক সংগঠনই কাজ করেছিল। দেখা যায় অনেকগুলো সংগঠনই গঠিত হয়েছিল চীনের বাইরে। Yeung Ku-wans'র নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল Furen Literary Society। এটি গঠিত হয়েছিল হংকং-এ ১৮৯০ সালে। সান ইয়াৎ সেন (Sun Yat Sen) এর Xingzhonghui (Revive China Society) গঠিত হয়েছিল হনুলুলুতে ১৮৯৪ সালে। ১৮৯৪ সালে দুটো সংগঠন একত্রিত হয়েছিল। The Huaxinghui (China Revival Society) গঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে। Guangfuhui (Restoration Society) গঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে। সাংহাই এ গঠিত এই সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন Cai Yuanpei। এর বাইরে আরো ছোট ছোট দু'একটি বিপ্লবী সংগঠনের খবর পাওয়া যায়। Lizhi Xuehui (Jiangsu শহরে), Gongqianghui (Sichuan), Yiwenhui ও Hanzudulihui (Fujian), Yizhishe (Jiangxi) ইত্যাদি। তবে নিঃসন্দেহে সান ইয়াৎ সেনের ভূমিকা ছিল বড় ও ব্যাপক। তিনি Revive China Society, Huaxinghui এবং Guangfuhui সংগঠনগুলোকে ১৯০৫ সালে একত্রিত করতে পেয়েছিলেন এবং ১৯০৫ সালে টোকিওতে গঠিত হয়েছিল Tongmenghui (United League)। তার আসল নাম ছিল সান ঝংসান (Sun Zhongshan), যিনি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন "চীনের জর্জ ওয়াশিংটন হিসেবে।" যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটনের মতো তিনিও রাজতন্ত্র বিরোধী ছিলেন। এখানে আরো একটা কথা বলা দরকার-আর তা হচ্ছে চীন বিপ্লবে বিদেশি, বিশেষ করে জাপানি নাগরিকদের অংশগ্রহণ। এ রকম একজন জাপানি নাগরিক ছিলেন Miyazaki Touten। একজন আমেরিকান Homer Lea, পরবর্তীতে সান ইয়াৎ সেনের উপদেষ্টা পর্যন্ত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সৈনিক Rowland J. Mulkern যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই

সময়ের উগ্র দক্ষিণপন্থি জাপানি সংগঠন, যেমন– Black Dragon Society'র মতো সংগঠনগুলো সান ইয়াৎ সেনের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যদি সান ইয়াৎ সেন Qing সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়, তাহলে জাপানিদের জন্য একটা সুযোগ তৈরি হবে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত মূল চীনা ভূখণ্ড দখল করা। এক্ষেত্রে হান (Han) সম্প্রদায়ভুক্ত চীনারা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

সারণি : ৯
চীনা বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

১৮৪০-১৮৪২	:	প্রথম আফিম যুদ্ধ। ব্রিটেন চীনে ব্যাপকভাবে আফিম ব্যবসা করে। তৎকালীন Qing সম্রাট এটি নিষিদ্ধ করলে সামরিক সংঘাতের সূত্রপাত হয়। ব্রিটেন চীনা বন্দরগুলো বন্ধ করে দেয় এবং হংকং দখল করে নেয়।
১৮৫১-১৮৬৪	:	তাইপিং বিপ্লব। ধর্মগুরু হং ঝিউকুয়ান (Hong Xiuquan) কর্তৃক কিউইয়ং (Qing) সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা ১৮৫২ সালে নানজিং দখল করে নেয়, যা তারা ১২ বছর পর্যন্ত শাসন করে। বিষক্রিয়াজনিত কারণে হং-এর মৃত্যু হয় ১৮৬৪ সালে।
১৮৫৬-১৮৬০	:	দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দাবি আফিমকে বৈধতা দিতে হবে। এই দুই বিদেশি শক্তি কর্তৃক গুয়াংঝু (Guangzhou) দখল এবং শেষ পর্যন্ত চীন এই দেশ দুটির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর, যাতে তাদের পোর্টগুলোর কর্তৃত্ব ও অধিকতর ব্যবসায়িক সুবিধা দেওয়া হয়।
১৮৯৪	:	প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ। যুদ্ধে চীনের পরাজয়। এ অঞ্চলে চীনের অধিকার খর্ব। চুক্তির বিনিময়ে জাপানের হাতে তাইওয়ানের কর্তৃত্ব হস্তান্তর।
১৮৯৯	:	বক্সার বিদ্রোহ। বিদেশিদের গোপনে হত্যা। ৮টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক চীনে সেনাবাহিনী প্রেরণ। ইউরোপিয়ানদের সাথে দ্বন্দ্বে চীনের হার। চীনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস। কিউইয়ং (Qing) সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া শুরু।
১৯১২	:	চীনা প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ১৯১১ সালে ঝিনহাই (Xinhai) বিপ্লব। উচাং (Wuchang) এ গণবিদ্রোহ। কিউইয়ং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৫টি প্রদেশের বিদ্রোহ। ১৯১২ সালে সান ইয়াত সেনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯২১	:	চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত।
১৯২৭	:	সাংহাই গণহত্যা। চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং কাই সেক কর্তৃক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান ও কয়েক লাখ মানুষ হত্যা।
১৯২৮	:	চিয়াং কাইসেক বিভিন্ন প্রদেশের যুদ্ধবাজ নেতাদের হাত করে চীনের বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোকে একত্রিত করা।
১৯৩১	:	গৃহযুদ্ধ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন 'রেড আর্মি' ও চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বাধীন শক্তির মধ্যে দীর্ঘ ১৮ বছরব্যাপী যুদ্ধ।
১৯৩৭-১৯৪৫	:	দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ। ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল করাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ। জাপান কর্তৃক সাংহাই ও নানজিং দখল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।
১৯৪৫	:	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের আত্মসমর্পণ। তাইওয়ানের চীনের কাছে প্রত্যাবর্তন।
১৯৪৯	:	গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতা ঘোষণা। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে ২০ লক্ষ সৈন্যের তাইওয়ানে আশ্রয় গ্রহণ ও সেখানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক পুরো চীনের কর্তৃত্ব দাবি।

চীন বিপ্লব সম্পন্ন হলেও, চীনে অস্থিতিশীলতা রয়ে গিয়েছিল। চীনা বিপ্লব ২৬৮ বছর ক্ষমতায় থাকা Qing সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে হান (Han) সম্প্রদায়ভুক্ত চীনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। বলা ভালো মঞ্চু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিতরা তাতার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তাতারিরা তাতারিস্তানের অধিবাসী, তার্কিস বংশোদ্ভূত এবং রাশিয়ার ভলগা-উরাল এলাকায় এরা বসবাস করতেন। সান ইয়াৎ সেনের উদ্দেশ্য ছিল তাতারদের উৎখাত করে Zhonghua, অর্থাৎ চীনা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা। এবং ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা। চীনা বিপ্লব (১৯১১) চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে Guangzhou ও Wuchang এ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। Guangzhou এর বিদ্রোহ ইতিহাসে *Yellow Flower Mound Revolt* নামে পরিচিত। Qing সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন Huang Xing। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় ও পরবর্তীতে ৭২ জন বিদ্রোহীদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ১৯১১ সালের ২৭ এপ্রিল এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১০ অক্টোবর Wuchang-এ একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। এর নেতৃত্ব দেন Huang

Xing। এই বিপ্লবটি সফল হয়। ততদিন পর্যন্ত সান ইয়াৎ সেন বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি বিদেশ থেকে আসেন ১৯১১ সালের ২১ ডিসেম্বর। বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠিত গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিণতিই হচ্ছে চীনা বিপ্লব। ২৯ ডিসেম্বর (১৯১১) নানকিং এ বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীদের এক সভা হয়, আর ওই সভায় ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে চীনা প্রজাতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তার ক্ষমতাগ্রহণ স্থায়ী হয়নি। অতি দ্রুত তিনি Yuan Shikai-এর কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চীনের উত্তরাঞ্চলের সামরিক নেতা ছিলেন Shikai, তিনি Beiyang Army'র নেতৃত্ব দিতেন। সান ইয়াৎ সেন ক্ষমতা ছেড়ে দিলে শিকাই (Shikai) ১৯১২ সালের ১০ মার্চ অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছিল। ওই বছরের (১৯১২) মে মাসে সদ্য গঠিত পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করলে, সদস্যরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষ Tongmenghui অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করে, অন্যপক্ষ ন্যাশনালিস্টরা ইয়ান শিকাইকে সমর্থন করে।



চিত্র : সান ইয়াৎ সেন

Tongmenghui অনুসারীরা অন্যান্য ছোট ছোট দলের সমন্বয়ে গঠন করে কুওমিংটান (Kuomintang) পার্টি। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন সং জিয়াওরেন (Song Jiaoren)। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ ইউয়ান শিকাই (Yuan Shikai) বাহিনী তাকে হত্যা করে (২০ মার্চ, ১৯১৩)। ওই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চীনে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিপ্লবের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই বিপ্লব ইউয়ান শিকাই এর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হলে সান ইয়াৎ সেন ১৯১৩ সালের আগস্টে জাপানে পালিয়ে যান। ১৯১৫ সালে ইউয়ান শিকাই নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন (১৯১৫-১৯১৬)। কিন্তু সর্বত্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধবাজ নেতারা স্থানীয় রাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। ওই সময় চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সরকার গঠিত হয়। ১৯২১ সালে Guangzhou তে একটি সামরিক সরকার (১৯২১-১৯২৫) Wuhan এও গঠিত হয় একটি সরকার (১৯২৫-১৯২৭)। সান ইয়াৎ সেন একটি ঐক্যবদ্ধ চীন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেও ব্যর্থ হন। এমনি এক পরিস্থিতিতে সান ইয়াৎ সেন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিনটার্ন কর্তৃক সমর্থিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় ভ্লাদিমির লেনিন ওই সময় সান ইয়াৎ সেনকে সমর্থন করেছিলেন। সম্রাজ্যবাদ বিরোধী তার ভূমিকা লেনিন সমর্থন করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর (১৯২৬) কুওমিংটান দলের শীর্ষে উঠে আসেন চিয়াং কাই সেক। প্রায় একই সময় (১৯২৭) কুওমিংটান ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আর এর রেশ ধরেই চীন পুনরায় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে যায়। কুওমিংটান ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আর সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। বরং এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল। চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করলে (১৯৪৯) চিয়াং কাইসেন ও তার কুওমিংটান দলের সমর্থকদের নিয়ে তাইওয়ানে পালিয়ে যান ও সেখানে একটি রিপাবলিক সরকার গঠন করে আন্তর্জাতিক আসরে চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ তাইওয়ানের পরিবর্তে চীনকে স্বীকৃতি দেয়। সেই থেকে তাইওয়ান রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও, আলাদা রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে আসছে। কিন্তু চীন তাইওয়ানের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে নেয়নি। চীন মূল চীন ভূখণ্ডের সাথে তাইওয়ানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী।*

* অনেকটা হংকং মডেলে।

বিংশ শতাব্দীর যে ক'জন চীনা নেতা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, সান ইয়াৎ সেন তার মাঝে একজন। চীন ও তাইওয়ানে তাকে এখনো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। তিনি তাইওয়ানে রিপাবলিক অব চায়না'র জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক চীন তাকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। চীন বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবেও তাকে গণ্য করা হয়। সান ইয়াৎ সেন তার *'Three Principles of People'* তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত। তার এই 'তিন নীতি'র মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যৎ চীনের এক রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন। তার তিন নীতির একটি হচ্ছে *Minzu*, যার ইংরেজির পরিপূরক শব্দ হচ্ছে Nationalism বা জাতীয়তাবোধ। এটা হচ্ছে এমন এক মতাদর্শ, যা জাতিকে একত্রিত করবে। সান ইয়াৎ সেন *Minzu* এর মাধ্যমে সকল ধরনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্তি—এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমা প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে তিনি *Zhonghua Minzu* অর্থাৎ China Nationalism বা চৈনিক জাতীয়তাবাদী আদর্শকে বুঝিয়েছিলেন। তার দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে *Minquan*, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, বা গণতন্ত্র। ব্যাপক অর্থে জনগণের ক্ষমতায়নই হচ্ছে Minquan। সান ইয়াৎ সেন তার এই নীতির মাধ্যমে পশ্চিমা সাংবিধানিক সরকারের ধারণা চীনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তার মতে জনগণের ক্ষমতায়নের দুটো দিক আছে Power of Politics এবং Power of Governance। অর্থাৎ রাজনীতি আর সুশাসনই হলো ক্ষমতার মূল কথা। Power of Politics বা চীনা ভাষায় Zhengquan -এর মূল কথা হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা পশ্চিমা বিশ্বে সংসদে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। সাধারণ একটি নির্বাচন, একটি উদ্যোগে বা রাজনৈতিক কর্মসূচি, গণভোট, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো Power of Politics-এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে সুশাসন বলতে তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সমাজে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, চেক এন্ড ব্যালেন্স এর মাধ্যমে যেভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে শক্তিশালী রয়েছে, সান ইয়াৎ সেন এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিই প্রত্যাশা করেছিলেন চীনের জন্য। তার তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে Minsheng, যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে Peoples Welfare বা জনগণের মানোন্নয়ন। সামাজিক সুরক্ষার যে ধারণা পশ্চিমা বিশ্বের আছে, সে ধরনের সুরক্ষা তিনি চীনে চেয়েছিলেন। তার এই সুরক্ষার ধারণায় আছে চারটি দিক সবার জন্য কাপড় চোপড়, খাদ্য, বাসস্থান ও গতিশীলতা।

সান ইয়াৎ সেনের দর্শন যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তার এই দর্শনের মাঝে লুক্কায়িত ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি রূপ। পশ্চিমা

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, বিশেষ করে আমেরিকার গণতান্ত্রিক চর্চা সান ইয়াৎ সেনকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সেই দর্শন চীনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। বলা হয়, আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক হেনরি জর্জ (Henry George) এর দর্শন দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন। উনিশ শতকে তার দর্শন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করেই জন্ম হয়েছিল একটি অর্থনৈতিক মতবাদের, যা পরিচিত Georgism হিসেবে। তার একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ রয়েছে *Progrees and Poverty*। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে "The appropriation of land for private use contributes to persistent poverty in spite of technological progress, and csuses economies to exhibit a tendency toward boom and bust cycles"। তার মতে, 'People justly own what they create, but that natural opportunities and land belong equally to all'। সান ইয়াৎ সেন এই মতবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

বিপ্লবের পরপরই তিনি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি বটে, কিন্তু তার দর্শন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল আধুনিক। একটি গণতান্ত্রিক, জনমুখী, কল্যাণকামী চীনা রাষ্ট্রকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। তার সার্থকতা এখানেই।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি

The First World War destroyed empires, created numerous new nation-states, encouraged independence movements in Europes colonies, forced the United States to become a world power and led directly to Soviet communism and the rise of Hitler. Diplomatic alliances and promises made during the First World War, especially in the Middle East, also came back to haunt Europeans a century later. The balance of power approach to international relations was broken but not shattered.

Fraser Cameron, Heinrich Boll Stiftung Germany

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে আর শেষ হয়েছিল ১৯১৮ সালের নভেম্বরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুটি লক্ষ ছিল। একদিকে মিত্র জোট (Allied Powers)। অন্যদিকে, সেন্ট্রাল পাওয়ার বা কেন্দ্রীয় শক্তি জোট। মিত্র জোটে ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, সার্বিয়া, মনটেনেগ্রো, বেলজিয়ামের মতো দেশ। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শক্তি জোটে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, অটোমান সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়ার মতো দেশ। যুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তি জোটের পরাজয় ঘটে।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যা পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন, উইলসনের ১৪ দফা ও ভার্সাই চুক্তি, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য একটি স্থান অধিকার করে আছে। তবে বলকান যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন।

* বিশ্বরাজনীতির ১০০ বছর (১ম খণ্ড) এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।


THE
TREATY OF PEACE
BETWEEN
THE ALLIED AND ASSOCIATED POWERS
AND
GERMANY,
The Protocol annexed thereto, the Agreement respecting the military occupation of the territories of the Rhine,
AND THE
TREATY
BETWEEN
FRANCE AND GREAT BRITAIN
RESPECTING
Assistance to France in the event of unprovoked aggression by Germany.
Signed at Versailles, June 28th, 1919.
(With Maps and Signatures in facsimile)
LONDON: PRINTED AND PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE.

চিত্র : ভার্সাই চুক্তি পুনর্নির্মাণ-সভ্যতার উপর গোল্ডওয়াগের জার্নাল

বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ ও ১৯১৩

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ইতিহাসের গতিপথকে পালটে দিয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের উপলক্ষ ছিল বলকান যুদ্ধ। ইতিহাসে তাই বলকান যুদ্ধের গুরুত্বও যথেষ্ট। আমরা দু-দুটো বলকান যুদ্ধের খবর পাই। প্রথম বলকান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১২ সালের অক্টোবরে, আর শেষ হয়েছিল ১৯১৩ সালের মে মাসে। আর দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত

হয়েছিল মাত্র এক মাস, ১৯১৩ সালের ১৬ জুন থেকে ১৯১৩ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত। বলকান অঞ্চলটি মূলত দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত। বলকান পর্বতমালার নামেই এ অঞ্চলের নাম বলকান হয়েছে। আলবেনিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, কসভো, মনটেনেগ্রো, উত্তর মেসিডোনিয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং স্লোভেনিয়াকে নিয়ে বলকান অঞ্চল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসেও বলকান অঞ্চল একাধিক কারণে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। একদিকে বসনিয়া হারজেগোভিনার স্বাধীনতা আন্দোলন ও সেখানে ব্যাপক গণহত্যা, অপরদিকে কসভোর স্বাধীনতা আন্দোলন এই অঞ্চলের গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

প্রথম বলকান যুদ্ধের (১৯১২-১৩) মধ্য দিয়ে ইউরোপ থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের সবশেষ ভিত্তিটুকু অপসারিত হয়েছিল। বলা ভালো পনেরো ও ষোলো শতকে অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আজকের দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত দেশ বুলগেরিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, মেসিডোনিয়াসহ পুরো বলকান অঞ্চলে অটোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বলকান যুদ্ধ হয়েছিল বলকান দেশ সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস এবং মনটিনেগ্রোর সাথে অটোমান সাম্রাজ্যের। এই যুদ্ধে অটোমান শাসকরা হেরে যান ও ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হন। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল একটাই—এ অঞ্চল থেকে অটোমান শাসকদের উচ্ছেদ করা। ১৯১২ সালের ৮ অক্টোবর মনটেনেগ্রো অটোমান সাম্রাজ্য তথা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭ অক্টোবর সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রিসও যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধে খুব দ্রুতই তুরস্ক তার নিয়ন্ত্রিত এলাকা মেসিডোনিয়া হারায়। ১৯১৩ সালের ৩০ মে একটি শান্তিচুক্তি (লন্ডন) স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে। এক সময় যারা তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম বলকান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা নিজেরা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সার্বিয়া, গ্রিস, রুমানিয়া। প্রথম বলকান যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বুলগেরিয়া যে অঞ্চল হস্তগত করেছিল, দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে তা ছেড়ে দিতে হয়।

ইউরোপ থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের বিদায়ের পর বলকান অঞ্চলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বৈরিতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। সার্বিয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদীরা অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্স ফার্ডিন্যান্ড (Farnz Ferdinand) কে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে হত্যা করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অস্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার শত্রুতা চরমে উঠেছিল। অস্ট্রিয়া কিছু শর্ত

দিয়েছিল। কিন্তু সার্বিয়া ওই শর্তগুলো মানতে অপারাগতা প্রকাশ করলে অস্ট্রিয়া ও জার্মান সেনাবাহিনী সারায়েভোতে অভিযান চালায়। রাশিয়া ও ফ্রান্সের অবস্থান ছিল সার্বিয়ার পাশে। ফলে জার্মানি ফ্রান্স ও রাশিয়া আক্রমণ করে। আর এভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯১৪ সালে।

বলকান যুদ্ধের গুরুত্ব এ কারণে যে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপে অটোমান শাসনের অবসান ঘটেছিল। অটোমান শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে বুলগেরিয়া, গ্রিস, মনটেনেগরো এবং সার্বিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত হলেও, এই দেশগুলো ১৯১২ সালে *বলকান লিগ* গঠন করে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ভেঙে যায়। ১৯১৩ সালের ৩০ মে বুলগেরিয়া, প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণে মেসিডোনিয়াকে হারিয়ে তার এক সময়ের মিত্র দেশগুলোকে আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধ বুলগেরিয়াকে কিছু দিতে পারেনি। ১৯১৩ সালের ১০ আগস্ট Treaty of Bucharest-এর মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (১৮ জানুয়ারি ১৯১৯-২১ জুন ১৯২০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষে প্যারিসে একটি শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল ১৯১৯ সালে ও ১৯২০ সালে। এই শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ৫টি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মাঝে অন্যতম ছিল ভার্সাই চুক্তি। এই শান্তি সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই একটি বিশ্ব সংস্থা লিগ অব নেশনস, গঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ব্যর্থ হয়েছিল। ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ৫৮টি কমিশন গঠিত হয়েছিল ও কমিশন ১৬০০ সভায় মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের মূল ব্যক্তি ছিলেন তিনজন– মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেনশো। এরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীর্ঘ আলোচনায় দুটি বিষয় বেশি প্রধান্য পেয়েছিল। এক. ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর (চেক, পোলিশ, রুমানিয়া, সার্ব) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও জাতিরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি। দুই. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করা ও জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়। জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে সম্মেলনে ব্যাপক সমর্থন থাকলেও, উইলসনের ১৪ দফার ব্যাপারে একটা মৃদু অভিযোগে ছিল যে তার প্রস্তাবের ব্যাপারে তৎকালীন ইউরোপের পরিস্থিতির সাথে বাস্তবের কোনো মিল ছিল না। কিন্তু তারপরও যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার উদ্যোগে প্রশংসিত হয়েছিল এবং খোদ জার্মানিতেও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে

এটা সত্য বিজিতের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ, বিজয়ীদের স্বার্থে শক্তিসাম্যের পুনর্বিন্যাস, উপনিবেশের লোভ এবং ক্ষতিপূরণ লাভই ছিল মিত্র জোটের উদ্দেশ্য। এতে তারা সফল হয়েছিলেন। তবে জার্মানিতে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, যা দেশটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যেতে প্ররোচিত করেছিল।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ৫টি চুক্তি বিজিতদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমটি, জার্মানির সাথে ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles), দ্বিতীয়টি, অস্ট্রিয়ার সাথে সেন্ট জারমেই (St. Germain) এর চুক্তি, তৃতীয়টি, হাঙ্গেরির সাথে চুক্তি, যা ট্রিয়ানন চুক্তি নামে অভিহিত (Treaty of Trianon) হয়েছিল, চতুর্থটি, বুলগেরিয়ার সাথে নিউলির চুক্তি (Treaty of Neuilly), আর পঞ্চমটি, তুরস্কের সেভরেস চুক্তি (Treaty of Sevres)। তবে প্রেসিডেন্ট উইলসনের উত্থাপিত ১৪ দফার গুরুত্ব ছিল ব্যাপক।

উইলসনের ১৪ দফা

উড্রো উইলসন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার ১৪ দফা উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি কংগ্রেসে তার দাবিসমূহ উপস্থাপন করেন। তার ১৪ দফা প্রস্তাবে ছিল : ১. আলোচনার মাধ্যমে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর; ২. সমুদ্রপথে অবাধ যাতায়াত, ৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সব বাধা অপসারণ, ৪. যুদ্ধ উপকরণ ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করা, ৫. উপনিবেশগুলোর জনগণের স্বার্থানুসারে উপনিবেশ সম্পর্কিত দাবির বিচার ও বণ্টন করা; ৬. অধিকৃত রুশ অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার; ৭. বেলজিয়াম থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার ও বেলজিয়ামের সার্বভৌমত্ব পুনঃস্থাপন; ৮. অধিকৃত ফরাসি এলাকা থেকে সকল বৈদেশিক সৈন্য প্রত্যাহার, আলসাস ও লোরেন এলাকায় ফরাসি অধিকার প্রতিষ্ঠা, ৯. পরিচিত জাতীয় সীমারেখা অনুসারে ইতালির সীমানা পুনর্বিন্যাস; ১০. অস্ট্রীয় হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান; ১১. রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো থেকে সেনা অপসারণ, সার্বিয়াকে সামুদ্রিক যোগসূত্র স্থাপনে সুবিধাদান ও বলকান অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; ১২. তুরস্কের অধীনস্থ সকল জাতিগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন দান; ১৩. পোলিশ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্বাতন্ত্র্য পোল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন; ১৪. ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি বিশ্বসংস্থা গঠন।

বলা হয়, প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী শান্তি আলোচনার ভিত্তি।

ভার্সাই চুক্তি, ১৯১৯

ভার্সাই চুক্তিটি (Treaty of Versailles) স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ২৮ জুন। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জার্মানির সাথে মিত্রশক্তির মধ্যকার যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান হয়েছিল। জার্মানি বাদে সেন্ট্রাল পাওয়ার এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলাদাভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ভার্সাই চুক্তিতে কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, যা জার্মানিকে মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ।

১. জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস (Alsaces), ও লোরেন (Lorraine) এবং বেলজিয়ামকে মরসনেট (Moresnet), ম্যালামেডি (Malmidy) ও ইউপেন (Eupen) নামক স্থানের অধিকার দেয়। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি মেমেল (Memel) বন্দরটি দখল করেছিল। ১৯২৩ সালে পোল্যান্ড ভিলনা (Vilna) দখল করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মেমেল বন্দরটি লিথুনিয়াকে দেয়া হয়েছিল। Upper Silesia এবং শ্লিশউইগের (Schleswig)-এর ভবিষ্যৎ গণভোটে নির্ধারিত হবে। গণভোটে পূর্ব প্রুশিয়া জার্মানির সাথে যুক্ত হয়। আপার সাইলোশিয়া জার্মানির সাথে সংযুক্ত হবার রায় দিলেও, তাতে ফ্রান্স আপত্তি দেয়। ফলে আপার সাইলেশিয়া শিল্পপ্রধান অঞ্চল পোল্যান্ডের হাতে হয়। শ্লিশউইগের উত্তরাংশ ডেনমার্কের সাথে আর দক্ষিণাংশ জার্মানির সাথে সংযুক্ত হয়। জার্মানির উপনিবেশগুলো মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায় (চীনে কিয়াচো ও সানটুং জাপানের, সামোয়া নিউজিল্যান্ডের, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মান-পূর্ব আফ্রিকা গ্রেট ব্রিটেনের, ক্যামেরুন ও টোগোল্যান্ড ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়)। ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা হাতছাড়া হয়েছিল।

২. চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির সেনাবাহিনী এক লাখের নিচে নামিয়ে আনা হয়। রাইন অঞ্চল বেসামরিকীকরণ করা হয়। যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নিষিদ্ধ করা হয়। সারল্যান্ডের কয়লাখনি অঞ্চল ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্সকে দেয়া হয়।

৩. জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এর পরিমাণ ছিল ৩১ বিলিয়ন ডলার। ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জার্মানির রাইন অঞ্চল মিত্রশক্তির অধিকারে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

৪. চুক্তিতে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানি রাশিয়ার সাথে ব্রেস্ট লিটভস্ক (Brest-litvosk) চুক্তি করেছিল, তা বাতিল করা হয়।

ভার্সাই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু তা হয়নি। জার্মানিতে ক্ষোভ ছিল, যা পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। উইলসনের ১৪ দফা দাবির অন্যতম ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা লিগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠা করা। এটি গঠিত হয়েছিল বটে। কিন্তু লীগ শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় কোনো অবদান রাখতে পারেনি। ফলে এক পর্যায় লীগের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই চুক্তিবলে জার্মানির শক্তি হ্রাস করা হয়েছিল এবং জার্মানি একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। অভিযোগে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল ভার্সাই চুক্তির ভেতর। সারাহ প্রুইট (Sarah Pruitt) *History Journal* এ লিখিত এক প্রবন্ধে (How the Treaty of Versailles and German Guild Led to World War II. June 3, 2019) লিখেছেন, 'The treaty was lengthy and ultimately did not satisfy any nation'। তার মতে, 'Aside from affecting Germany, the Treaty of Versailles might have caused the great depression'। তার মন্তব্য ছিল অনেকটা এরকম 'The Versailles Treaty made World War II possible, not inevitable'। তবে US Army College এর ইতিহাসের শিক্ষক অধ্যাপক মাইকেল নেইবার্গ (Michael Neiberg) তার গ্রন্থ *The Treaty of Versallies : A Concise History Second World War* এ ভার্সাই চুক্তিকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তার মন্তব্য অনেকটা এরকম। 'I'm not one of those people who believes the treaty made the Second World War inevitable, but I think you could argue that made Europe a less stable place'। চুক্তির কারণেই ইউরোপের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়নি। তার মতে 'It literally is an attempt to remake Europe'।

যেভাবেই ভার্সাই চুক্তিকে মূল্যায়ন করা হোক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে ওই চুক্তিটি ছিল একটি জবরদস্তিমূলক চুক্তি। পরাজিত শক্তির উপর বিজয়ীরা শর্ত আরোপ করেছিল। অর্থাৎ জার্মানির উপর কিছু শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা মানতে জার্মানি বাধ্য ছিল। এটা ছিল জার্মান জাতির জন্য অসম্মানকর ও অসহনীয়। এজন্যই তাদের মনে ক্ষোভের জন্ম হয়েছিল। আর তাই রাইকার (Riker) অভিমত প্রকাশ করেছেন এভাবে 'No great nation like Germany can submit indefintely to discrimination in the matter of armament and other things'। একটা দেশকে সামরিক দিক থেকে যদি পঙ্গু করে দেয়া হয়, তাহলে ওই দেশের জনগণের মাঝে একটা অসন্তোষ থেকে যাবেই। জার্মানির ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছিল। শুধুমাত্র সামরিক দিক দিয়েই নয়, বরং আর্থিকভাবেও দেশটিকে বাধ্য করা হয়েছিল

ক্ষতিপূরণ দিতে। ফলে অসন্তোষ থেকে ক্ষোভ, আর সেই ক্ষোভ থেকে জন্ম হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, আর ভার্সাই চুক্তিবিরোধী একটি মনোভাব। হিটলার এই মনোভাবকে তার স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। এজন্যই বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুক্কায়িত ছিল ভার্সাই চুক্তিতে।

ভাইমার রিপাবলিক, ১৯১৮

জার্মানিতে একটি ফ্যাসিবাদী সরকারের পর সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একটি গণতান্ত্রি ; সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেকোনো বিবেচনায় জার্মান রাজনীতির জন্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভার্সাই চুক্তির পর এ ধরনের একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা চিহ্নিত হয়ে আছে ভাইমার রিপাবলিক হিসেবে। ভাইমার* নামক একটি স্থানে একটি সাংবিধানিক সভা আহ্বান করা হয়েছিল, যে কারণে ওই শহরের নামেই যা পরবর্তীতে চিহ্নিত হয় ভাইমার রিপাবলিক হিসেবে। উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই পরবর্তী জার্মানির জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন, জনগণের স্বাধিকার নিশ্চিত করা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ১৯১৮ সালের ৯ নভেম্বর ভাইমার রিপাবলিক গঠিত হয় এবং হিটলারের উত্থানের মধ্যে দিয়ে ১৯৩৩-৩৪ সালে এই রিপাবলিকের পতন ঘটে।

ভাইমারে (Weimar) আহূত সংবিধান সভায় জার্মানির একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাট পার্টির (এসপিডি) নেতা ফ্রিডিরিচ ভাইমার রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধান অনুযায়ী দু'কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জার্মানিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবার পর নয়া সরকারক ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো পালন করার উদ্যোগ নিতে হয়। কাজটি নয়া সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রস্ফীতি, দক্ষিণপন্থিদের বিরোধিতা সংকটকে আরো বাড়িয়ে দেয়। একের পর এক পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে বার্লিনে বামপন্থিদের একটি অভ্যুত্থান *(Spartacist revolution)* নস্যাৎ করার জন্য সেনাবাহিনী নামানো হয়। ১৯২৩ সালের ৮-৯ নভেম্বর হিটলারের নেতৃত্বে নাজিপার্টি সেনাবাহিনীর কোয়াটার মাস্টার জেনারেল এরিক লুডেনজর্ফর সহযোগিতায় ক্যাভেরিয়া প্রদেশের মিউনিকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নেয়, যা ব্যর্থ হয়। ওই অভ্যুত্থান *Beer Hall Putsch* নামে পরিচিত ছিল। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের জন্য হিটলারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯২৮ সালের

* জার্মানির Thuringia প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

অক্টোবরে মিডিয়া মুগল আলফ্রেড হুগেনবার্গ দক্ষিণপন্থি দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ওই সময় হুগেনবার্গ হিটলারকে সমর্থনে করেন, যা পরে হিটলারের ক্ষমতা গ্রহণকে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৩০ সালের মার্চে এসপিডি সরকারে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ১৯৩২ সালের ২০ জুলাই প্রুসিয়ার মুখ্যমন্ত্রী অটো ব্রাউন প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করে দেন, বার্লিনে কমিউনিস্টদের সাথে নাজিদের সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। ১৯৩২ সালের ৩১ জুলাই হিটলার ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। আর ১৯৩৩ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পল ভন হিনডেনবার্গ হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেন। হিটলারের নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে ভাইমার রিপাবলিকের পতন নিশ্চিত হয়।

ভাইমার রিপাবলিক (Weimar Republic) একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল যাতে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হবে, সেখানে মানবাধিকার রক্ষিত হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থতা থেকে জার্মানি ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু ভাইমার রিপাবলিকের ১৫ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি কারণের জন্য ভাইমার রিপাবলিক, অর্থাৎ জার্মানির গণতান্ত্রিক চর্চার পতন ঘটেনি। বরং পতনের একাধিক কারণ রয়েছে। নাজি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব, যুদ্ধোত্তর যুগে বেকার যুবক, অনাহার ও অর্ধাহার, যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিকদের অসন্তোষ ভাইমার রিপাবলিকের পতনের জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জার্মান পার্লামেন্টে কোনো দলের একক প্রাধান্য না থাকা (১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে ১৯টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল), অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানির রুর (Ruhr) অঞ্চল দখল, *লিগ অব নেশনস* এ জার্মানির স্থায়ী আসন পেতে ফ্রান্সের বিরোধিতা, অসম্মানজনকভাবে জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা, হিটলারের ইহুদি বিরোধী ভূমিকায় জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। জার্মানিতে পূর্বতন সম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন পূর্ণজন্ম লাভ করেছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা এটা প্রচার করতো যে জার্মানির উন্নতির পথে একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে গণতন্ত্র। সেইসাথে প্রগতিশীল দলগুলোর মাঝে বিভেদ, কমিউনিস্ট ও সোসালিস্টদের মাঝে দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দুর্বলতাবাদীদের ক্ষমতা লাভের পথ সুগম করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

মহামন্দা

> The big question about the American depression is not whether war with Germany and Japan ended it. It is why the Depression lasted until that war. From 1929 to 1940, from Hoover to Roosevelt, government intervention helped to make the depression great.
>
> **— Amity Shlaes**

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে ত্রিশের দশকের মহামন্দার (Great Depression) বিষয়টি অবশ্যই আলোচনা করা প্রয়োজন। মূলত এই মহামন্দায় আক্রান্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেট, তারপর তা সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর সূত্র ধরেই জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ঘটে। যা পরিণামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা স্থায়িত্বে পায় ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। ১৯২৬ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটের পতনের পরই এই মহামন্দার সূত্রপাত হয়। স্টক মার্কেটের পতনের মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারী মুহূর্তের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে যান, তারা সবকিছু হারিয়ে গরিব হয়ে যান। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যায়। শিল্প উৎপাদনে ধস নামে। ১৯৩৩ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ দেড় কোটি মানুষ বেকার হয়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯২০ এর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ওই সময়, অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনেকে ওই সময়টাকে চিহ্নিত করেন 'The Roaring Twenties' হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটের মূল কেন্দ্র ছিল নিউইয়র্ক। অর্থনীতিতে গতি আসায় বড়

বড় পুঁজিপতিরাসহ সাধারণ মানুষও স্টক মার্কেটে প্রচুর বিনিয়োগ করেন। এর ফলে স্টক মার্কেটের আকার বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৯ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শিল্পোৎপাদনে। উৎপাদন কমতে থাকলো, বাড়তে থাকলো বেকার সমস্যা। এতে করে স্টক মার্কেটে নিবন্ধিত বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আসল মূল্যে চাইতে অনেক বেড়ে গেল। অথচ শিল্পে কর্মীদের বেতন কমতে থাকলো আর সাধারণ মানুষের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। একই সময় প্রচণ্ড খরায় আক্রান্ত হলো কৃষি। কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের দাম পাচ্ছিলেন না। ব্যাংকগুলো যেসব ঋণ দিয়েছিল তা আদায় করতে পারছিল না। আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছিল না, এবং তা জমা হতে থাকলো। বাধ্য হয়ে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টক মার্কেটে শেয়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর বিনিয়োগকারীরা পাগলের মতো দ্রুত তাদের শেয়ার অতিমূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। ফলে স্টক মার্কেট ক্রাশ করে। ওই এক দিন ১২ দশমিক ৯ মিলিয়ন, অর্থাৎ ১ কোটি ২৯ লক্ষ শেয়ার এক দিনে 'হাতবদল' হয়েছিল। এজন্য ওই দিনকে বলা হয় 'Black Thursday'। মানুষের মাঝে এমনভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে এক সপ্তাহের মাঝে ২৯ অক্টোবর (Black Tuesday) আবার ১ কোটি ৬০ লক্ষ শেয়ার হাতবদল হয়েছিল। অনেক শেয়ার মূল্যহীন হয়ে গেল, শুধুমাত্র এক খণ্ড কাগজে পরিণত হলো। অনেক বিনিয়োগকারী মুহূর্তের মধ্যে 'রাস্তার ফকির' হয়ে গেল। এর ধাক্কা গিয়ে লাগলো বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। এদের অনেকেই ঋণ নিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে না পারায়, ফ্যাক্টরিগুলো 'লে-অফ' ঘোষণা করলো, কর্মীদের একসাথে ছাঁটাই করতে শুরু করলো। ফলে এক ধরনের পেনিক সৃষ্টি হলো। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। যারা ওই সময় টিকে থাকতে পারলো, তারা কর্মীদের বেতন অনেক কমিয়ে দিল, ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অনেক কমে গেল। অনেক আমেরিকান নাগরিক গরিব হয়ে গেল, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো, ঋণ করে তাদের সংসার চালাতে হতো। এমনকি তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না ঋণ পরিশোধ করার। এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৯৩৩ সালের ৫ জুন কংগ্রেস একটি আইন পাশ করে, যাতে স্বর্ণকে বিনিময় মুদ্রা ব্যবহারের যে নীতি, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জনসাধারণের কাছে যেসব স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, তা

সারণি : ১০

মহামন্দা ও বিশ্ব

• মহামন্দা শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশে। এতে করে বিশ্বের সবার ব্যক্তিগত আয় কমে যায়। শিল্পে উৎপাদন কমে যায়। মুনাফা কমে যায়। আন্তর্জাতিক ধস নামে শতকরা ৫০ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের বেকার সমস্যা বেড়ে যায় ২৫ ভাগ, বিশ্বে তা বেড়ে যায় ৩৩ ভাগে।
• কৃষিপণ্যের দাম কমে যায় শতকরা ৬০ ভাগে।
• যুক্তরাষ্ট্রে যারা অভিবাসী হয়েছিলেন, তারা নিজ দেশে চলে যান। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নাগরিক কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান।
• ইউরোপে বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গণতন্ত্র ঝুঁকির মুখে পড়ে। চরম দক্ষিণপন্থি উত্থান ঘটে।
• ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকারের পতন ঘটে। ১৯৩১ সালে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়, যারা ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকে।
• ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকার ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৩৬-১৯৩৮ সময়সীমায় ক্ষমতায় থাকে।
• জার্মানি মহামন্দায় আক্রান্ত হয়। অসন্তোষ আর অরাজকতার সুযোগে নাজি পার্টি ও হিটলার ক্ষমতায় আসে ১৯৩০ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাধন, বেতন নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্যে নিয়ন্ত্রণ ও Self-Sufficiency'র উদ্যোগ নেওয়া হয়।
• স্পেনে ১৯৩৬-১৯৩৯ গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, যাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সিস ফ্রাংকো ক্ষমতায় আসে।
• ইতালিতে বেনিতা মুসোলিনি অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আরো বাড়ান।
• কানাডাতে (১৯২৯-১৯৩৯) জাতীয় উৎপাদন কমে যায় শতকরা ৪০ ভাগ, আর বেকার সমস্যা বেড়ে যায় ২৮ ভাগ। যেখানে কর্পোরেট হাউজগুলোর আয় ছিল ৩৯৬ মিলিয়ন ডলার (১৯২৯), সেখানে কোম্পানিগুলোর ক্ষতি হয় ৯৮ মিলিয়ন ডলার (১৯৩৩)। রপ্তানি কমে যায় শতকরা ৫০ ভাগ।
• চীনে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় (১৯৩৭-১৯৪৫)। কুয়োমিংটান দলের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।
• জাপানে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জিডিপি বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫ ভাগ হারে। চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থব্যয় করা হয়।
• অস্ট্রেলিয়ায় কৃচ্ছ্রতাসাধন করা হয়।
• নিউজিল্যান্ডও কৃচ্ছ্রতাসাধনের কর্মসূচি শুরু করে।

ফেডারেল ব্যাংকে জমা দিতে বলা হয়। ১৮৭৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র মুদ্রার বিনিময় মূল্য হিসেবে স্বর্ণ ব্যবহার করে আসছিল। জমা দেওয়া সোনার মুদ্রার বিনিময় অর্থও নির্ধারণ করে দেওয়া হয় (এক পাউন্ড = ২০.৬৭ ডলার)। ১০ মের মধ্যে সরকার ৩০০ মিলিয়ন ডলারের সমমানের স্বর্ণমুদ্রা ও ৪৭০ মিলিয়ন ডলারের সমমানের স্বর্ণ সার্টিফিকেট (Gold Cetificate) বাজার থেকে তুলে নেয়। ১৯৩৪ সালে ঋণের নতুন বিনিময় হার (এক আউন্স ৩৫৬ ডলার) নির্ধারণ করে দেয়। ঋণের এই মুদ্রামান ১৯৭১ সাল (১৫ আগস্ট) পর্যন্ত বহাল ছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছিল—স্বর্ণের জন্য যে নির্ধারিত মূল্য তা যুক্তরাষ্ট্র আর মেনে চলবে না। এটাকে বলা হতো Gold Standard। এটা বাতিল হয়ে যায়।

মহামন্দার সময় যুক্তরাষ্ট্রের বেকার সমস্যা চরমে উঠেছিল। ১৯৩০ সালে ৪০ লক্ষ মানুষ কাজ খুঁজলেও, কোনো কাজ তারা পায়নি। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। বেকার সমস্যা তখন চরমে উঠেছিল আর শিল্পে উৎপাদন অর্ধেক কমে গিয়েছিল। সর্বত্র Soup kitchens (বিনামূল্যে রুটি ও সুপ বিতরণ) চালু হয়েছিল। কৃষি ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা বিরাজ করায়, কৃষিতে কোনো কাজ না থাকায়, উপরন্তু খরা দেখা দেওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ শহরে আসতে থাকলো। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কৃষি ফার্ম ত্যাগ করার ঘটনাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে *'Dust Bowl'* হিসেবে। ব্যাংকগুলো ব্যাবসা করতে না পারায় ১৯৩৩ সালের প্রথমদিকে কয়েক হাজার ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের যখন মহামন্দের কবলে তখন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন (মার্চ ৪, ১৯৩৩)। তিনি অর্থনীতি সচল করতে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন (Deposit Insurance Corporation, Securities and Exchange Commition) যাতে স্টক মার্কেটে আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তা *New Deal* নামে পরিচিত। এটা ছিল বেশ কিছু কর্মসূচির একটি প্যাকেজ। এই প্যাকেজের আওতায় নতুন চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাদের ক্ষতিপূরণের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের মাঠে ফিরিয়ে নিতেও তিনি উদ্যোগী হন। কিন্তু পরিস্থিতি তেমন উন্নতি না হওয়ায় ১৯৩৫ সালে রুজভেল্ট আরো কঠোর কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি Works Progress Administration (WPA) গঠন করেন, যাতে বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা যায়। ১৯৩৫ সালে National Labor Relation Act পাশ হয়, যার মাধ্যমে কর্মীদের

সারণি : ১১

যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার কিছু তথ্য

• যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক বেকার হয়ে যান। ১৯৩২ সালে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের কোনো নিয়মিত চাকরি ছিল না।
• যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক বেকার হয়ে যান। ১৯৩২ সালে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের কোনো নিয়মিত চাকরি ছিল না।
• ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন শতকরা ৪৫ ভাগ কমে গিয়েছিল।
• ১৯২৯-১৯৩২ সালের মধ্যে বাড়ি তৈরির প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল শতকরা ৮০ ভাগ হারে।
• ১৯২০ সালে ব্যাংকিং সেক্টরে অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০ বিলিয়ন, যা জিডিপির শতকরা ৫০ ভাগ ছিল।
• ১৯২৯-১৯৩২ সময়সীমায় ৫০০০ ব্যাংক ব্যবসা হারিয়ে ফেলে।
• ১৯৩৩ সালে ২৫,০০০ ব্যাংকের মাঝে ১১,০০০ ব্যাংক ব্যর্থ হয়
• ১৯২৯-১৯৩৩ সময়সীমায় যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির পতন ঘটে শতকরা ৩০ ভাগ। আর স্টক মার্কেট শতকরা ৯০ ভাগ তার মূলধন হারায়।
• ১৯২৯ সালে বেকারের হার ছিল শতকরা ৩ ভাগ, ১৯৩২ সালে ছিল ২৩.৬ ভাগ।
• ক্লেভল্যান্ডে বেকারত্বের হার ছিল শতকরা ৫০ ভাগ, আর টলেডোতে (ওহিওতো) ৮০ ভাগ।
• ১৯৩০-১৯৩৪ সালে ১০ লক্ষ ফ্যামিলি তাদের কৃষি ফার্ম হারায়।
• কর্পোরেট হাউজগুলোর আয় ১০ বিলিয়ন ডলার (১৯২৯) থেকে কমে ১ বিলিয়নে দাঁড়ায় (১৯৩২)
• ১৯৩০-১৯৩৩ সময়সীমায় ৯০ লক্ষ সঞ্চয়ী হিসাব ব্যাংকগুলো থেকে উধাও হয়ে যায়।
• ১৯৩২ সালে ২,৭৩,০০০ পরিবার তাদের বাড়ি থেকে উৎখাত হন।
• ২০ লক্ষ মানুষ 'হোমলেস' (অর্থাৎ যাদের বাড়িঘর নেই) এ পরিণত হন।
• ১৯৩৩ সালে ফেডারেল সরকারের মতে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ 'গরিব' হিসেবে চিহ্নিত হন।
• ১৯২৯ সালে ২,৭৯,৬৭৮ জন ইমিগ্রেন্ট বা অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ১৯৩৩ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩,০৬৮ জন।
• ১৯৩০ সালে বেশি সংখ্যক মানুষ যুক্তরাষ্ট্র থেকে অন্যদেশে অভিবাসী হন।
• নিউইয়র্কে শতকরা ২৫ ভাগ স্কুলের ছাত্ররা ছিল অপুষ্টির শিকার। আবার পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ইলিওনিস, কেনটাকি, পেনসিলভেনিয়াতে এ সংখ্যা রেকর্ড করা হয় শতকরা ৯০ ভাগ।
• যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি লোকের অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।
• ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা রেকর্ড করা হয় ১২,২৭,৭৫০৪৬ জন, যার মাঝে শতকরা ৪০ ভাগের বয়স ২০ বছরের নিচে।

তথা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই সময়ই Social Security Act (১৯৩৫) পাশ হয়। এটা ছিল কর্মীদের এক ধরনের বিমা। কর্মীরা অবসরে গেলে বা চাকরি হারালে ফেডারেল সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পাবেন।



চিত্র : যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার সময়ে তোলা একটি ছবি

কিন্তু তারপরও অর্থনীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসছিল না। ১৯৩৬ সালে United Auto Workers-এর আহ্বানে মটরগাড়ি নির্মাতা GM Plant এ হরতাল আহ্বান করা হয়েছিল, যা 88 দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং ৩৫টি শহরে তা ছড়িয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নেওয়া অনেক সিদ্ধান্ত সংবিধান বহির্ভূত হওয়ায় (National Recovery Administration, Agricultural Adjustment Administration) তা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। ফলে সরকারের পক্ষে আ কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবারে বিমান হামলা চালায়, যা যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধের কারণে মার্কিন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন করে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, আর এভাবেই মহামন্দার অবসান ঘটে। বলার অপেক্ষা রাখে না রুজভেল্ট মার্কিন সমাজব্যবস্থা তথা অর্থনীতিতে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন, কর্মচারীদের জন্য Social Security, বেকার ভাতা, কৃষি সাবসিডি, যা আজও বহাল আছে।

সারণি : ১২

যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার কিছু পরিসংখ্যান

সাল	বেকারত্বের হার	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	মুদ্রাস্ফীতি
১৯২৯	৩.২ ভাগ	পাওয়া যায়নি	০.৬ ভাগ
১৯৩০	৮.৭ ভাগ	৮.৫ ভাগ	৬.৪ ভাগ
১৯৩১	১৫.৯ ভাগ	৬.৪ ভাগ	৯.৩ ভাগ
১৯৩২	২৩.৬ ভাগ	১২.৯ ভাগ	১০.৩ ভাগ
১৯৩৩	২৪.৯ ভাগ	১.২ ভাগ	০.৮ ভাগ
১৯৩৪	২১.৭ ভাগ	১০.৮ ভাগ	১.৫ ভাগ
১৯৩৫	২০.১ ভাগ	৮.৯ ভাগ	৩.০ ভাগ
১৯৩৬	১৯.৬ ভাগ	১২.৯ ভাগ	১.৪ ভাগ
১৯৩৭	১৪.৩ ভাগ	৫.১ ভাগ	২.৯ ভাগ
১৯৩৮	১৯.০ ভাগ	৩.৩ ভাগ	২.৮ ভাগ
১৯৩৯	১৭.২ ভাগ	৮.০ ভাগ	০.০ ভাগ
১৯৪০	১৪.৬ ভাগ	৮.৮ ভাগ	০.৭ ভাগ
১৯৪১	৯.৯ ভাগ	১৭.৭ ভাগ	৯.৯ ভাগ
১৯৪২	৪.৭ ভাগ	১৮.৯ ভাগ	৯.০ ভাগ
১৯৪৩	১.৯ ভাগ	১৭.০ ভাগ	৩.০ ভাগ
১৯৪৪	১.২ ভাগ	৮.০ ভাগ	২.৩ ভাগ
১৯৪৫	১.৯ ভাগ	১.০ ভাগ	২.২ ভাগ

সূত্র : The balance, U.S. Unemployment Rate History, Update April 03, 2020

ষষ্ঠ অধ্যায়

অটোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

The Ottoman Empire was one of the mightiest and longest-lasting dynasties in world history. This Islamic-run superpower ruled large areas of the Middle East, Eastern Europe and North Africa for more than 600 years. The chief leader, known as the Sultan, was given absolute religious and political authority over his people. While Western Europeans generally viewed them as a threat, many historians regard the Ottoman Empire as a source of great regional stability and security, as well as important achievements in the arts, science, religion and culture.

History.com

অটোমান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অটোমান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি (১ নভেম্বর ১৯২২) বিশ্বরাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে বিশাল মধ্যপ্রাচ্যের কোন এলাকা কোন শক্তির (ব্রিটিশ ও ফ্রান্স) নিয়ন্ত্রণে থাকবে, সে ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা সাইকস-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) নামে পরিচিত। এই চুক্তি নিয়ে আলোচনার পূর্বে অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে কিছুটা ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস অনেক পুরানো, এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২৯৯ সালে। ইতিহাস বলে, ওসমান-১ এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওসমান ও তার পরিবার বংশপরম্পরায় এই সাম্রাজ্য শাসন করেছে, যারা সুলতান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন অটোমানের শাসকরা, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্য ইউরোপের কিছু অঞ্চল, পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ইউরোপের কিছু অঞ্চল, ককেসাস অঞ্চল, হর্ন অব আফ্রিকা পর্যন্ত। আজকের যে তুরস্ক, সেই তুরস্কের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ আনাতোলায় Sogut শহরে (বর্তমানে Bilecik প্রদেশ) এই সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Oghuz Trukish উপজাতির নেতা ওসমান-১। সর্বশেষ শাসক ছিলেন মেহমেদ-৬। জানা যায়, ১৯২২ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি সর্বশেষ অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে অটোমান খিলাফতের অবলুপ্তি ঘটে। এর অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল মিত্রশক্তির মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল Treaty of London (১৯১৫) দিয়ে। অটোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে সুলতান মেহমেদ-৬ ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল অটোমান সাম্রাজ্যের General Assembly বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট Treaty of Sevres তে (অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে মিত্রশক্তির) অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি চূড়ান্ত হয়। এই চুক্তিতে British Mandate for Palestine এবং French Mandate for Syria and Lebanon চূড়ান্ত হয়। অর্থাৎ ফিলিস্তিনি এলাকার ব্যাপারে ব্রিটেন এবং সিরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা সাইকেস-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) নিয়েও আলোচনা করতে পারি। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পুরো আরব বিশ্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যে কর্তৃত্ব ও প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল, তার পেছনে কাজ করেছিল এই সাইকেস-পিকট চুক্তি। স্যার মার্ক সাইকেস ছিলেন ব্রিটেনের কূটনৈতিক, আর ফঁসোয়া জর্জেস-পিকট ছিলেন ফ্রান্সের কূটনৈতিক। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে এই দুই কূটনৈতিক বৈঠকে মিলিত হন এবং একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে আরব বিশ্বের কোন কোন এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে আজকের ইরাক, কুয়েত, জর্দান ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অন্যদিকে ফ্রান্সকে দেয়া হয় সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্ক। ফিলিস্তিনি এলাকার ব্যাপারে গোপন সমঝোতা হয়। দায়িত্ব দেয়া হয় ব্রিটেনকে। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোরের উদ্যোগে ফিলিস্তিন এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবেই সাইকেস-পিকট চুক্তি পুরো আরব বিশ্বকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ভাগ করলেও, আরব বিশ্বে বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর মাঝে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ থেকে গিয়েছিল। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের যে সংকট, এর পেছনে সাইকেস-পিকট অন্যতম একটি ফ্যাক্টর বলে অনেকে মনে করেন।

Treaty of Sevres (ফ্রান্সের Sevres শহরে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বিধায় এটা এই নামে পরিচিত) চুক্তিটি জাতীয়তাবাদী তার্কিশদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুর্করা (অর্থাৎ তুরস্কের জনগণ) এটাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করতেন। চুক্তিতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জন্য কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া ছাড়াও অটোমান সেনাবাহিনীর ক্ষমতাও

কমানো হয়েছিল (কোনো বিমানবাহিনী থাকবে না। সেনাসংখ্যা ৫০৭০০ সীমাবদ্ধ, আর নৌবাহিনীর জন্য থাকবে ৬টি টর্পেডো বোট ও ৭টি জাহাজ)। আর্মেনিয়ান গণহত্যার সাথে (অটোমান সাম্রাজ্যের সময়ে ১৯১৪ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ আমেরিকানদের হত্যার অভিযোগ) যারা জড়িত ছিল তাদের বিচার অন্তর্ভুক্ত ছিল চুক্তিতে। কুর্দি অঞ্চল মসুলের ভাগ্য নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। স্পষ্টতই চুক্তিতে আরো যেসব ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা তুর্কদের মনঃপূত হয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে Treaty of Sevres এ (১০ আগস্ট ১৯২০) স্বাক্ষরকারী পক্ষ ছিল দুটি Principal Allied Powers ও Centrel Powers। Allied Powers-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল ফ্রান্স, ব্রিটিশ, ইতালি ও জাপান। এরা ছিল মূল শক্তি। অন্যদিকে Central power-এ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য।

এদিকে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে Turkish National Movement সংগঠিত হয়েছিল, যার অন্যতম সংগঠক ছিলেন মুস্তফা কামাল (পরবর্তীতে তার নামের শেষে আতাতুর্ক যুক্ত হয়)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, এবং সাম্রাজ্যকে বিভক্তি তার্কিশ ন্যাশনাল মুভমেন্টকে ক্ষমতা দখলে উৎসাহিত করেছিল। অটোমানরা মনে করতেন এই বিভক্তি ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। এমনকি অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যারা সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তারাও এই বিভক্তির সমালোচনা করেছিলেন। তারা এ কারণেই Treaty of Sevres এরও সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিভক্তি কার্যত সকল অটোমান বিরোধীদের Turkish War of Independence-এর ব্যানারে একত্রিত করেছিল। ১৯১৯ সালে এটি সংগঠিত হয়েছিল, যার মুখপাত্র ও অন্যতম সংগঠক ছিলেন মুস্তফা কামাল। এরা ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্ককে একটি রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ঘোষণা করেন যে Grand National Asembly of Turkey তুরস্কের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করবে। ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি গঠিত হয়েছিল। মূলত অটোমান পরবর্তী তুরস্কে শাসনকার্য কীভাবে পরিচালিত হবে, এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই এই গ্রান্ড এসেম্বলি গঠিত হয়েছিল। মুস্তফা কামাল ছিলেন এর প্রথম স্পিকার। পরবর্তীতে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২৯ অক্টোবর ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতা। তিনি ছিলেন আধুনিক তুরস্কের জনক। তিনি তুরস্ককে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিকমনস্ক। আরবি হরফের পরিবর্তে রোমান হরফে তিনি তুর্কি ভাষার প্রচলন করেন। তিনি নারীর

ক্ষমতায়নের ব্যাপারেও অগ্রদূত ছিলেন। তার শাসন আমলে নারীরা যত বেশি ক্ষমতা ভোগ করতো, অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশে নারীদের এই সুযোগ তখন ছিল না। ১৯৩০ সালে তিনি আইন করে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকারের সুযোগ দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন, যা কি না অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ তখন পর্যন্ত চালু করেনি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন।



চিত্র : অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান গাজী

প্রকৃত অর্থে তুরস্কের জনগণের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে বজায় রাখার জন্য Turkicisation প্রবর্তন করেন-এর মাধ্যমে তিনি তুর্কি জাতীয়তাবোধকে ধারণ ও তুর্কি জাতির ঐক্য নিশ্চিত করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রে তুর্কি ভাষা ব্যবহার, যারা জাতিগত তুর্কি নন, তাদেরকে তুর্কি ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য করা, ঐতিহ্যবাহী তুর্কি নাম ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছিল। তুরস্কের পার্লামেন্ট তাকে আতাতুর্ক বা জাতির পিতার উপাধি দিয়েছিল ১৯৩৪ সালে। মাত্র ৫৭ বছর বয়সে তিনি ১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর মারা গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৮১ সালকে ইউনেস্কো 'আতাতুর্কি বছর' হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং তাকে আখ্যায়িত করেছিল এভাবে 'the leader of the first struggle given against colonialism and imperialism and a remarkable promoter

of the sense of understanding between peoples and durable peace between the nations of the world and that he worked all his life for the development of harmony and cooperation between peoples without distinction।' তার এই স্বীকৃতি তাকে একজন 'বিশ্ব নেতায়' পরিণত করেছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর তুরস্কের ঐক্য নিয়ে যখন নানা প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল, একমাত্র তার সঠিক নেতৃত্বের কারণেই তুরস্কের ঐক্য নিশ্চিত হয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে তুরস্ককে তিনি ঐক্যবদ্ধই রাখেননি, বরং তুরস্ককে একটি অন্যতম শক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও একটা অভিযোগ আছে যে তিনি ইসলাম বিরোধী ছিলেন। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন পশ্চিমা ধ্যানধারণা সম্পন্ন একজন মানুষ। তুরস্কে যেভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করা হতো, তাতে তিনি কিছু সংস্কার আনেন। যেমন তুরস্কের পার্লামেন্টে ১৯২৫ সালের ২৫ নভেম্বর Hat Law আইন পাশ হয়। এই আইন বলে পুরুষদের মাথায় পশ্চিমা ধাঁচের হ্যাট বা টুপি প্রবর্তন করা হয়। এরা আগে সাধারণ মানুষ ফেজ টুপি ব্যবহার করতো। একজন ধর্মপণ্ডিত বা উলেমা মাথায় যেভাবে 'তুরবান' ব্যবহার করতেন, তা এই আইনবলে নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৪ সালে প্রবর্তিত *The Law Relating to Prohibited Garments* বলে প্রকাশ্যে পুরুষদের জন্য সব ধরনের ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়। তবে মহিলাদের জন্য প্রকাশ্যে 'হিজাব' পরা নিষিদ্ধসংক্রান্ত কোনো আইন পাশ হয়নি। কোনো কোনো মিউনিসিপালিটিতে মহিলাদের 'নেকাব' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের সময় কোরানশরিফ আরবি ভাষায় পাঠ হতো, যা অনেক সাধারণ মানুষ বুঝতো না। তিনি তুর্কি ভাষায় কোরানের অনুবাদ ও তুর্কি ভার্সন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তা প্রকাশ পায়। তিনি তুর্কি ভাষায় আজানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব কারণের জন্য তাকে অনেকে anti-Islam হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেন।

প্রায় ১ দশমিক ৮ মিলিয়ন কিলোমিটারের এক বিশাল এলাকা নিয়ে অটোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আজকের তুরস্ক, গ্রিস, বুলগেরিয়া, মিসর, হাঙ্গেরি, মেসিডোনিয়া, রুমানিয়া, জর্ডান ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কার্যত অটোমান সাম্রাজ্যের বিদায়ের মধ্যে দিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য চলে যায় দুই উপনিবেশ শাসক, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে। তারা তাদের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় (সিরিয়া ও ইরাক লক্ষণীয়)। তুরস্ক তার স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পশ্চিমা ধাঁচের গণতান্ত্রিক

সংস্কৃতি বিনির্মাণের উদ্যোগ নেয়। মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের বিদায়ের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে 'শূন্যতা'র সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় : ১. একজন ধর্মীয় ব্যক্তি বা ইমামের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা (ইয়েমেন, ওমান, হেজাজ, ইরান), ২. গোত্রপ্রধানের কর্তৃত্বে একটি ব্যবস্থা, যেখানে গোত্রপ্রধান অন্যান্য গোত্রের আনুগত্য নিশ্চিত করে ক্ষমতা পরিচালনা করবেন (সৌদি আরব)। ধর্ম সেখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে (ওয়াহিবিজম), ৩. সনাতন সেক্যুলার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যেখানে পারিবারিকভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করা হতো এবং যেখানে ধর্মীয় পণ্ডিতদের প্রভাব তেমন ছিল না (কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, লেবানন), ৪. এক ধরনের ব্যুরোক্রেসি-সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যেখানে ঊর্ধ্বতন সেনা নেতৃত্ব একটি বড় ভূমিকা পালন করেন (আলজেরিয়া, মিসর, তিউনেসিয়া); ৫. উপনিবেশবাদী শক্তি যখন ক্ষমতা ছেড়ে দেয়, তখন তাদের প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বহাল থাকে এবং কোথাও কোথাও বামমনা রাজনৈতিক সংগঠন ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে নতুন একটি রাষ্ট্র কাঠামোর জন্ম (ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল)।

প্রকৃত অর্থে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) মধ্যপ্রাচ্যে কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেয়নি। ফলে একদিকে গোত্রপ্রধান ও পারিবারিক কর্তৃত্ব নতুন এক ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। আর অন্যদিকে সেনাবাহিনী, যারা উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল (আলজেরিয়া) কিংবা প্যান ইসলামের জন্ম দিয়েছে (মিশর), তাদের নেতৃত্বে জন্ম হয়েছিল নয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা। একটি তৃতীয় ধারাও লক্ষ করা যায়, যেখানে বামমনা একটি পার্টি (বাথ পার্টি) ও সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে নতুন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম। এক্ষেত্রে দেখা যায় বাথ পার্টি ইরাকে সেনাবাহিনী তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল, আবার অন্যদিকে দেখা যায় বাথ পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতো সেনাবাহিনী। প্রায় প্রতিটি আরব রাষ্ট্রে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কোথাও এই কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (মিশর, ইরাক), কোথাওবা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোত্রীয়ভাবে (সিরিয়া)। সৌদি আরব একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠলেও, *ওয়াহিবিজম* এই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বড় ভূমিকা পালন করে, যা কি না একুশ শতকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী বড় সংকটের জন্ম দেয়। *আল কায়দার* উত্থানের পেছনে রয়েছে এই *ওয়াহাবি* মতাদর্শ, যা কি না আদি ইসলামিক শাসনব্যবস্থার কথা বলে। অন্যদিকে ১৯৭৯ সালে ইরানে যে ইসলামিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল, তার পেছনে কাজ করেছিল *শিয়া* রাজনৈতিক মতাদর্শ।

সারণি : ১৩

অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি : কিছু তথ্য

• Sykes-Picot Agreement Triple Entente নামেও পরিচিত। কেননা রাশিয়ার সম্রাট এই চুক্তি সমর্থন করেছিলেন।
• ব্রিটেন অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯১৪ সালে।
• বিভক্তির সময় রাশিয়াকে দেয়া হয়েছিল Constantinople (বর্তমানে ইস্তাম্বুল) Turkish Straits এবং Armenia।
• Sykes-Picot চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি হলেও এটি বাস্তবায়ন করে সদ্য গঠিত লীগ অব নেশনস্।
• এই চুক্তি নিয়ে পুনরায় আলোচনা হয়, যার রেশ ধরে সম্পাদিত হয় Treaty of Lausanne (২৪ জুলাই ১৯২৩)। এই চুক্তিতে তুরস্কের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।
• ৭০০ বছর অটোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল।
• ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ম্যান্ডেট দেয়া (Mandatory Palestine) হয় এবং এই অঞ্চলটি শাসন করে ১৯২৩ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। সেই থেকে ব্রিটেন মেসোপটেমিয়া (ইরাক) শাসন করে ১৯২০ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত।
• ফ্রান্সকে দেওয়া হয় সিরিয়া এবং লেবানন (French Mandate for Syria and the Lebanon) ১৯২৩-১৯৪৬। সেই সাথে দেয়া হয় Alexandretta (বর্তমান তুরস্কের Iskenderun)।

এটা ঠিক, অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্য ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলো। যে শাসনব্যবস্থার জন্ম তারা দিয়েছিল, তাদের বিদায়ের পর, সেই শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও, সেই শাসনব্যবস্থার সাথে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বলা ভালো, ১৯৪৮ সালে ১৪ মে ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। এই প্রত্যাহার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সৃষ্টি ও ৫টি আরব রাষ্ট্র (জর্ডান, মিশর, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক) কর্তৃক ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা যে 'সংকট' এর জন্ম দিয়েছিল, তা আজও আছে। আর ১৯৪৫ সালের ১৯ মে-১৯ জুলাই সিরিয়া ও লেবানন থেকে ফ্রান্স নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। উপনিবেশবাদী শক্তির বিদায়ের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যে শাসনব্যবস্থা বিকশিত হয়, তাতে দেখা যায় কিছু কিছু রাষ্ট্র (মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক) একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বজায় রাখে। কিছু কিছু রাষ্ট্র (ইরান, লিবিয়া, আরব আমিরাত, ইয়েমেন) পশ্চিমা রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখে। এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কোনো কোনো রাষ্ট্র বজায় রাখে, যেখানে কোনো মতাদর্শ স্থান পায়নি। সিরিয়া, ইরান ও পারসীয় গালফ অঞ্চলভুক্ত দেশ।

সপ্তম অধ্যায়

ফিলিস্তিন সংকট

> There is concern that a 'hird intifada could break out and that renewed tensions will escalate into large-scale violence. The United States has an interest in protecting the security of its long-term ally Israel and achieving a lasting deal between Israel and the Palestinian territories, which would improve regional security.
>
> **Global Conflict Tracker Alerts**

ফিলিস্তিন সংকট এমন একটি সংকট, যা সত্তর বছরের উপরে চলমান। পৃথিবীতে আর কোনো সমস্যা নেই, যার সাথে ফিলিস্তিন সমস্যার তুলনা করা যায় এবং যার সমাধান হয়নি। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসছে। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। যে সমস্যার জন্ম বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, আজ একুশ শতকে এসেও এর কোনো সমাধান হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্মের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময় এবং একুশ শতকে এসেও এটি বিশ্বরাজনীতিতে সংকট তৈরি করেছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের সাথে জড়িত রয়েছে বেলেফোর ঘোষণা (Balfour Declaration)। ১৯১৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. জে. বেলেফোর ব্রিটিশ জায়নিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি লর্ড রথসচাইল্ডকে একটি চিঠি দেন। এই চিঠির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদিদের জন্য একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসে এটাই বেলেফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। ১৯২২ সালে *লীগ অব নেশনস*-এর সভায় ব্রিটেনকে *প্যালেস্টাইনের* ওপর ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়। বেলেফোর ঘোষণার পরপরই ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ইহুদিরা ব্যাপক হারে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। আর এর বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনিরা বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তারা দাবি করেছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসানের। তারা চেয়েছিল একটি স্বাধীন

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলো বারবার তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্যালেস্টাইন অধ্যুষিত আরব এলাকা বিভক্তির মধ্য দিয়ে যে বৈরিতার জন্ম হয়েছিল, দীর্ঘ ৭৩ বছর পরও সে বৈরিতার পুরোপুরি অবসান হয়নি। পশ্চিমা শক্তিগুলো সেদিন জাতিসংঘকে ব্যবহার করে প্যালেস্টাইনি এলাকায় গঠন করেছিল ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে মিশর, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইল যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। সেটা ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরাইলের প্রথম যুদ্ধ। পরবর্তীকালে আরব রাষ্ট্রগুলো আরো দু'বার ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের ফলে এক বিরাট আরব এলাকা ইসরাইলিরা দখল করে নেয় এবং ধীরে ধীরে অধিকৃত আরব এলাকায় গড়ে তোলে ইহুদি সাম্রাজ্য। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল দখল করে নিয়েছিল মিশরের সিনাই আর সিরিয়ার গোলান উপত্যকা। পরবর্তীকালে ক্যাম্প ডেভিড (১৯৭৮) চুক্তির বিনিময়ে মিশর সিনাই এলাকা ফিরে পেলেও সিরিয়া তার গোলান উপত্যকা ফিরে পায়নি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল প্যালেস্টাইনি এলাকা গাজা ও পশ্চিম তীর দখল করে নিয়েছিল। একই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গিয়েছিল পূর্ব জেরুজালেম ও সেখানে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ। ইসরাইল এখন এই এলাকা দাবি করছে তাদের পবিত্র স্থান জুদিয়া ও সামারিয়ার কথা বলে। ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে জুদিয়া ও সামারিয়ার কথা বলা আছে। মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক শান্তি আলোচনার জন্ম ১৯৭৩ সালে জেনেভায়। এই আলোচনার সূত্র ধরেই ক্যাম্প ডেভিডে ১৯৭৮ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, যার বিনিময়ে মিশর ফিরে পেয়েছিল সিনাই এলাকা। মিশর তার হারানো জমি ফিরে পেয়েছিল সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন তাকে আরব বিশ্বে একলা চলতে হয়েছিল। এমনকি সাদাতকে তার জীবন দিয়েই এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল।

ইসরাইলের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও ইসরাইল কখনো তার একগুঁয়ে মনোভাব পরিত্যাগ করেনি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩০৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইলের অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের সেই সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকর করেনি। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সব সময় ইসরাইলকে সমর্থন করে গেছে। একই সাথে ইহুদিবাদকে বর্ণবাদ বলে যে সিদ্ধান্ত এক সময় জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছিল, ১৯৯২ সালে সেই প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করে আমেরিকা প্রশাসন জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব এনেছিল এবং জাতিসংঘে তা গৃহীতও হয়েছিল। অথচ আমেরিকা প্রশাসন কখনো

ইসরাইলকে বাধ্য করেনি কিংবা জাতিসংঘ ইসরাইলকে বাধ্য করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি এলাকা ফিরিয়ে দিতে। ইসরাইলের ভূমিকার কারণে ফিলিস্তিনদের মাঝে ইসরাইল বিরোধী মনোভাব দিনে দিনে বাড়ছিল। ১৯৮৭ সালে প্যালেস্টাইনিরা অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে 'ইন্তিফাদা' আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্স সম্মেলনে পিএলও ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল।

২০২০ সালে এসেও ফিলিস্তিন রাজনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হয়নি। ২২ বছর আগে ২৩ অক্টোবর (১৯৯৮) ওয়াশিংটনের অদূরে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন প্রশাসনের মধ্যে যে উই রিভার (Wye River) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার রেশ ধরে ইসরাইলি রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছিল। কট্টরপন্থি ইহুদিরা এই চুক্তির বিরোধিতা করছে। ইসরাইলের সংসদে এই চুক্তিটি অনুমোদিত হলেও, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছেন। তিনি এখন লেবার পার্টির সমন্বয়ে সেখানে একটি সরকার গঠন করেছেন (২০২০)। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৮ সালের ২৩ অক্টোবর স্বাক্ষরিত উই রিভার চুক্তি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উভয় চুক্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। বলা যেতে পারে ওয়াশিংটনের উদ্যোগেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ইসরাইলে বিরোধী লেবার দল উভয় চুক্তি সমর্থন করলেও কট্টরপন্থিরা ফিলিস্তিনদের সাথে স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তিকেই সমর্থন করেনি। তাদের এই বিরোধিতা, অধিকৃত আরব এলাকা থেকে চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রত্যাহারের অস্বীকৃতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানের ব্যাপারে ওয়াশিংটন চুক্তি (১৯৯৮) ও উই রিভার চুক্তি (১৯৯৯) ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ফিলিস্তিন স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ওয়াশিংটন চুক্তি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই শান্তিচুক্তির ফলে ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে সীমিত স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইলি সেনাবাহিনী এই এলাকা দখল করে নিয়েছিল। বলা ভালো ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৯৩) ইসরাইল ও পিএলও পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। সেটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। পারস্পরিক স্বীকৃতি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আপাত অবসান ঘটেছিল দীর্ঘদিনের বৈরিতার। এক সময় পিএলও'র জাতীয় কাউন্সিলে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ইসরাইলকে স্বীকৃতি জানানোর সময় পিএলওকে লিখিতভাবে সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগের কথা জানাতে হয়।



চিত্র : ঐতিহাসিক ছবি। আরাফাত করমর্দন করছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী রবিনের সাথে। মাঝখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন (ওয়াশিংটন ডিসি, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩)

ইসরাইল ও পিএলও'র মাঝে শান্তিচুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি, তিনি ছিলেন নরওয়ের প্রয়াত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান জর্গেন হলেস্ট। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দীর্ঘদিন ধরে নরওয়েতে পিএলও ও ইসরাইলের মধ্যে গোপন আলোচনা চলে আসছিল। গোপন আলোচনার ফলশ্রুতিতেই পিএলও ও ইসরাইল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত দলিলটি তিনটি চিঠির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। প্রথম দুটি হচ্ছে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত ও ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের পরস্পরকে সম্বোধন করে লেখা। অবশিষ্ট চিঠিটি হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেস্টকে লেখা ইয়াসির আরাফাতের চিঠি। প্রথম চিঠি লেখেন আরাফাত রবিনকে ৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯৩)। তাতে তিনি ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও দু'পক্ষের দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানের অঙ্গীকার করেন। এর জবাব দেন রবিন ১০ সেপ্টেম্বর। তাতে তিনি পিএলওকে ফিলিস্তিন জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নেন ও পিএলও'র সাথে আলোচনা শুরু করার কথা জানান। তৃতীয় চিঠিতে আরাফাত হলেস্টকে সহিংসতা বন্ধের উদ্দেশ্যে পিএলও ফিলিস্তিন জনগণের প্রতি যে আহ্বান জানানোর পরিকল্পনা করেছে, তার বিবরণ দেন।

অন্যদিকে উই রিভার চুক্তির গুরুত্বও কম নয়। 'উই রিভার' চুক্তিকে বলা হচ্ছে ভূমির বিনিময়ে চুক্তি। দীর্ঘ ১৯ মাসের অচলাবস্থার অবসান করে ওই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও জর্দানের বাদশা হোসেনও ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তির উল্লেখযোগ্য

দিকগুলো হচ্ছে- (১) ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ এলাকা ফিলিস্তিনদের হাতে অর্পণ ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এর মাঝে ৩ শতাংশ এলাকা 'সবুজ বেষ্টনী' অথবা সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করবে। ওই সবুজ বেষ্টনীতে বসবাসকারী ইসরাইলিদের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনের বিষয়টি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে, (২) সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে এবং নিজ নিজ বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের বিচার করা হবে এবং ইহুদি ও ফিলিস্তিনদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দুই সপ্তাহ অন্তর সন্ত্রাস দমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করবে, (৩) ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি ডিক্রি জারি করবে, (৪) নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রশ্নে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক বিনিময়সহ অব্যাহতভাবে উভয়পক্ষ ব্যাপক দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে (৫) পিএলও'র জাতীয় কমিটি এবং ফিলিস্তিন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইসরাইল বিরোধী ধারাগুলো এক্সপাঞ্জ করবে, (৬) গাজা উপত্যকায় একটি শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে এবং এ এলাকায় একটি বিমানবন্দর তৈরি করা হবে। এই চুক্তি অনুযায়ী পিএলও জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যে তাদের জাতীয় সনদ থেকে ইসরাইল বিরোধী ধারাগুলো এক্সপাঞ্জ করেছে এবং গাজায় প্রথম বিমানবন্দরের উদ্বোধন করা হয়েছে।

'উই রিভার' চুক্তি স্বাক্ষরের পর কেটে গেছে ২২ বছর। এর মধ্যে একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে থাকা এই সমস্যার আদৌ কোনো সমাধান হয়নি। শান্তি প্রস্তাব কাগজে কলমেই থেকে গেছে। এখানে প্রধান সমস্যা ইসরাইলকে নিয়ে। ইসরাইলের আগ্রাসী মনোভাব ও দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন পরিস্থিতিকে বারবার জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর সাথে এখন যোগ হয়েছে ইসরাইল কর্তৃক জেরুজালেমে তাদের রাজধানী স্থানান্তর ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তাদের দূতাবাস সেখানে সরিয়ে নেওয়া ও জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া (২০১৭)। এদিকে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা (ইসরাইল ও ফিলিস্তিন) বিগত মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক সমর্থিত হলেও ট্রাম্প এই ফর্মুলাকে সমর্থন করেননি। তিন রাষ্ট্রের ফর্মুলার কথাও শোনা যাচ্ছে (ফিলিস্তিন, ইসরাইল এবং গাজার কর্তৃত্ব মিশরের, আর ওয়েস্ট ব্যাংক জর্ডানের হাতে)। বলা ভালো, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে- গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংক বা পশ্চিম তীর। ২০০৭ সালের পর গাজার (৩৬৫ বর্গ কিলোমিটার) নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে চরমপন্থি হামাসের (Hamas) হাতে। অন্যদিকে ওয়েস্ট ব্যাংক (৬৬৫৫ বর্গ কিলোমিটার) এ ফিলিস্তিন

কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পূর্ব জেরুজালেম ইসরাইল দখল করে নিয়েছে। পুরো অঞ্চলটি তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে– Area 'A' ও Area 'B' ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হাতে থাকলেও, Area 'C' তে ইসরাইলের কর্তৃত্ব রয়েছে। Area 'A' (ওয়েস্ট ব্যাংকের মাত্র ১১ ভাগ এলাকা)তে ফিলিস্তিন কর্তৃত্ব, Area 'B' তে (২৮ ভাগ এলাকা) যৌথ ফিলিস্তিন-ইসরাইলি প্রশাসন, আর Area 'C' তে (৬১ ভাগ এলাকা) ইসরাইলি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৭ সালে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মাঝে বিভক্তি আসে। হামাস ও ফাতাহ্ আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে। ওয়েস্ট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণভার হামাস-এর হাতে। রামাল্লাতে রয়েছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক দপ্তর। হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে মনে করে। হামাস, ফাতাহ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েছে ইসরাইল। বলা ভালো, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফাতাহ্ উপদলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানের ব্যাপারে যখন 'দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা' কাজ করছিল না, তখন ট্রাম্প নিজে একটি প্রস্তাব করেন (২০২০)। তার ওই প্রস্তাবে রয়েছে, ১. জেরুজালেমের একটা বড় অংশ থাকবে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে এবং জেরুজালেম হবে ইসরাইলের রাজধানী, ২. ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুরা আর ফিরে আসতে পারবেন না, ৩. ইসরাইল ও ওয়েস্ট ব্যাংকের মধ্যে সীমানা পুনঃনির্ধারণ, ৪. ফিলিস্তিনরা কোনো নিরাপত্তা রক্ষী বা ফোর্স গঠন করতে পারবে না। এই ফর্মুলা ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সমর্থন করেনি। অভিযোগে আছে, ইসরাইলের স্বার্থেই ট্রাম্প এই ফর্মুলা উপস্থাপন করেছেন। লন্ডনের গার্ডিয়ানে রশিদ খালিদি লিখেছেন, এই ফর্মুলা সংকট আরো বাড়াবে (৩০ জানুয়ারি ২০২০)।

২০২০ সালের আগস্ট মাসে এসে ফিলিস্তিন সংকট নতুন একটি মাত্রা পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইসরাইল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ আল নাহিয়ান এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'এই ঐতিহাসিক অগ্রগতি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির অগ্রযাত্রায় সাহায্য করবে'। তারা জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের বিনিময়ে ইসরাইল পশ্চিম তীরের বিশাল ফিলিস্তিন এলাকা ইসরাইলের অংশ করে নেয়ার কাজ আপাতত স্থগিত রাখবে। ইসরাইলের সঙ্গে এতদিন পর্যন্ত কোনো উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তবে ওই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন সংযুক্ত আরব আমিরাত

ইসরাইলের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বাড়াচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওই ঘোষণার পর নেতানিয়াহু হিব্রুতে টুইট করেছেন "এক ঐতিহাসিক দিন" বলে। যুক্তরাষ্ট্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ আল ওতাইবা বলেছেন, "এটি ওই অঞ্চলে কূটনীতির বিজয়।" তিনি একে আরব-ইসরাইল সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে বর্ণনা করে বলেন, এর ফলে উত্তেজনা কমবে এবং অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। এটি ইসরাইলের সঙ্গে তৃতীয় কোনো আরব রাষ্ট্রের শান্তি চুক্তি। এর আগে মিসর ১৯৭৯ সালে এবং জর্ডান ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে। সামনের দিনগুলোতে ইসরাইল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিরা বিনিয়োগ, পর্যটন, সরাসরি ফ্লাইট, নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার জন্য বৈঠকে বসবেন। এই যখন পরিস্থিতি, তখন গত ১৫ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউজে আরব আমিরাতের পাশাপাশি বাহরাইন ইসরাইলের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মধ্যে দিয়ে ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শান্তি পরিকল্পনার প্রতি আরব দেশগুলোর সমর্থন বাড়ানো। সৌদি আরব ও ওমানের মতো দেশও বাহরাইন ও আরব আমিরাতের পথ অনুসরণ করতে পারে। এ ধরনের একটি চুক্তি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আরব বিশ্বের দীর্ঘদিনের শক্ত অবস্থান দূর্বল হয়ে পড়বে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকট সমাধানে একটি ভূমিকা পালন করতে পারতো। কিন্তু ট্রাম্প ফর্মুলা একপেশে হওয়ায় আপাতত এই সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। দীর্ঘ ৭৩ বছরেও একটি সমস্যার সমাধান না হওয়া একুশ শতকের বিশ্বরাজনীতির জন্যও একটি খারাপ সংবাদ।

অষ্টম অধ্যায়

ফ্যাসিবাদের উত্থান

> Fascism is a form of radical authoritarian nationalism that came to prominence in early 20th-century Europe, characterized by one-party totalitarian regimes run by charismatic dictators, glorification of violence, and racist ideology.
>
> **Boundless World Historry**

বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব। এই ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ইউরোপে বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা করেছিল। ফ্যাসিবাদের কারণে জার্মানি ও ইতালি সরকার বিশ্ব আসরে সমালোচিত হয়েছে। ফ্যাসিজম হচ্ছে একটি দর্শন, যে দর্শনের মাধ্যমে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠিকে বাধ্য করা হয়। এই দর্শন উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। এই দর্শন এক ধরনের কর্তৃত্ববাদের জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসিবাদের সাথে জার্মানির নাজি পার্টি ও হিটলার, ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনি, স্পেনে ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকো, আর্জেন্টিনার জুয়ান পেরেনের নাম জড়িত। ফ্যাসিজম নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সোস্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক রবার্ট প্যাক্সটন (Robert Paxton)। ফ্যাসিজমকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে– 'a form of political practice distinctive to the 20th ceutury that arouses popular enthusiasm by sophisticated propagranda techniques for an anti liberal, anti-social, violently exclusionary, expansionist nationalist agenda'। অর্থাৎ এটি একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা দল বা ব্যক্তির জণপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই কর্মকাণ্ড উদারপন্থি মতবাদ ও সামাজিক মতবাদ বিরোধী, যা কি না চরম উগ্রপন্থি জাতীয়তাবাদী দর্শনকে সমর্থন করে। জেভ স্টার্নহেল (Zeev Sternhell) ১৯৯৬ সালে ফ্যাসিবাদের উপর একটি বই লেখেন– *Neither Right nor Left : Fascist Ideology in France*। তিনি ফ্যাসিবাদকে 'form of extreme nationalism' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অর্থাৎ উগ্র জাতীয়তাবাদেরই একটি রূপ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। অধ্যাপক প্যাক্সটন ১৯৮৮ সালে Journal of Modern History তে *The Five Stages of Fascism* শীর্ষক আরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Live Science, 25 January 2017)। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ফ্যাসিজম সেইসব দেশেই উদ্ভব ঘটেছে, যেখানে এক ধরনের গণতন্ত্র ছিল এবং মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। জার্মানিতে হিটলারের নাজি পার্টির উত্থান এর বড় প্রমাণ। হিটলারের উত্থানের আগে (১৯৩৩) সেখানে তিন বছর কোনো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতাই হিটলারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লরেন্স ব্রিট (Lawrence Britt) ফ্যাসিবাদের ১৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন (*Fascism Anyone? Free Inquiry*, Spring 2003, Page-20)। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, ১. Powerful and Continuing Nationalism। শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দর্শন, ২. Disdain for the Recognition of Human Rights- মানবাধিকারের ব্যাপারে এক ধরনের অবজ্ঞা, ৩. Identification of Enemies/Scapgoats as a Unifying Cause-প্রতিপক্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা, ৪. Supremacy of the Military- সেনাবাহিনীর আধিপত্য, ৫. Rampant Sexism-পুরুষশাসিত সমাজ, পুরুষ কর্তৃত্ব বজায় রাখা। জাতীয় নীতিতে সমকামিতা, গর্ভপাত নিষিদ্ধ, ৬. Controlled Mass Media-গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করা, ৭. Obsession with Natonal Security- জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে এক ধরনের মোহ, ৮. Religion and Government are Intertwined–ধর্ম ও সরকার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, ৯. Corporate Power is Protected কর্পোরেট ক্ষমতা সুরক্ষিত, ১০. Labor power is Suppressed–শ্রমিকদের ক্ষমতা দমিয়ে রাখা, ১১. Disdain for Intellectual and the Arts–বুদ্ধিজীবী ও শিল্পকলার ব্যাপারে এক ধরনের অবজ্ঞা, ১২. Obsesion with Crime and Punishment–অপরাধ ও শাস্তিপ্রদানের ব্যাপারে এক ধরনের মোহ, ১৩. Rampant Cronyism and Corruption–ব্যাপক আনুগত্যতা ও দুর্নীতি, ১৪. Fraudulent Election-নির্বাচনে দুর্নীতি ও প্রতারণা। লরেন্স ব্রিট হিটলার (জার্মানি), মুসোলিনি (ইতালি), ফ্রাংকো (ইতালি), সুহার্তো (ইন্দোনেশিয়া), পিনোশের (চিলি) রাজনীতি পর্যালোচনা করে এসব বৈশিষ্ট্য পেয়েছেন।

এটা ঠিক ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ব্যাপক নিন্দা কুড়ালেও, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকায় ও লাতিন আমেরিকায় ফ্যাসিবাদী শাসকদের দেখা যায়। এই

ফ্যাসিবাদী শাসকদের জনগণের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণের ভোটে এদের কেউ কেউ নির্বাচিত হলেও (হিটলার), অনেক ক্ষেত্রেই ফ্যাসিবাদী শাসকরা বন্দুকের মুখে ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। লাতিন আমেরিকায় সেনা শাসকদের ক্ষেত্রে আমরা এটা প্রত্যক্ষ করি।

ইউরোপের প্রথম ফ্যাসিস্ট শাসক ছিলেন বেনিটো মুসোলিনি। তিনি লাটিন শব্দ *fasces* থেকে তার দলের নাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপে বেশ কিছু ফ্যাসিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল। National Fascist Party (Nazionale Fascista), যার নেতৃত্বে ছিলেন মুসোলিনি, নাজি পার্টির (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) নেতৃত্বে ছিলেন হিটলার, Fatherland Front (Vaterlandische Front) অস্ট্রিয়ায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন এঙ্গেলবার্ট ডলফুস, পর্তুগালে এন্টোনিও ডি আলিভিয়েরা সালাজারের নেতৃত্বে National Union (Uniao Nacional), গ্রিসে আইওয়ান্নিস মেটাক্সয়াসের নেতৃত্বে Free Believers, ক্রোয়েশিয়ায় আন্তে পাভেলিসের নেতৃত্বে Ustasa, নরওয়েতে National Union (Nasjonal Somling), যার নেতৃত্বে ছিলেন ভিদকুন কুইসলিং, স্পেনে জোসে এন্টোনিও প্রিমো ডি রিভেরার নেতৃত্বে Falange (Phalanx) ও ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকোর নেতৃত্বাধীন দল ইতিহাসে ফ্যাসিস্ট দল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তবে এরা সবাই যে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিলেন, তেমনটি নয়। কেউ কেউ ক্ষমতা দখল করেছিলেন, কেউবা আবার ক্ষমতা দখলে অংশীদার হয়েছিলেন। ফ্রান্সে বেশ কয়েকটি ফ্যাসিস্ট পার্টির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন কর্নেল ফ্রাসোয়া ডি লা রোকার নেতৃত্বে French Social Party (Parti Social Francais), জর্জেস ভেলোইসের নেতৃত্বে Faisceau, পিয়োরে টাইটিনগারের নেতৃত্বে Young Patriots, ফ্রাসোয়া কোটির নেতৃত্বে French Solidarity, জ্যাকুয়েস বুকার্ডের নেতৃত্বে French Popular Party ইত্যাদি। ব্রিটেনেও এই ফ্যাসিস্ট পার্টির অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়– যেমন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে আসওয়াল্ড মোসলের নেতৃত্বে The British Union of Fascists। বেলজিয়ামে Rexist Party (নেতৃত্বে ছিলেন লিওন দেগরেলে) নামও ফ্যাসিস্ট পার্টি হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। পশ্চিম ইউরোপের বাইরে রাশিয়ায় (Russian Fascist Party, নেতৃত্বে কনসটানটিন রোদঝাভেস্কি), দক্ষিণ আফ্রিকার (National Socialist Movement, the South African Fascists, South African National Democratic Party). সিরিয়ায় Syrian National Socialist Party, ইরাকে Iraqi Future Movement, মিশরে Young Egypt Movement, জাপানে (তাইসো নেসর্হিনকাই'র নেতৃত্বে, Taisho Sincerity League, Imperial Way Faction-Kado-ha, Greater Japan National Essence Association- Dai Nippon Kokusui-kai, Anti Red Corps-Bokyo Gokoku-Dan, New Japan League-Shin-Nihon Domei, Great Japan Youth Party-Da-Nihon Seinen-dan), লাতিন আমেরিকার চিলিতে জর্জ গনজালেস এর নেতৃত্বে Nacis, মেক্সিকোতে নিকোলাস রডরিগুয়েজের নেতৃত্বে Gold Shirts, পেরুতে লুইস সানচেজ কেররোর নেতৃত্বে Revolutionary Union (Union Revolucionaria), ব্রাজিলের *Acao integralista brasileira* 'র মতো দল ফ্যাসিস্ট পার্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে Ku klux klan, Social Justice পার্টিকেও ফ্যাসিস্ট পার্টি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (দেখুন Encyclopedia Britannica, Fascism, লেখক Robert Soucy)। তবে বাস্তবতা হচ্ছে হিটলার, মুসোলিনি ও ফ্রাংকোর নামই ইতিহাসে বারবার আলোচিত হয়েছে ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা হিসেবে।

মুসোলিনি

ইতালীয় ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা ছিলেন বেনিটো মুসোলিনি। ১৮৮৩ সালে উত্তর ইতালিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি সভা করেন। তাদের সাথে নিয়ে তিনি গঠন করেন *Fascio di Combattamento,* যার বাংলা অর্থ হচ্ছে সংগ্রামী ঐক্য। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা। তিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে তিনি তার আন্দোলনকে Fascist Party তে রূপান্তরিত করেন। তার দলের মতাদর্শ ছিল কমিউনিস্ট বিরোধী। এই দলটি ইতালি শাসন করেছে ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৩ সালে *Grand Council of Fascism* কর্তৃক মুসোলিনি অপসারিত হয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় মুসোলিনি প্রথমে ১৯১৫ সালে রাজনৈতিক দল হিসেবে *Revolutionary Fascist Party* গঠন করেন (Partito Fascista Rivoluzionario-RER)। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে RER খারাপ ফলাফল করলে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে দলটি National Fascist Party নামে আত্মপ্রকাশ করে। দলটি পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালির প্রভাব বলয় বিস্তারের আওতায় নিয়ে আসা এবং বিশাল এক ইতালীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। দলটি কর্পোরেট অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করতো এবং মনে করতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে 'Class Conflict' দূর হয়ে

হবে 'Collaboration between the classes'। অর্থাৎ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্ব দূর হবে। দলটি ছিল Liberalism বা উদারপন্থি রাজনীতির বিরোধী। মার্কসবাদ তথা সমাজতন্ত্রের বিরোধীও ছিল দলটি। ফ্যাসিস্ট পার্টির দর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে, দলটি ইতালীয় জাতীয়তাবাদ, কর্পোরেটিজম, ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় কনজারভেটিজম ও সোশ্যাল কনজারভেটিজ এর সমর্থক।

মুসোলিনিকে তার সমর্থকরা সম্মান করে সম্বোধন করতেন *Duce* হিসেবে। এই শব্দটি ল্যাটিন ভাষা dux থেকে এসেছে, যার অর্থ Leader বা নেতা। ১৯২২ সালের ২৪ অক্টোবর দলের নেপল্‌স সম্মেলনে মুসোলিনি ঘোষণা করেন 'Our program is simple, we want to rule Italy' - আমাদের কর্মসূচি পরিষ্কার, আমরা ইতালি শাসন করতে চাই'। এর চারদিন পর ১৯২২ সালের ২৮ অক্টোবর মুসোলিনি *'March on Rome'* এর আয়োজন করেন। প্রায় ৩০ হাজার লোক নিয়ে তিনি একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন। National Fascist Party'র ৪ নেতা, যাদের পরিচিতি ছিল Quadrumvirs হিসেবে (মিসায়েলে বিয়ানসি, এমিলিও ডি বোনো, সেজারে মারিয়া ডি ভিসি্স ও ইটালো বালবো), তারা *March on Rome*-এ অংশ নেন ও মুসেলিনিকে সমর্থন জানান। যদিও মুসোলিনির সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, কিন্তু ওই উদ্যোগ পরিণামে মুসোলিনির সাথে রাজা ভিক্টর এমানুয়েলা-৩ এর সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হবার পথ প্রশস্ত হয়। সেনাবাহিনীর একটি অংশ মুসোলিনিকে সমর্থন করে। ফলে রাজা ২৯ অক্টোবর (১৯২২) বাধ্য হন মুসোলিনির কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। ১৯২৪ সালের এপ্রিলে ইতালিতে একটি নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনটি ছিল বিতর্কিত। বিতর্কিত ওই নির্বাচনে মুসোলিনি বিজয়ী হন ও প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯২৫ সালে মুসোলিনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পরিত্যাগ করেন এবং দেশে একনায়কতন্ত্র চালু করেন। ১৯২৮ সালে এক আইন বলে ফ্যাসিস্ট পার্টিকে একটি মাত্র আইনগত রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ইতালি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইতালিতে একদলীয় রাষ্ট্র কাঠামো বজায় ছিল।

একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর ফ্যাসিস্ট সরকার ইতালির সমাজব্যবস্থায় সর্বত্র ফ্যাসিবাদী দর্শন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। সরকারি চাকরি পেতে ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করা হয়। মুসোলিনিকে কেন্দ্র করে একটি Personality Cult তৈরি করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে ফ্যাসিস্ট পার্টির দর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়, সরকারিভাবে মুসোলিনির ছবি বাধ্যতামূলকভাবে টানানো হয়। মুসোলিনিকে *Duce* বা নেতা হিসেবে

উপস্থাপন করা হয়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ছিল– ইতালির সংসদের পরিবর্তে পার্টি সদস্যদের নিয়ে Chamber of Fasci and Corporations গঠন করা হয়, যা সংসদের পরিবর্তে কাজ করতে শুরু করে। একই সাথে মুসোলিনি আফ্রিকাতে তার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে ইতালীয় অধিবাসীদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।



চিত্র : মুসোলিনি

১৯৩৩ সালে ঘোষণা করা হয় পার্টির (ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি) সদস্যপদ ছাড়া কোনো সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না। আর ১৯৩৮ সালে ঘোষণা করা হয় পার্টির সদস্যপদ না থাকলে, কেউই চাকরি করতে পারবে না। ১৯৪০ সালে মুসোলিনি হিটলারের সামর্থনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে মুসোলিনির পরাজয় তার পতন ডেকে আনে। মিত্রশক্তি ১৯৪৩ সালে সিসিলিতে প্রবেশ করে। ওই সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিনো গ্রানডির অনুরোধে Grand Council of Fascism মুসোলিনিকে উৎখাত করার উদ্যোগ নেয়। তারা রাজাকে অনুরোধ করেন তার ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মুসোলিনিকে অপসারণ করার। রাজা মুসোলিনিকে অপসারিত করেন। অপসারণের পর তাকে গ্রেফতারও করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটে। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল ফায়ারিং স্কোয়াডে মুসোলিনির মৃত্যু কার্যকর করা হয়। ইতিহাসে মুসোলিনি একজন

বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার লিপ্সা, বিশ্ব জয় করার মানসিকতা, উগ্র জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং একদলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন তাকে শুধু বিতর্কিতই করেনি, বরং একজন ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তার ফ্যাসিবাদী দর্শন কোনোদিনই ইতালির জনগণ গ্রহণ করে নেয়নি। এখনো তিনি একজন ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত।

নাজিবাদ

নাজিবাদের সাথে জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি জড়িত। দর্শনের দিক থেকে নাজিবাদের সাথে মুসোলিনির ফ্যাসিবাদের মিল আছে। এক কথায় নাজিবাদ হচ্ছে উগ্র জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism) বা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও একনায়কতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা রাজনীতি, যা হিটলার জার্মানিতে প্রবর্তন করেছিলেন। যদিও ইতিহাস বলে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডেরিক উইলিয়াম-১ (১৬৮৮-১৭৪০), ফ্রেডেরিক দি গ্রেট (১৭১২-১৭৬৮), অটোভন বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) এর শাসন আমলে নাজিবাদের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। হিটলার নাজিবাদের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তার সমাজতন্ত্র ও ইহুদি বিরোধিতা এর সাথে যোগ হয়েছিল। তিনি বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন জার্মানরাই হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি এবং জার্মানি বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। বিশ্বকে জয় করার তার এই অভিপ্রায়ই ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। যদিও অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তিতে যেসব শর্ত পালনে জার্মানিকে বাধ্য করা হয়েছিল, তার কারণেই এক ধরনের ক্ষোভ থেকে জার্মানিতে নাজিবাদের জন্ম হয়েছিল।

নাজিবাদ ফ্যাসিবাদেরই অপর একটি রূপ। নাজিবাদের সাথে জড়িয়ে আছে এডলফ হিটলার আর নাজি পার্টি তথা National Socialist German Workers' Party (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartie) এর নাম। ১৯২০ সালে এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৩ সালে পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। এর মধ্য দিয়ে *Third Reich*-এর যাত্রা শুরু হয়।* নাজি পার্টির স্লোগান ছিল *'Ein Volk, ein Reich*, ein Fuehrer - অর্থাৎ এক জাতি, এক সাম্রাজ্য, এক নেতা। ব্যক্তি হিটলারকে কেন্দ্র করে বিশাল এক জার্মান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিল নাজি পার্টি। হিটলারের উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, তার সমাজতন্ত্র ও ইহুদিবাদ বিরোধী ভূমিকা জার্মানিতে যুদ্ধসহ

* প্রথম সাম্রাজ্যকে প্রথম জার্মান সাম্রাজ্য, ১৮৭১-১৯১৮ সময় সীমাকে দ্বিতীয় জার্মান সাম্রাজ্য ও হিটলার শাসনকাল (১৯৩৩-১৯৪৫), তৃতীয় জার্মান সাম্রাজ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়।

একনায়কতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। ওই সময় জার্মানিতে বহুমত নিষিদ্ধ ছিল। এক মত, এক পথ, এক নীতিতে দেশ পরিচালিত হয়েছিল। হিটলারের উগ্রবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান সেনারা পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধ পুরো বিশ্বকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয় ও পক্ষগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল Axis Power। এখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান। অপরপক্ষে ছিল Allies বা মিত্রশক্তি। এতে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ও যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় হয় ও হিটলার আত্মহত্যা করেন (এপ্রিল ৩০, ১৯৪৫)। যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা প্রত্যক্ষ করি, যখন মৃত্যুর হিসাব আমরা পাই। এতে দেখা যায় : ১. যুদ্ধে বিশ্বের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৩ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৭ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল, যার মাঝে ৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন ছিল সেনা সদস্য। ২. জার্মানির পক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন। ৩. নাজি জার্মানি পরিকল্পিতভাবে ১১ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছিল, যার মাঝে ৬ মিলিয়ন ছিল ইহুদি। ৪. মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন, যার মাঝে সেনা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২০ মিলিয়ন (History of Western Civilization II)।



চিত্র : হিটলার

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে হিটলার কিন্তু জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে জার্মান পার্লামেন্টের নির্বাচন হয়েছিল। ওই নির্বাচনের একটা প্রেক্ষাপট আছে। ১৯২৯ সালের জার্মানি *Great Depresion* বা মহামন্দার সম্মুখীন হয়, বেকার সমস্যা শতকরা ৮.৫ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ ভাগে, আর শিল্পে উৎপাদনের হার কমে যায় শতকরা ৪২ ভাগ। ওই সময় ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দ্বন্দ্বে (সোস্যাল ডেমোক্রেট্যাট, সেন্টার পার্টি, লিবারেল পার্টি) কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। ওই সময় কোনো সরকারই স্থায়িত্ব পায়নি। ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ফলে ১৯৩২ সালের নির্বাচন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। জার্মান রাজনীতির জন্য ওই নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা ওই নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই হিটলার ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় হিটলারের নাজি পার্টি ৬০৮ সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টে আসন পেয়েছিল ২৩০টি আর ৩৭.২৮ ভাগ ভোট। প্রধান বিরোধী দল সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি পেয়েছিল ১৩৩ আসন (২১.৫৮ ভাগ ভোট)। আর জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছিল ৮৯ আসন (১৪.৩২ ভাগ ভোট)। জার্মান সেন্টার পার্টি পেয়েছিল ৭৫ আসন (১২.৪৪ ভাগ ভোট)।

নাজিবাদ একই সাথে মার্কসবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধী ছিল। Joseph W. Bendersky লিখিত *A History of Nazi Germany* (1919-1945), (2000) এ নাজিবাদের সমাজতন্ত্র বিরোধিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে 'Communism was dangerous to the well being of nations because of its intention to dessolve private property, it support class conflict, its aggression against middle class, its hostility toward small business and atheism'। অর্থাৎ নাজিবাদের প্রবক্তারা মনে করতেন সমাজতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কথা বলে না, ব্যক্তিগত খাতের অবলুপ্তিতে বিশ্বাস করে, শ্রেণিদ্বন্দ্বে বিশ্বাস করে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো স্থান নেই ও ধর্মেও বিশ্বাস করে না। এ কারণে নাজিবাদ কমিউনিজম (মার্কসের ভাষায় সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্ব) বা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে না। নাজিবাদ মুক্তবাজার অর্থনীতির (Free market Capitalism) বিরোধী ছিল। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'Free Market Capitalism damages nations due to international finance and the woldwide economic dominance of disloyal big business, which they considened to be the product of Jewish influence'। ইহুদিরা বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রবক্তা। আর এ কারণেই নাজিরা পুঁজিবাদ বিরোধী ছিল। নাজিরা ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী ছিল। কেননা ক্যাথলিকরা জার্মান সেন্টার পার্টির সমর্থক ছিল। নাজিরা বাধ্যতামূলক Sterilization শুরু করলে, ক্যাথলিকরা এর বিরোধী

ছিল। নাজিরা যে ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী ছিল, এটাও একটা কারণ। নাজিরা দাবি করতেন ক্যাথলিকদের জার্মান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু ক্যাথলিকরা *ভ্যাটিকানের* প্রতি দায়বদ্ধ ও অনুগত ছিল। ফলে নাজি নেতৃত্ব ক্যাথলিকদের আস্থায় নিতে পারছিল না।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ফ্রাংকোর উত্থান

স্পেনে ফ্যাসিস্ট শাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাংকোর উত্থানের পেছনে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে ইতিহাসবিদরা দায়ী ক রন। ফ্রাংকো ১৯৩৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭৫ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ইউরোপে অন্য দুই একনায়ক মুসোলিনি ও হিটলারের সাথে ফ্রাংকোর পার্থক্য এখানেই যে ফ্রাংকো কোনো গণঅভ্যুত্থানে কিংবা মিত্রবাহিনী দ্বারা উৎখাত হননি, বরং বার্ধক্যের কারণে ৮২ বছর বয়সে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থাতেই মারা যান। তার মৃত্যুর দুদিন পর জুয়ান কার্লোসকে স্পেনের রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ফ্রাংকোর উত্থানের আগে স্পেনের যে ইতিহাস, তাতে দেখা যায়, সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ১৯০২ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ৩৩টি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৯৩০ সালের দিকে সেখানে একটি বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় ও ১৯৩১ সালের মে ও জুনের নির্বাচনে বামপন্থি দলগুলো বিজয়ী হয়। রাজা আলফানসো সিংহাসন ত্যাগ করেন। নতুন একটি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় এবং আলকালা ঝামোরা (Alcala Zamora) প্রেসিডেন্ট ও আজানা (Azana) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর বামপন্থি রাজনীতি স্পেনে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ডানপন্থিরা ফ্যালানজিস্ট (Falangists) নামে একটি ফ্যাসিস্ট দলের ব্যানারে সংগঠিত হয়। এখন লেরোর (Leroux) নেতৃত্বে একটি দুর্বল ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে বামপন্থিদের উত্থান ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। তারা পপুলার ফ্রন্ট (Frente Popular) এর ব্যানারে বামপন্থি দলগুলোকে নিয়ে একটি সরকার গঠন করে। তারা সেনাবাহিনীর প্রভাব হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনা বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত হয়। ওই সময় স্পেনের রাজনীতি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল– একদিকে ছিল জাতীয়তাবাদীরা, অন্যদিকে ছিল প্রজাতন্ত্রের সমর্থকরা।

১৯৩৬ সালের ১৭ জুলাই মরক্কোয় নিযুক্ত স্পেনের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে। জেনারেল সানজুরজো (Sanjurjo) ছিলেন এর উদ্যোক্তা। কিন্তু সানজুরজো বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হলে আলোচনার শীর্ষে চলে আসেন ফ্রাংকো। সমগ্র স্পেনে সেনাবাহিনী এক সাথে বিদ্রোহ করে। তাদের সমর্থন করে জাতীয়তাবাদী (Nationalist) ফলাজিস্টরা। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রের

সমর্থকরা (Republicans) আলাদাভাবে সংগঠিত হন। ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধের সময় ইউরোপের ওই সময়কার শক্তিগুলোর ভূমিকাও লক্ষ করার মতো। স্পেনে গরিব কৃষক ও ধনী ভূস্বামী, যাজক শ্রেণি ও অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণি থাকায়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করেছিল স্পেনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। তাই তারা প্রজাতন্ত্রের সমর্থকদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং তাদের সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা দেয়। অন্যদিকে ইতালি ও জার্মানি বিদ্রোহীদের সমর্থন করে। গৃহযুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এক রকম নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্পেনে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ থেকে বিরত থাকে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে (১৯৩৫) ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, জার্মানি, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পর্তুগাল একটি হস্তক্ষেপ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। নভেম্বর (১৯৩৬) সালে বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে মাদ্রিদে সরকারের পতন যখন আসন্ন, তখন ইতালি ও জার্মানি ফ্রাংকো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি ইতালি ও জার্মান সেনারা বিদ্রোহীদের পক্ষে, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা স্পেনের সরকারের পক্ষে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু যুদ্ধে সরকারি পক্ষ পরাজিত হয় এবং ১৯৩৯ সালের ১৩ এপ্রিল বিদ্রোহীরা রাজধানী মাদ্রিদ দখল করে নেয়। আর এভাবেই স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান হয় এবং স্পেনে ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্রী শাসনের সূচনা হয়। স্পেনের রাজনীতিতে তার পরিচিত ছিল *Caudillo* হিসেবে, অর্থাৎ স্বৈরশাসন বা শক্তশাসক হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা হতো।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের শুরুতে ১ অক্টোবর, ১৯৩৬ সালে ফ্রাংকো নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। আর ১৯৩৭ সালের Unification Decree বলে তার সাথে যেসব দল বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, ফ্রাংকো তাদেরকে একটি ফ্রন্ট FET y de las JONS এর ব্যানারে একত্রিত করেন। আর ক্ষমতা দখল করে শুধুমাত্র একটি দলের নেতৃত্বে দেশ শাসন করেন। Falange দলকে একমাত্র দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ওই সময় ফ্রাংকো অত্যন্ত কঠোর ও একনায়কতান্ত্রিকভাবে দেশ চালান। ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি জি. পাইনের (Stanley G. Payne) মতে হিটলার ও স্ট্যালিনের চাইতেও বেশি ক্ষমতাধর ছিলেন ফ্রাংকো। তিনি কখনো কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ক্যাবিনেটে আলাপ করতেন না। এমনকি তিনি একটি রাবার স্টাম্প পার্লামেন্টও গঠন করেছিলেন। ১০০ সদস্য বিশিষ্ট *National Council of the Movement* পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করতো। পরে Organic Law of 1942 বলে তথাকথিত পার্লামেন্ট *Cortes Espanolas* গঠিত হয়েছিল

১৯৪২ সালের ১৮ জুলাই। *Cortes Espanolas*-এর সদস্যরা সরাসরি বা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। ১৯৪৭ সালের ৬ জুলাই তথাকথিত এক গণভোটে (Law of Sucession to the Headship of the State) ফ্রাংকোকে আজীবন রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্পেনে রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। গণভোটের মধ্য দিয়ে এমন একটি আইনও পাশ হয় যেখানে ফ্রাংকো নিজে তার উত্তরসূরি মনোনীত করতে পারবেন। উত্তরসূরি হবেন রাজা। এর মধ্য দিয়ে স্পেনে এক ধরনের রাজতন্ত্র চালু হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে আরেকটি গণভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তার কথাই ছিল আইন। এককভাবে তিনি দীর্ঘ ৩৯ বছর কঠোর হস্তে ক্ষমতা পরিচালনা করে গেছেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হিটলার ফ্রাংকোকে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানালে তাতে তিনি সময় দেননি। তবে স্বেচ্ছাসেবকদের জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল স্বেচ্ছাসেবকরা শুধুমাত্র বলশেভিকদের (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে। ফ্রাংকো এক ধরনের 'নিরপেক্ষ' নীতি অবলম্বন করেছিলেন। মিত্রশক্তি, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কও ভালো ছিল না। আর এ কারণেই মধ্য পঞ্চাশের আগ পর্যন্ত স্পেনকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেয়া হয়নি।

দীর্ঘ একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে ফ্রাংকোকে ঘিরে যে একটা মতবাদ তৈরি হয়েছিল, তাকে কেউ কেউ Francoism হিসেবে অভিহিত করেছেন। Francoism এর দর্শন হচ্ছে Authoritarianism বা কর্তৃত্ববাদ, Spanish Nationalism বা স্পেনীয় জাতীয়তাবাদ, Natonal Catholism বা ক্যাথলিকবাদ, Monarchism বা রাজতন্ত্র, Militarism বা সমরবাদ, National Conservatism, বা রক্ষণশীলতা, Anti-Masons, anti-Catalanism, ও কাটালানা বিরোধী, Pan Hispanism বা প্রো-হিসপানিক এবং anti-Liberalism বা উদারপন্থি বিরোধী। বলতে দ্বিধা নেই, হিটলারকে কেন্দ্র করে যেমনি নাজিবাদ বিকশিত হয়েছিল, মুসোলিনিকে কেন্দ্র করে যেমনি ফ্যাসিবাদের বিস্তার ঘটেছিল, ঠিক তেমনি ফ্রাংকোকে কেন্দ্র করেই *Francoism* এর বিস্তার ঘটেছিল। এই তিন একনায়কের মাঝে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও, অমিলও ছিল। এরা তিনজনই সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম বিরোধী ছিলেন। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট বিরোধী তথা সোভিয়েত বিরোধী যেসব দেশ ছিল, স্পেন ছিল তার অগ্রভাগে। যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের এই অবস্থানকে তার স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। যে কারণে স্পেনকে ন্যাটোতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্পেন ১৯৮২ সালে

ন্যাটোতে যোগ দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী একটা ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্রাংকো তার মৃত্যুর আগে জুয়ান কার্লোস-১ কে স্পেনের রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। রাজা কার্লোস ২০১৪ সালের জুনে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। রাজা কার্লোসের দায়িত্ব গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রাংকো বিতর্কিত ছিলেন নিঃসন্দেহে। তিনি সব ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেছিলেন। তার শাসনামলে স্পেনে কোনো গণতন্ত্র ছিল না। তবে মুসোলিনি কিংবা হিটলারের মতো ভাগ্য তাকে বরণ করতে হয়নি। পরিণত বয়সে তিনি মারা গিয়েছিলেন। আর তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্পেনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।

জাপানি ফ্যাসিবাদের স্বরূপ

ইউরোপের ফ্যাসিবাদের সাথে জাপানি ফ্যাসিবাদ নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন। জাপানি ফ্যাসিবাদ বা *Kokka Shugi* জাপানে দক্ষিণপন্থি উগ্র জাতীয়তাবাদী দর্শনকে বোঝায়। বলা হয়–জাপানে ১৮৬৮ সালে সম্রাট মেইজির (Emperor Meiji) ক্ষমতায় আরোহনের মধ্য দিয়ে জাপানে ফ্যাসিবাদের যুগের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তার চরম প্রকাশ ঘটে ১৯৩২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই সুয়োসির (Inukai Tsuyoshi) হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ওই ঘটনা সম্রাট হিরোহিতো ও দক্ষিণপন্থি সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষমতার শীর্ষে নিয়ে আসে।

জাপানি ফ্যাসিবাদকে কেউ কেউ Showa Nationalism হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। সম্রাট হিরোহিতের সময়ই জাপানি ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটে। ওই সময় উগ্র জাপানি জাতীয়তাবাদ, সামরিকতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিকাশের মাধ্যমেই জাপানে *Showa Nationalism* এর জন্ম হয়। অর্থাৎ জাপানি ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তিতে জাপানের দখলিকৃত এলাকা অস্বীকার করা হয়েছিল এবং ওয়াশিংটন নেভাল ট্রিটি ও লন্ডন নেভাল ট্রিটি অনুযায়ী জাপানের নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণ ও নৌবাহিনীতে জাহাজ সংযোজন নিষিদ্ধ ও ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল। জাপানে এটা একটা নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। জাপানে অনেকে মনে করতে থাকে এতে করে অন্যান্য বিদেশি শক্তির সাথে জাপানের সমমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই মনোভাবই জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্ম দেয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে জাপানে ব্যাপকভাবে বামপন্থিদের ধরপাকড় শুরু হয়। ওই সময় জাপানে বামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় *Popular Front Against Fascism*, যারা তাদের লেখনীতে দক্ষিণপন্থি উগ্রতার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেন। ওই সময় একজন উগ্র দক্ষিণপন্থি

লেখক ইকি কিটার (Ikki Kita) অনেক বক্তব্য ও লেখা বিতর্কের জন্ম দেয়। তিনি জাপানে একটি সামরিক একনায়কতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন। তিনি ছিলেন একজন উগ্র দক্ষিণপন্থি তাত্ত্বিক, যিনি *State Socialism* বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সাথে *Asian Nationalism*, অর্থাৎ এশীয় জাতীয়বাদকে একত্রিত করে জাপানে একটি সামরিক একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তিনি মেজি শাসনতন্ত্র বাতিল (১৮৮৯ সালে প্রণীত), সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, জাপানি ডায়েট বা পার্লামেন্ট বাতিল, শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার দাবি জানিয়েছিলেন। ভূমিসংস্কার করে বর্গাচাষিদের সুযোগে সুবিধা বাড়ানো এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সীমিত করারও পক্ষপাতী ছিলেন ইকি কিটা। তার এ ধরনের বক্তব্য এশিয়াকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত করার পক্ষে কাজ করেছিল। যদিও তার সব লেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তার লেখা ও দর্শন তরুণ সেনা অফিসারদের মাঝে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং জাপানের সম্প্রসারণবাদী নীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। তার দর্শনকে কেন্দ্র করেই ১৯২০ ও ১৯৩০ সালের দিকে জাপানে *Showa Restoration* আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাপানে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

সম্রাট হিরোহিতো ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, দীর্ঘ ৬৩ বছর। তার শাসন আমলের প্রথম ২০ বছর চিহ্নিত হয়ে আছে উগ্রপন্থি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ও জাপানের সম্প্রসারণবাদী নীতি হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের পরাজয়, মিত্রশক্তির জাপান দখলের পরও জাপান ধীরে ধীরে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাপানে ফ্যাসিবাদী রাজনীতি উত্থানের পেছনে আরো দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় সেনা অভিযান চালায়। পরের বছর জাপানের উগ্রপন্থি কিছু সেনা অফিসার প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই সুয়োসিকে হত্যা করে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে জাপানে উগ্রপন্থিদের প্রভাব বেড়ে যায়। উগ্রপন্থিরা সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে জাপানের বাইরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয় জাপান-চীন যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে জাপানিরা চীনের রাজধানী দখল করে সেখানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়, ইতিহাসে যা চিহ্নিত হয়ে আছে *Nanjing Massacre* অথবা *Rape of Nanjing* হিসেবে। ১৯৩৭ সালে ১৩ ডিসেম্বর থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড চলে। জাপানি সম্রাটের সেনাবাহিনী ওই সময় চীনের রাজধানী নানজিং (বর্তমান নাম নানকিং) এ ব্যাপক হত্যা ও নারীদের ধর্ষণ করে। এক পরিসংখ্যানে

জাপানি সেনাবাহিনীর হাতে ৪০ হাজার থেকে ৩ লাখ চীনা নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে International Military Tribunal for the Far East (টকিওতে স্থাপিত) এই সংখ্যা ২ লাখ বলে উল্লেখ করেছিল। আর ১৯৪৭ সালে Nanjing War Crimes Tribunal-এ চীনা সরকারের দেয়া তথ্য মতে ওই সংখ্যা ৩ লাখ। চূড়ান্ত যুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনী চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বাধীন চীনা জাতীয়তাবাদী সরকারকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। এর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া গঠনে জাপানি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তবে জাপানি আগ্রাসী নীতি ও তার ফ্যাসিবাদী চরিত্র জাপানকে ১৯৪০ সালে অপর দুই ফ্যাসিবাদী শক্তি ইতালি ও জার্মানির সাথে ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তিতে (Tripartite Pact) উপনীত হতে বাধ্য করে। যুক্তরাষ্ট্র জাপানের চীনা আগ্রাসনের সমালোচনা করে। ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, হল্যান্ড তাদের দেশে সব জাপানি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যখন জাপান ইন্দোচীনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। এর পরের ইতিহাস হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস।

ইতিহাস বলে জাপানে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সাথে জড়িয়ে আছে সে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস। জাপান হচ্ছে একটা Warrior Nation- অর্থাৎ যুদ্ধবাজ জাতি। জর্জ ডব্লিউ আলেকজান্ডার (George W. Alexander) তার লিখিত *Japan's Warrior Nation* এ জাপানি ঐতিহ্য ও দেশটির সাম্প্রসারণবাদী ভূমিকার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। পাঠকরা সামুরাই যোদ্ধাদের কাহিনি নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন। সামুরাই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে *'bushido'* ধারণাকে কেন্দ্র করে। *'bushido'* এর অর্থ হচ্ছে *the way of the warrior*, অর্থাৎ যোদ্ধাদের জীবন পথ। যোদ্ধারা কীভাবে নিজেদের গড়ে তুলবেন, সে পথ নির্দেশনাই আছে 'bushido' ধারণায়। এই *'bushido'* ধারণাই সামুরাই যোদ্ধাদের মাঝে বড় প্রভাব ফেলেছিল। এই মনোভাবই বিংশ শতাব্দীতে জাপানের ইতিহাসে বড় প্রভাব ফেলেছিল। জাপানের সমাজে সামুরাই যোদ্ধারা বিশেষ শ্রেণি হিসেবে মর্যাদা পেতো। এ ধরনের মানসিকতা জাপানি সমাজে ছিল বিধায় এই সমাজে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমেই শগুনতন্ত্র (Shoguns) নিয়ে কিছু বলা দরকার। শগুনরা ছিলেন জাপানের সুপ্রিম মিলিটারি কমান্ডার। *'শগুন'* হচ্ছে এক ধরনের উপাধি, যা সম্রাট কর্তৃক দেয়া হতো। শুধুমাত্র মিলিটারি শীর্ষ নেতারাই এই উপাধি পেতেন। ইতিহাস বলে ১৬০৩ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত জাপান সরাসরি শাসন করেছে *শগুনরা*। তাদের পরিচিতি ছিল *Tokugawa Shogunate* হিসেবে। মূলত ১১৯২ সাল থেকেই *শগুনরা* জাপানি সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। তিনটি শগুন গোষ্ঠীর কথা

সারণি : ১৪

জাপানি ফ্যাসিবাদ : গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

• ইতালি ও জার্মানিতে যেভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিকশিত হয়েছিল, একই প্রক্রিয়ায় জাপানেও ফ্যাসিবাদের বিস্তার ঘটেছিল।
• ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এই চুক্তিতে জাপানি সাম্রাজ্যের আওতাধীন অথবা নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহ স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। ফলে 'ক্ষোভ' থেকে জাপানি উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়
• ১৯২০ সালের পর থেকে জাপানে দক্ষিণপন্থি বুদ্ধিজীবীরা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ও বিদেশীদের প্রতি আহেতুক ভয় সৃষ্টিকারী ধারণা প্রমোট করে, যা পরবর্তীতে ১৯৩০ সালের দিকে ক্ষমতাসীনদের মাঝে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।
• ১৯৩১ সালের একটি ঘটনায় জাপানি সেনাবাহিনীর দক্ষিণপন্থি একটি অংশ দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার একটি রেল স্টেশনে বোমা বর্ষণ করে। এর জন্য চীনকে দায়ী করে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় সেনা অভিযান ও দেশটি দখল করে নেয়।
• মাঞ্চুরিয়া অভিযানের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে জাপানকে নিন্দা করা হয়। ফলশ্রুতিতে লিগ অব নেশনস থেকে জাপান নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে একদিকে জাপান বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও জাপানে দক্ষিণপন্থি উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটে।
• ১৯৩২ সালে দক্ষিণপন্থি কিছু সেনা ও নৌবাহিনীর অফিসাররা জাপানি প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই সুয়োসিকে (Inukai Tsuyoshi) হত্যা করে। এ ঘটনা জাপানে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে ব্যর্থ হলেও, জাপানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটে। এবং সম্রাট হিরোহিতোকে কেন্দ্র করে সামরিক নেতৃত্ব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

জানা যায়- কামাকুরা (Kamakura), আশিকাগা (Ashikaga) ও টকুগাওয়া (Tokugawa)। সর্বশেষ টকুগাওয়া গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে ১৬০৩ সালে এবং ক্ষমতা পরিচালনা করে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন টকু গাওয়া লেআসু (Tokugawa Leyasu)। এরা ইডোতে (Edo) প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজ টকিও হিসেবে পরিচিত। টকুগাওয়া গোষ্ঠীর পতনের মধ্য দিয়ে ৩ মে, ১৮৬৮ সালে মেইজি সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে (Meiji Restoration)

প্রকৃত অর্থে জাপানে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পেছনে দেশটির ইতিহাস-ঐতিহ্যই একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিবাদী মানসিকতা এখনো জাপানি সমাজে আছে। একটি উগ্র দক্ষিণপন্থি সংস্থা *Nippon Kaigi*'র কথা

জানা যায়, যাদের চিন্তা-চেতনা ও রাজনীতি নিয়ে অনেকেই উৎকণ্ঠিত। এরা মনে করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব এশিয়ায় জাপানি সেনা অভিযানে কোনো ভুল ছিল না। নানকিং এ যে গণহত্যা ও ধর্ষণের কথা বলা হয়, তা অতিরঞ্জিত বলে তারা মনে করে। অতি উগ্রবাদী মানসিকতাসম্পন্ন এই দলটি মনে করে জাপানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা উচিত। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। খারাপ খবর হচ্ছে, ২০১৩ সালে জাপানে প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তাতে অন্তত ১৫ জন মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, যাদের আনুগত্য ছিল Nippon Kaigi দলটির প্রতি।

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি

> After World War II a number of developing countries attained independence from their former colonial rulers. ... Finally, even in the developed countries, the Keynesian legacy attached great importance to investment. In this milieu, it was thought that a "shortage of capital" was the cause of underdevelopment.
>
> **Encyclopaedia Britannica.**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপকে কেন্দ্র করে বিশ্বরাজনীতি আবর্তিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতিতে কোন শক্তি প্রভাব ফেলবে, এটা বিবেচনায় নিয়েই ইউরোপ মূলত দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে পশ্চিম ইউরোপ, যেখানে পুঁজিবাদী আদর্শে গণতান্ত্রিক তথা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বিকশিত হয়। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপ যেখানে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচের সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চীন অন্যতম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হলেও, ইউরোপ তথা বিশ্বরাজনীতিতে চীনের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। এখানে মূল 'ফ্যাক্টর' হিসেবে কাজ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে তোলে ন্যাটো বা *নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন*। সেই সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে সহযোগিতা করার জন্য *মার্শাল পরিকল্পনা* নিয়ে এগিয়ে আসে। অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় সামরিক জোট *ওয়ারশ*। সেই সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল *'কমিকন'* (সিএমইএ) বা *কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকোনমিক এসিসটেন্স* (CMEA)। মস্কোতে ছিল এর সদর দপ্তর। পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন সেনার উপস্থিতি (যা এখনো

আছে) তেমন কোনো সংকট সৃষ্টি না করলেও, পূর্ব ইউরোপে সাবেক সোভিয়েত সেনার উপস্থিতি সেখানে একাধিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল।

জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বাধীন উগ্র নাজিবাদ বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। মিউনিখ চুক্তিকে অস্বীকার করে হিটলার অধুনালুপ্ত চেকোস্লাভিয়া দখল করেছিলেন এবং পরে রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন। মিউনিখ চুক্তি (Munich Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। নাজি জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং রাজতন্ত্র শাসিত ইতালি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিতে পশ্চিম চেকোস্লাভিয়ার জার্মান ভাষাভাষী (৩০ লাখ মানুষ) অঞ্চল Sudetenland জার্মানিকে দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল এতে করে হিটলারের যুদ্ধের হুমকি কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব হবে।

সারণি : ১৫
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী নানা চুক্তি

১. ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles), ১৯১৯
২. পোল্যান্ড-সোভিয়েত যুদ্ধ, ১৯১৯
৩. ট্রিয়ানন চুক্তি, ১৯২০ (Treaty of Trianon)
৪. রাপাল্লো চুক্তি, ১৯২০ (Treaty of Rapollo)
৫. ফ্রান্স-পোল্যান্ড ঐক্য, ১৯২১
৬. রোম অভিযান, ১৯২২ (March on Rome)
৭. কর্ফুর দুর্ঘটনা (Corfu Incidence)
৮. রুর অঞ্চল দখল, ১৯২৩-১৯২৫ (Occupation of Ruhr)
৯. মাইন ক্যাম্প, হিটলারের গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯২৫
১০. লিবিয়ায় শান্তিস্থাপন, ১৯২৩-১৯৩২ (Pacification of Libya)
১১. দাওয়েস পরিকল্পনা, ১৯২৪ (Daws Plan)
১২. লোকার্নো চুক্তি, ১৯২৫ (Locarno Treaty)
১৩. ইয়াং পরিকল্পনা, ১৯২৯ (Young Plan)
১৪. মহামন্দা, ১৯২৯-১৯৪১ (Great Depression)
১৫. জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ১৯৩১
১৬. মাঞ্চুকো সন্ধি, ১৯৩১-১৯৪২ (Pacification of Manchukuo, 1931-1942)
১৭. ২৮ জানুয়ারির ঘটনা, ১৯৩২
১৮. বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, ১৯৩২-১৯৩৪
১৯. চীনের 'গ্রেটওয়াল' রক্ষা, ১৯৩৩
২০. রেহের (মাঞ্চুরিয়া) যুদ্ধ, ১৯৩৩ (Battle of Rehe)
২১. জার্মানিতে নাজিদের ক্ষমতা গ্রহণ, ১৯৩৩
২২. টানগু (রিপাবলিক চীনের তিয়ানজিং প্রদেশের একটি শহর) সন্ধি ১৯৩৩ (রিপাবলিক চীনের সাথে জাপানের)

২৩. ইতালি-সোভিয়েত চুক্তি ১৯৩৩
২৪. জার্মান-পোল্যান্ড নন-আগ্রাসন চুক্তি, ১৯৩৪
২৫. ফ্রান্স-সোভিয়েত সহযোগিতামূলক চুক্তি, ১৯৩৫
২৬. সোভিয়েত-চেকোস্লাভিয়া সহযোগিতামূলক চুক্তি, ১৯৩৫
২৭. ব্রিটেন-জার্মান নৌ চুক্তি, ১৯৩৫
২৮. দ্বিতীয় ইতালি-ইথিওপিয়া যুদ্ধ, ১৯৩৫-১৯৩৬
২৯. রাইনল্যান্ডের (জার্মানি) পুনঃ সামরিকীকরণ, ১৯৩৬
৩০. স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৬-১৯৩৯
৩১. কমিনটান বিরোধী চুক্তি, ১৯৩৬
৩২. দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯৩৭-১৯৪৫
৩৩. জার্মান-চেকোস্লাভিয়া অঘোষিত যুদ্ধ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮
৩৪. মিউনিখ চুক্তি, ১৯৩৮
৩৫. জার্মান কর্তৃক চেকোস্লাভিয়া দখল, মার্চ, ১৯৩৯
৩৬. স্লোভাক-হাঙ্গেরি যুদ্ধ, মার্চ ১৯৩৯
৩৭. স্পেনের গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তে, মার্চ-এপ্রিল ১৯৩৯
৩৮. ব্রিটেন কর্তৃক পোল্যান্ডের নিরাপত্তাদান, মার্চ ১৯৩৯
৩৯. ইতালি কর্তৃক আলবেনিয়া দখল, এপ্রিল ১৯৩৯
৪০. সোভিয়েত-ব্রিটেন-ফ্রান্স আলোচনা এপ্রিল-আগস্ট ১৯৩৯
৪১. স্টিল (Steel) চুক্তি (জার্মানি-ইতালি চুক্তি), মে, ১৯৩৯
৪২. মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি, আগস্ট ১৯৩৯ (Molotov-Ribbentrop Pact)
৪৩. পোল্যান্ড অভিযান, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ (Invasion of Poland)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যু : ৫০-৫৫ মিলিয়ন সিভিলিয়ান, ২১-২৫ মিলিয়ন সেনা সদস্য। এর মধ্যে জার্মানির সেনা সদস্যের মৃত্যু ৫.৩ মিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের মোট মৃত্যু ৪,১৯,৪০০। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মৃত্যু ২ কোটি থেকে থেকে ২ কোটি ৭০ লাখ।

কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির সাথে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং যুদ্ধে এরা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর এই বন্ধুত্ব আর অটুট থাকেনি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার পোল্যান্ডে অভিযান চালিয়ে যে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘ ৬ বছর (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধুমাত্র ইউরোপই নয়, বরং পুরো বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে বিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগ পর্যন্ত যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, তা আমরা নিচে আলোচনা করবো।

সারণি : ১৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু কথা

অক্ষ শক্তি	:	জার্মানি, ইতালি ও জাপান
মিত্রশক্তি	:	ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন
উল্লেখযোগ্য ঘটনা	:	জার্মান কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই-এর পার্ল হারবারে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১) অবস্থিত নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে আত্মঘাতী বিমান হামলা। ওই বিমান হামলায় ২,৩৩৫ সেনা সদস্য মারা যায়। এর মাঝে এর মধ্যে নৌবাহিনীর সদস্য ছিল ২০০৮ জন, ১০৯ জন মেরিন, ২১৮ সেনা সদস্য। এছাড়া ৬৮ জন সিভিলিয়ান। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২,৪০৩ জন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা (আগস্ট ১৯৪৫) ও নাগাসাকিতে (৯ আগস্ট, ১৯৪৫) পারমাণবিক বোমা বর্ষণ।
যুদ্ধের খরচ	:	২০১৯ সালের জুলাইয়ের ডলার মূল্যের হিসাবে খরচ ৪ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। এ তথ্য মার্কিন কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের।

ইয়াল্টা সম্মেলন

ইয়াল্টা সম্মেলনকে (Yalta Conference) ক্রিমিয়া সম্মেলন (Crimea Conference) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি। এই সম্মেলনের গুরুত্ব এ কারণে ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার তথা রাষ্ট্রপ্রধানরা ওই সম্মেলন অংশ নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি তথা ইউরোপ নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ওই সময়ের বিশ্বরাজনীতির তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন ওই সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্মেলনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত (এক সময় ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার সাথে সংযুক্তি) ক্রিমিয়ার ইয়াল্টাতে ওই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিধায় সম্মেলনটি ইয়াল্টা সম্মেলন হিসেবেই বেশি পরিচিত। সম্মেলনে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তা হচ্ছে অনেকটা এরকম : ১. কোনো শর্ত ছাড়াই নাজি জার্মানির আত্মসমর্পণ। যুদ্ধের পর জার্মানি ও বার্লিনকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত

করা। এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর; ২. ফ্রান্সের জন্য আলাদা একটি অধিকৃত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্ট্যালিন রাজি হন। তার মতে এটা হতে হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের জন্য নির্ধারিত জোনের বাইরে, ৩. জার্মানিকে নাজিমুক্ত ও বেসামরিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে; ৪. জার্মানিকে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হবে। এর মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা যাবে; ৫. একটি প্রত্যাবাসন কাউন্সিল গঠন করা হবে, যা সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত হবে; ৬. পোল্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও সোভিয়েত সহযোগিতায় যে অন্তর্বর্তীকালীন রিপাবলিক অব পোল্যান্ডের সরকার গঠিত হয়েছিল, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কার্জন লাইন (Curzon Line) অনুযায়ী পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত নির্ধারিত হবে। পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে পোল্যান্ড জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে। পোল্যান্ডে একটি স্বাধীন নির্বাচনের ব্যাপারে স্ট্যালিন সম্মতি দেন। স্ট্যালিন রুজভেল্টকে প্রতিশ্রুতি দেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের কার্যক্রমে অংশ নেবে।



চিত্র : ইয়াল্টা সম্মেলন। চার্চিল (বামে), রুজভেল্ট (মাঝখানে) ও ষ্ট্যালিন (ডানে)

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৬টি রিপাবলিককে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়ার জন্য স্ট্যালিন অনুরোধ করেন। কিন্তু ট্রুম্যান শুধুমাত্র ইউক্রেন ও বেলারুশের ব্যাপারে রাজি হলেও, পরে তা কার্যকর করা হয়নি। ৭. জাপানের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করে নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর মাঝে ছিল দক্ষিণ শাখালিন (Southern Sakhalin) এবং কুরিল (Kuril) দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। সেই সাথে দালিয়ান (Dalian) বন্দরকে আন্তর্জাতিকীকরণ এবং পোর্ট আর্থার (Port Arthur) কে 'লিজ' দেওয়া।

জাপানে মার্কিন বি-২৯ বোমারু বিমান মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়, যা আমুর নদীর মুখে Komsomolsk-Nikolaevsk এলাকায় মোতায়েন করা হবে; ৮. নাজি নেতৃবৃন্দকে War Criminals হিসেবে চিহ্নিত করে এদের ফাঁসি নিশ্চিত করা; ৯. জার্মানির জন্য একটি কমিটি *'Committe on Dismemberment of Germany'* গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, যাদের কাজ ছিল জার্মানিকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া। প্রকৃতপক্ষে ৪টি অঞ্চলে জার্মানকে ভাগ করা হয়েছিল– ব্রিটিশ জোন, ফ্রান্স জোন, আমেরিকান জোন ও সোভিয়েত জোন (পূর্ব জার্মানি)।

আটলান্টিক চার্টার

আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter) স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পরিকল্পনা কি তা ওই চার্টারে লিপিবদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল নিউফাউন্ডল্যান্ডের Placentia Bay তে ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট মিলিত হয়েছিলেন। তাদের যৌথ বিবৃতিই হচ্ছে আটলান্টিক চার্টার। ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি Declaration by United Nations (যার ভিত্তিতে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল) আটলান্টিক চার্টারের অনুপ্রেরণাতেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অনেক গবেষকের মতে ন্যাটো গঠন, গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) এর জন্ম, সবকিছুর পেছনে ওই আটলান্টিক চার্টার কাজ করেছে।

আটলান্টিক চার্টারে ৮টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : ১. যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কোনো ভূমি দাবি করবে না, ২. রাষ্ট্রের সীমানা হবে ওই এলাকার জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর, ৩. স্বশাসনের অধিকার থাকবে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর, ৪. বাণিজ্য কমিয়ে আনা হবে; ৫. বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণের ব্যাপারে কাজ করে যেতে হবে; ৬. মুক্ত বিশ্ব ও ভয়হীন একটি বিশ্বের জন্য অংশগ্রহণকারী সবাই কাজ করবে; ৭. সমুদ্রে চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পক্ষে কাজ করবে অংশগ্রহণকারীরা; ৮. আগ্রাসী শক্তিকে নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে এবং যুদ্ধের পর সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

এখানে বলা ভালো, 'যৌথ বিবৃতি' নামেই এই ঘোষণাটি প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটেনের লেবার পার্টির মুখপাত্র ডেউলি হেরাল্ড প্রথমে Atlantic Charter শব্দটি ব্যবহার করেন এবং চার্চিল ১৯৪১ সালের ২৪ আগস্ট পার্লামেন্টে আটলান্টিক চার্টার শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই থেকে এটা আটলান্টিক চার্টার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তেহরান সম্মেলন

ইয়াল্টা সম্মেলনের আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেহরানে ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ওই সম্মেলনের কোড নাম ছিল Eureka। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ওই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন জোসেফ স্ট্যালিন, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও উইনস্টন চার্চিল। তেহরানে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাসে ওই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন এটা ছিল মিত্রশক্তির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এর ঠিক আগেই ২২-২৬ নভেম্বর (১৯৪৩) অনুষ্ঠিত হয়েছিল কায়রো সম্মেলন। যদিও তিন মিত্রশক্তির নিজেদের স্ব স্ব এজেন্ডা ছিল। তবে একটি বিষয়ে তিন মিত্রশক্তির মাঝে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তা হচ্ছে নাজি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খোলা। রুজভেল্ট অসুস্থ ছিলেন এবং তাকে হুইল চেয়ারে করে সম্মেলনে আনা হয়েছিল। স্ট্যালিন বিমানে করে ভ্রমণ করতে নিরাপদ বোধ করছিলেন না। একমাত্র চার্চিল ছিলেন ব্যতিক্রম। বলা ভালো ইরান জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ফলে সোভিয়েত–ব্রিটেনের যৌথ বাহিনী ইরানে সেনা অভিযান পরিচালনা করে ১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তেহরান সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার মাঝে রয়েছে : ১. সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় National Liberation Army and Partisan Detachments of Yugoslavia (যা যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল এবং যার নেতা ছিলেন যোসেফ ব্রোজ টিটো) কে সমর্থন ও সব ধরনের সমরাস্ত্র দিয়ে সহায়তা, ২. নেতৃবৃন্দ প্রত্যাশা করেন যে তুরস্ক মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবে এবং যদি তুরস্ক জার্মানির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যায় এবং এর ফলে বুলগেরিয়া যদি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনতিবিলম্বে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, ৩. ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়; ৪. যুদ্ধকালীন তিন মিত্রবাহিনীর সেনা কমান্ডাররা পরস্পর মতবিনিময় করবেন; ৫. ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে তিন মিত্রশক্তি একমত পোষণ করে। সেই সাথে ইরানকে আর্থিকভাবে সহযোগিতার ব্যাপারেও তারা একমত হন।

পটসডাম সম্মেলন

ইয়াল্টা সম্মেলনের আগে জার্মানির পটসডাম (Potsdam) শহরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা পটসডাম সম্মেলন নামে খ্যাত। ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত ওই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত

হয়েছিল। ওই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন মিত্রশক্তির শীর্ষ নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের জোসেফ স্ট্যালিন, উইনস্টন চার্চিল ও ক্লেমেন্ট এটলি (ব্রিটেন) এবং হ্যানরি ট্রুম্যান (যুক্তরাষ্ট্র)। ওই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যুদ্ধের পর কীভাবে জার্মানির শাসনকাজ পরিচালিত হবে। কেননা (৮ মে ১৯৪৫) জার্মানি সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করবে। পটসডাম সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল : ১. মিত্রশক্তি জার্মানির অধিকরণ করবে এবং জার্মানিকে নিরস্ত্রীকরণ, নাজিমুক্তকরণ, গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে; ২. জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে ৪টি অধিকৃত জোনে বিভক্ত করা হবে। একই সাথে এই দুটো দেশের রাজধানী বার্লিন ও ভিয়েনাকেও ৪টি জোনে বিভক্ত করা হবে; ৩. নাজি যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে; ৪. যুদ্ধের সময় যেসব অঞ্চলে জার্মানির দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Sudetenland, Alsace-Lorraine, Westernmost, Poland), তা আগের অবস্থানে ফিরে যাবে; ৫. জার্মানির সীমান্ত ছোট করা হবে। পূর্ব সীমান্ত নিয়ে যাওয়া হবে Oder Neisse line এ। East Prussia, Silesia, ও West Prussia তে পূর্ব সীমান্ত। এতে করে ১৯৩৭ সালের তুলনায় জার্মানির এলাকা শতকরা ২৫ ভাগ কমে যাবে; ৬. জার্মানি কর্তৃক 'যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের' (War Reparation) অংশ হিসেবে কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রান্সফারের ব্যাপারে ঐকমত্য পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পোৎপাদনের ১০ ভাগ। (ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ১৫ ভাগ হারে)। জার্মান শিল্পপ্রতিষ্ঠান সীমিত করা হয়। ৭. জার্মানির যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমরাস্ত্র উৎপাদনে জড়িত ছিল, তা ধ্বংস করে দেওয়া হয় (বিশেষ করে জাহাজ ও বিমান তৈরি শিল্পপ্রতিষ্ঠান)। ফ্রান্স পটসডাম সম্মেলনে অংশ নেয়নি। ফলে ফ্রান্স তার অধিকৃত এলাকায় পটসডাম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। বলা ভালো, পটসডাম সম্মেলনের একদিন ২৬ জুলাই এক বিবৃতিতে জাপানকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু জাপানের প্রধানমন্ত্রী কানতারো সুজুকি (Kantaro Suzuki) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর পর মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লাভিয়া, রুমানিয়া ও আলবেনিয়ায় এক এক করে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়া বাদে প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রভাবের বিরুদ্ধেই এখানে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল।

ন্যাটো সামরিক জোট (NATO)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাবকে কমানো, পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ ন্যাটো বা *North Atlantic Treaty Organization* গঠিত হয়েছিল। এর প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেছিল *ওয়ারশ* সামরিক জোট। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে উভয় জোট ইউরোপে এক ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এমন কথাও তখন বলা হয়েছিল যে 'ইউরোপে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে, যাতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি বটে, তবে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে ১৯৯১ সালে ওয়ারশ জোট ভেঙে দিলেও, ন্যাটো জোট কখনো ভেঙে দেওয়া হয়নি। বরং সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২০ সালে এসে নর্থ মেসিডোনিয়াকে আমরা ন্যাটোতে যোগ দিতে দেখলাম।

১৯৪৮ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে ন্যাটো আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র তিন বছরের মাথায় যুক্তরাষ্ট্র যখন পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে একটা সামরিক জোট গঠন করে, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এর পেছনে পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রধান কারণ ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও এক কমান্ডের আওতায় ন্যাটো বিকশিত হয়েছিল। ন্যাটোর চার্টারে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে আর্টিকেল ৫ ন্যাটোভুক্ত যেকোনো একটি দেশের উপর হামলা সকল ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর উপর হামলা বলে গণ্য হবে। বলা হয়েছিল–এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে 'the parties are determined to safeguard the freedom, common heritage and civilization of the people, founded on the principles of democracy individual liberty and the rule of law'। অর্থাৎ স্বাধীনতা নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সভ্যতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ন্যাটোর জন্মের সময় প্রথম যেসব দেশ (১২) সদস্য হয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে বেলজিয়াম– কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, হল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তীতে আরো ১৮টি দেশ পর্যায়ক্রমে যোগ দেয়। এগুলো হচ্ছে– গ্রিস (১৯৫২), তুরস্ক (১৯৫২) পশ্চিম জার্মানি (১৯৫৫), স্পেন (১৯৮২), চেক রিপাবলিক (১৯৯৯), হাঙ্গেরি (১৯৯৯), পোল্যান্ড (১৯৯৯), বুলগেরিয়া (২০০৪), এস্তোনিয়া (২০০৪), লাটভিয়া (২০০৪), লিথুয়ানিয়া (২০০৪), রুমানিয়া (২০০৪), স্লোভাকিয়া (২০০৪),

স্লোভেনিয়া (২০০৪) আলবেনিয়া (২০০৯), ক্রোয়েশিয়া (২০০৯), মন্টেনেগরো (২০১৭), নর্থ মেসিডোনিয়া (২০২০)।

ন্যাটোর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ফ্রান্স একবার ন্যাটোর যেকোনো সামরিক কার্যক্রম অংশ নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতন ঘটলে এক সময়ের সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ন্যাটোতে যোগ দেওয়া। ফলে ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ নিয়ে রাশিয়ার আপত্তি ছিল এবং এখনও আছে। আরেকটি অগ্রগতি হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপের বাইরে ন্যাটোর সেনাবাহিনী মোতায়েন। পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল এবং সেখানে ন্যাটো বাহিনী এখনো মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু ন্যাটোর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০০৩ সালে আফগানিস্তানে ন্যাটোর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। আফগানিস্তানে যে *International Security Assistance Force (ISAF)* গঠন করা হয়েছিল, তার ব্যানারেই ন্যাটোর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। *Operation Enduring Freedom* (OEF) এর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সেখানে আলাদাভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল। একই সাথে ISAF এর ব্যানারেও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সেখানে কাজ করছে। ২০০৬ সালে ন্যাটো বাহিনী প্রথম সেখানে কমব্যাট অপারেশনে অংশ নেয়। বলা ভালো, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (রেজ্যুলেশন ১৩৮৬, ডিসেম্বর ২০০১) আফগানিস্তানে ISAF মোতায়েন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ন্যাটোর পক্ষ থেকে Resolute Support Mission (RSM) গঠন করা হয়। RSM এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আফগান সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ২০২০ সালের মার্চ মাসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় সেখানে এখনও ১৭ হাজার ন্যাটোর সেনাসদস্য রয়েছে। তবে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ১৮ বছরের যুদ্ধের অবসানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে ন্যাটের সম্প্রসারণ নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ন্যাটোর ইতিহাসে এটা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিবলে রাশিয়াকেও ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ২৭ মে ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ ন্যাটোভুক্ত অন্যান্য দেশের সরকার প্রধানরা। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ন্যাটো তার পূর্ব সীমান্ত সম্প্রসারণের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে লক্ষ্যে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে

ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ন্যাটো জোটের এ সম্প্রসারণের জন্য মূলত তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক, ন্যাটোর সম্প্রসারণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোটকে শক্তিশালী করবে। এককভাবে প্রতিরক্ষার চেয়ে যৌথ প্রতিরক্ষা ভালো। ন্যাটোর সম্প্রসারণের অর্থ সমমনা রাষ্ট্রগুলোর গণ্ডির সম্প্রসারণ, যারা জাতিগত সংঘাত, আঞ্চলিক আগ্রাসন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের প্রসারসহ নতুন বিশ্বের হুমকি থেকে একে অপরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ন্যাটোর সামরিক ক্ষমতাকে খর্ব করবে কি না কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন। এর জবাব নেতিবাচক। ন্যাটোর প্রত্যেকটি নতুন সদস্য কেবল নিরাপত্তা ভোগ করবে না, এক্ষেত্রে অবদানও রাখবে। এর অর্থ হলো তাদের বাহিনীগুলো ন্যাটোর বাহিনীগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধ করতে এবং ন্যাটোর ভূখণ্ড রক্ষা করতে সক্ষম হবে। দুই, ন্যাটোর সম্প্রসারণ ইউরোপে গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সুফলগুলো রক্ষায় সহায়ক হবে। ন্যাটোর সদস্য পদ নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে একবিংশ শতাব্দীতে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারে নিরাপত্তা দেবে–যেমন অতীতে ন্যাটোর সদস্য পদ জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের মতো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশকে তাদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সুসংহত করার ব্যাপারে নিরাপত্তা যুগিয়েছিল। তিন, ন্যাটোর সম্প্রসারণ সম্ভাব্য দেশগুলোকে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনে উৎসাহিত করবে। অতীতে ন্যাটোর সদস্য পদ ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে এবং গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে উত্তেজনা নিরসনে সহায়তা করেছে। বর্তমানে ন্যাটোর খোলো দুয়ার নীতি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাদের বিগত দিনের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে, স্থিতিশীল সীমান্ত নিশ্চিত করতে, সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে তাদের অভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে কয়েকটি নজিরবিহীন চুক্তি সম্পাদনে জোরালো প্রেরণা যুগিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৪ সালের পোল্যান্ড-লিথুনিয়া চুক্তি, ১৯৯৬ সালের হাঙ্গেরি-স্লোভাকিয়া চুক্তি, পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি এবং ১৯৯৬ সালের হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার মধ্যকার চুক্তি। ন্যাটোর এ সম্প্রসারণে ব্যয় ধরা হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর এজন্য ২০ কোটি ডলার দেবে। এজন্য সময় লাগবে ১২ বছর। এসব দেশের সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়ন, এদেরকে ন্যাটো কমান্ডের আওতায় আনা এবং ন্যাটোর যৌথ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতিবছর ২১০ থেকে ২৭০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। এই ব্যয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ দেবে নয়া সদস্যভুক্ত দেশগুলো, ৫০ ভাগ দেবে জোটভুক্ত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো, আর যুক্তরাষ্ট্র দেবে শতকরা ১৫ ভাগ। ন্যাটো

সম্প্রসারণে রুশ বিরোধিতা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি যৌথ ন্যাটো রাশিয়া শান্তিরক্ষী ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন তাতে পাওয়া যায়নি। বরং রাশিয়ার এক ধরনের উৎকণ্ঠা রয়েছে। রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা যুগানভ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা ঝিরিনোভস্কি ন্যাটোর সম্প্রসারণ, রাশিয়ার সীমান্তে ন্যাটোর উপস্থিতি এবং ন্যাটোতে রাশিয়ার যোগদানের বিরোধিতা করে আসছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। এমনকি রাশিয়ার জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন নিজেও বারে বারে ন্যাটোর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছিলেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মার্কিন চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ইয়েলৎসিনকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি রাজি হন। অনেকের ভুলে যাবার কথা নয় বিল ক্লিনটন পার্টনারশিপ ফর পিস-এর আওতায় রাশিয়াকে ন্যাটোর সাথে সম্পর্কিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়েলৎসিন রাজি ছিলেন না ওই প্রস্তাবে। ধীরে ধীরে ক্লিনটন তার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে গেছেন। এক সময়ের ওয়ারশ জোটের সদস্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকেও তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন ন্যাটোতে যোগ দিতে।

পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ তিনটি স্তরে ঘটেছে। প্রথম স্তরে রয়েছে ন্যাটোর পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগুলো। নতুন সদস্যপদ পাওয়া রাষ্ট্রগুলোকেও এই স্তরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে এমন কিছু দেশ, যারা ন্যাটোর সদস্য হবে না। অথচ ন্যাটোর সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। শান্তির জন্য সহযোগিতা শীর্ষক একটি চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হয়েছে। আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার মতো সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো এই চুক্তির আওতায়। সর্বশেষ স্তরে রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন, যাদের সাথে ন্যাটোর আলাদা চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির বলে ন্যাটোর প্রতিনিধিরা এই দুটো দেশের রাজধানীতে থাকবেন। ন্যাটোর সদর দফতর ব্রাসেলস-এ এই দুটো দেশের প্রতিনিধিরা থাকবেন বটে, তবে ন্যাটোর সিদ্ধান্তে এরা ভেটো দিতে পারবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল প্লান আর ন্যাটো সামরিক জোট গঠন করে পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র বিরোধী একটা জোট গড়ে তুলেছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নই পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিয়ে ওয়ারশ সামরিক জোট গড়ে তোলে। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল কমিকন বা *Council for Mutual Economic Assistance* গঠন করে। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা বাড়ানো। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর এই দুটি জোট ইউরোপের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এমনকি এক পর্যায়ে ইউরোপকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি আশঙ্কার জন্ম হয়েছিল।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮৫ সালে গর্বাচেভ ক্ষমতায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইউরোপে ন্যাটো ও ওয়ারশ জোটের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল ও উভয় বৃহৎ শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এখানে তাদের পারমাণবিক শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। ন্যাটো তার যাত্রা শুরু করেছিল ১২টি দেশ নিয়ে। অন্যদিকে জন্মলগ্নে ওয়ারশ প্যাক্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮। এ দেশগুলো হচ্ছে– বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভিয়া, পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি ও আলবেনিয়া। ১৯৬৮ সালে আলবেনিয়া ওয়ারশ প্যাক্ট থেকে বেরিয়ে যায়। এই সংস্থায় মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। মধ্য আশির দশক পর্যন্ত দুই জোটের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়লেও গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। তিনি ক্ষমতায় এসে এক ইউরোপ অর্থাৎ *Common European Home*-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। গর্বাচেভ ইউরোপের বিভক্তি মেনে নেননি। তিনি এক ইউরোপ দেখতে চেয়েছিলেন। গর্বাচেভ ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৯১ সালের ৩১ মার্চ ওয়ারশ জোট ভেঙ্গে দেবার কথা বলেন। কিন্তু ন্যাটো জোটকে ভেঙ্গে দেয়া হয়নি। ন্যাটো অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোর সদস্যভুক্ত করতে। এটি যদি সম্ভব হয়, তাহলে রাশিয়ার সীমান্তে থাকবে ন্যাটো বাহিনী, যা রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। রাশিয়া এটা কখনোই চাইবে না। সুতরাং ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ যে আগামীতে রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে, তা বলাই বাহুল্য।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ইউরোপীয় ইকোনমিক কমিউনিটি (EEC) নাম ধারণ করে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নামধারণ করে। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ইইউ'র অন্তর্ভুক্ত ১২টি দেশ অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' চালু করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটলে পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশ ইতোমধ্যে ইইউতে যোগ দিয়েছে। মোট সদস্য সংখ্যা এখন ২৭। ২০১৯ সালে ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময় ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে বিশ্বরাজনীতিতে তার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) একটি অর্থনৈতিক জোট হলেও, কখনো কখনো একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছিল। বিশেষ করে একুশ শতকের গোড়ার দিকে ইইউ'র

অনেক সিদ্ধান্ত ছিল ন্যাটো তথা যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ২০২০ সালে সারা বিশ্বে করোনাভাইরাস মহামারি আকারে দেখা দিলে, ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপ থেকে আসা যাত্রীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, যা ইইউ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিল। ২০১১ সালে ওবামা প্রশাসন লিবিয়ায় *'No-fly-zone'* (লিবিয়ার উপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ) আরোপ করলে ইইউ তার সমালোচনা করেছিল, এর আগে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ ও ইরাকে সামরিক অভিযান চালালে, ফ্রান্স ও জার্মানি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ইইউ'র মধ্যে স্পষ্টতই একটি বিভক্তি রেখা সৃষ্টি করেছিল (International Business & Economics Research Journal, Vol. 2, Nov. 12, 2003)। আবার ২০১৯ সালে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হলে, ইইউ ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি (The Atlantic, May 16, 2019)। এর অর্থ হচ্ছে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের সব সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে, তা নয়।

মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান ডকট্রিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলে অবশ্যই মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান ডকট্রিনের কথা উল্লেখ করতে হবে। ১৯৪৭ সালে *ট্রুম্যান ডকট্রিনের* কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ট্রুম্যান ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (৩৩তম প্রেসিডেন্ট, ১৯৪৫-১৯৫৩)। *ট্রুম্যান ডকট্রিনের* উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের প্রসার ঠেকানো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর গ্রিস ও তুরস্কে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ছিল। ওই প্রভাব কমানোর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এলো। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলেছিলেন, যে সকল স্বাধীন জনগণ যারা সশস্ত্র সংখ্যালঘু বা বহিরাগত চাপের মারফত পদানত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে সচেষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হবে তাদের সমর্থন করা। অর্থাৎ এখানে কমিউনিজম ভীতি কাজ করছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই নীতি আর্থিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট ঘোষণা করেছিলেন যে ইউরোপের পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে। মার্শাল প্ল্যান এর পরিচিতি হচ্ছে *European Recovery Program*। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এতে স্বাক্ষর করেন ১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল। ওইদিন থেকেই তা কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রোগ্রামের আওতায় ওই সময় ১৫ বিলিয়ন (ডলার বর্তমান হিসেবে ৮০ বিলিয়ন ডলার) সহায়তা দিয়েছিল। এই আর্থিক সহায়তার কারণে পশ্চিম ইউরোপের জিডিপি ১৫ থেকে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীতে অনুন্নত দেশগুলোর জন্যও মার্শাল পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয়। Point Four Program এর আওতায়

মার্শাল পরিকল্পনা অনুন্নত দেশেও বাস্তবায়ন হয়েছিল। ১৯৪৯ সালেই এটি অনুন্নত দেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় কোনো সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়নি। তবে এটাও বলা দরকার মার্শাল পরিকল্পনার কারণে মার্কিন অর্থনীতিও উপকৃত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার আওতায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পণ্য ক্রয় করতো এবং মার্কিন জাহাজে করেই আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ে অবস্থিত ইউরোপে পৌঁছে দেওয়া হতো। মার্শাল পরিকল্পনা পশ্চিম ইউরোপের দেশ, বিশেষ করে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও তুরস্ক গ্রহণ করলেও পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ তা গ্রহণ করেনি। এখানে আরো একটা কথা বলা দরকার, যখন সব পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো মার্শাল প্লান পরিত্যাগ করে, তৎকালীন যুগোস্লাভিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৮ সালে টিটো ও স্ট্যালিনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগে যুগোস্লাভিয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসে ও স্বাধীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে। যুগোস্লাভিয়া তখন মার্কিন সাহায্যের জন্য আবেদন করে এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ সালে সীমিত আকারে যুগোস্লাভিয়াকে আর্থিক সহায়তা করে। পরবর্তীতে ১৯৫০-৫৩ সালে আরো ব্যাপক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তবে মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় তা দেওয়া হয়নি।

মার্শাল পরিকল্পনার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ছিল ঋণ এবং অনুদানও। যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল, তার মাঝে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ছিল ঋণ। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির সাথে একটি Debt Agreement স্বাক্ষর করে। ওই চুক্তির বিনিময়ে জার্মানি যে সাহায্য পেয়েছিল, তা পরিশোধ করতে হয়েছে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। আরো একটা কথা– মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার মাঝ থেকে শতকরা ৫ ভাগ অর্থ রেখে দেওয়া হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর জন্য। গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য ওই টাকা ব্যয় হয়েছিল।

ওয়ারশ জোট

ওয়ারশ জোটের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল প্ল্যান, আর ন্যাটো সামরিক জোট গঠন করে পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র বিরোধী একটি জোট গড়ে তুলেছিল, তখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নই পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে

১৯৫৫ সালে ওয়ারশ সামরিক জোট গঠন করে। পরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ান ও আর্থিক সহযোগিতার লক্ষ্যে 'কমিকন' বা Council for Mutual Economic Assistance-COMECON গঠন করে।

ওয়ারশ বা *Treaty of Friendship Cooperation and Mutual Assistance* (WTO) ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যার নেতৃত্বে ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৫৫ সালের ১৪ মে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিধায় এটা ওয়ারশ সম্মেলন নামেই পরিচিতি পেয়েছিল। ওই সম্মেলন ৮টি দেশ অংশ নিয়েছিল। দেশগুলো হচ্ছে– আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। আলবেনিয়া ১৯৬১ সালে ওয়ারশ জোটের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং ১৯৬৮ সালে ওয়ারশ থেকে বেরিয়ে যায়। মঙ্গোলিয়াকে ১৯৬৩ সালে অবজার্ভার স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছিল। ওয়ারশ জোটের নেতৃত্বে বরাবরই ছিলেন একজন সোভিয়েত জেনারেল। অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের নিজ নিজ সেনাবাহিনীকে ওই সোভিয়েত জেনারেলের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল ও তার নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হতো। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অসন্তোষ রোধে ওয়ারশ বাহিনীকে ব্যবহার হতে আমরা দেখেছি। হাঙ্গেরির বিপ্লবের সময় (১৯৫৬) এটা হয়েছে। হাঙ্গেরি তখন (১-৪ নভেম্বর ১৯৫৬) সামরিকভাবে ওয়ারশ প্যাক্ট থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে ও ইমরে নাগী (Imre Nagy) সরকারকে উৎখাত করে। একই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯৬৮ সালের আগস্টে, যখন সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রাগে নেমেছিল ও সরকার উৎখাত করেছিল। ওয়ারশ জোট টিকে ছিল মাত্র ৩৬ বছর। ১৯৮৯ সালে সারা পূর্ব ইউরোপ জুড়ে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং তাতে করে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটলে ওয়ারশ প্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হাঙ্গেরিতে ওয়ারশ প্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে ওয়ারশ জোট ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত হয় এবং সে মোতাবেক ১৯৯১ সালের ১ জুলাই প্রাগে তৎকালীন চেকোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট ভাসলাভ হাভেল ওয়ারশ জোটের বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করেন। যদিও পরবর্তীতে রাশিয়া ১৯৯২ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ৬টি রিপাবলিক যা ১৯৯২ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাদের নিয়ে আলাদা একটি সামরিক জোট- *Collective Security Treaty* (CSTQ) গঠন করে। CSTQ অনেকটা ওয়ারশ ধাঁচের।

কমিকন

প্রসঙ্গক্রমেই 'কমিকন' বা *Council for Mutual Economic Assistance-COMECON* নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। কমিকন ছিল স্ট্যালিনের 'ব্রেন চাইল্ড'। তিনি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা বাড়ানো, ব্যাবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাব তিনি কমাতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যেই ১৯৪৯ সালের ৫-৮ জানুয়ারি পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে *কমিকন* গঠিত হয়েছিল। মস্কো ছিল এর সদর দপ্তর। বলা হয় 'Comecon was the Eastern Blocks response to the formation in Western Europe of the Marshall Plan and the OEEC, which later became the OECD'। অর্থাৎ মার্শাল প্ল্যান ও OECD'র প্রতিপক্ষই ছিল *কমিকন*। ১৯৪৯ সালে কমিকন গঠন করা হয়েছিল বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানিকে (১৯৫০) নিয়ে। পরে কিউবা (১৯৭২), মঙ্গোলিয়া (১৯৬২), ভিয়েতনাম (১৯৭৮) কমিকনে যোগ দিয়েছিল। আলবেনিয়া ১৯৪৯ সালে যোগ দিলেও, ১৯৮৭ সালে সংস্থা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সহযোগী সদস্য দেশ ছিল যুগোস্লাভিয়া (১৯৬৪)। আর অবজার্ভার স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছিল চীনকে ১৯৫০ সালে। ১৯৬১ সালে চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের কারণে চীন আর কমিকনে অংশ নেয়নি। উত্তর কোরিয়া (১৯৫৬), ফিনল্যান্ড (১৯৭৩), ইরাক ও মেক্সিকো (১৯৭৫), এঙ্গোলা (১৯৭৬), নিকারাগুয়া (১৯৮৪), মোজাম্বিক (১৯৮৫), আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ইয়েমেনও (১৯৮৬) অবজার্ভার স্ট্যাটাস পেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগেই ১৯৯১ সালের ২৮ জুন কমিকনের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিকন ছিল সমাজতান্ত্রিক একটি বাণিজ্যিক জোট। কিন্তু জোটটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো বড় অবদান রাখতে পারেনি। একটি বিকল্প বাণিজ্যিক মডেলও উপস্থাপন করতে পারেনি। তবে বলা যেতে পারে একদিকে ওয়ারশ সামরিক জোট, অন্যদিকে কমিকন- এই দুই জোটকে ব্যবহার করে স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব আসরে তার অবস্থান শক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন (১৯৮৯) ও এর রেশ ধরে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ওয়ারশ ও কমিকনের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। ফলে অবলুপ্তি ঘটে এই দুই জোটের।

জার্মান একত্রীকরণ

বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে দুই জার্মানির একত্রীকরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই মিত্রশক্তি জার্মানিকে বিভক্ত করে রেখেছিল। ১৯৪৯ সালের ৭ অক্টোবর জন্ম পূর্ব জার্মানির। আর ১৯৬১ সালের ১৩ আগস্ট বার্লিন দেয়াল তৈরি করে কৃত্রিমভাবে জার্মানিকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধকালীন পুরোটা সময় পশ্চিম জার্মানি ছিল আলোচনার কেন্দ্র। পশ্চিম জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল (যা এখনো আছে)। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানিতে মোতায়েন করা হয়েছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী। কিন্তু গর্বাচেভের ক্ষমতা গ্রহণ পুরো দৃশ্যপটকে বদলে দেন। ১৯৮৯ সালের ৭ অক্টোম্বর গর্বাচেভ বার্লিন সফর করে সংস্কারের প্রস্তাব দেন এবং সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানান। এই সংস্কারের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই পূর্ব জার্মানিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (১৯৮৯)। তাতে বিজয়ী হর্ন হ্যান্স মদরো। তিনি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন দেয়ালের পতন হয়। জার্মান একত্রীকরণের পথ এতে করে ত্বরান্বিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৮ মার্চ সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং তাতে কনজারভেটিভরা বিজয়ী হয়। দুই জার্মানির একত্রীকরণের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯০ সালের ১৬ মে। এর মাত্র কয়েকমাস পর ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর পূর্ব জার্মানির অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং দুই জার্মানি একত্রিত হয়। আর ২ ডিসেম্বর (১৯৯০) যুক্ত জার্মানির প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দুই জার্মানির একত্রীকরণ ছিল বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময় বিশ্ব দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একভাগে ছিল মুক্ত ও গণতান্ত্রিক বিশ্ব, অন্যদিকে ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। এই বিভক্তিই জার্মানিকে বিভক্ত করে রেখেছিল। পশ্চিম জার্মানিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল। আর পূর্ব জার্মানিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে পূর্ব জার্মানিতেও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল।

দশম অধ্যায়

পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন

> Gorbachev, among his other reforms, wished to transform Soviet relations with other European Communist states. The WTO had already outlived its usefulness in many ways. A NATO invasion was no longer a credible threat. If NATO launched a missile attack, the buffer zone Stalin had built could do nothing. Rather than supporting the Soviet economy, it had long been a considerable burden, as Soviet subsidies were needed to maintain tolerable living standards. A relaxation of the Soviet grip in the east would also help improve Soviet relations with the west.
>
> **John Swift**

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের অথবা সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের পতন ছিল বিংশ শতাব্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৯ সালের *ভেলভেট বিপ্লব** সেখানে প্রতিটি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এখন সেখানে আর কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ব নেই।

উননব্বই-এর গণ অভ্যুত্থানের পর পূর্ব ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে। সেই সাথে সেখানে, প্রতিটি দেশেই সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতন ঘটেছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের পর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে কোথাও কোথাও (হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড) সাবেক কমিউনিস্টরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল। তবে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নীতিতে পরিবর্তন

* সাবেক চেকোস্লোভিয়ায় শান্তিপূর্ণ বিপ্লব।

এনেছে। কোথাও নাম পরিবর্তন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রভাব বলয় বিস্তারের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ইউরোপ দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার প্রভাবাধীন প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। অপরদিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৫ বছর পর ভেঙে গিয়েছিল এই শাসনব্যবস্থা। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পূর্ব জার্মানির ঘটনাবলি দিয়ে। ১৯৮৯ সালের ১৮ অক্টোবর প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান হোনেকার, গঠিত হয়েছিল *'নিউ ফোরাম'* নামে একটি সংগঠন। আর তার ঠিক প্রায় এক মাস পর পদত্যাগ করলেন চেকোস্লোভিয়ার পার্টি প্রধান ইয়াকেস। পূর্ব জার্মানির মতো প্রাগেও গঠিত হয়েছিল *'সিটিজেন ফোরাম'*। এরাও দাবি করেছিলেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের। এর আগে সূক্ষ্মভাবে হলেও আরো একটি পরিবর্তন ঘটে যায় পূর্ব ইউরোপের আরেক দেশ বুলগেরিয়ায়। ১৯৫৪ সাল থেকে যিনি ছিলেন পার্টিপ্রধান (এবং রাষ্ট্রপ্রধান), সেই সিভকভ হঠাৎ করে স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন।

পশ্চিমা বিশ্ব এ পরিবর্তনে উৎফুল্লিত হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। তবে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তৃতীয় বিশ্বে, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো প্রচণ্ডভাবে এক ধরনের সংকটে (তত্ত্বগত সংকট) ভুগছিল। 'কমিউনিজম' শব্দটা রাজনীতির অভিধান থেকে উঠে যাবে কি না, এটাই এখন সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ। কিন্তু বাস্তবে যা সত্য তা হচ্ছে পূর্ব ইউরোপে একের পর এক সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটছিল। দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারলেও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো জনগণের কাছে যেতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে চলছিল এক ধরনের ব্যক্তি শাসন। সিভকভ ক্ষমতায় ছিলেন ৩৫ বছর, চসেস্কু ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৬৭ সাল থেকে, হুসাক ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৬৮ সালের পর থেকে এবং হোনেকার তো দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন ১৯৮৯ সালে। সেই সাথে ছিল 'সন্ত্রাস,' যাকে বলা যায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার নিরাপত্তা পুলিশ)। সমাজতন্ত্রের নামে পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ পরিণত হয়েছিল এক একটি পুলিশি রাষ্ট্রে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ক্রিমিয়ায় অনুষ্ঠিত মিত্রশক্তির শীর্ষ সম্মেলনে (চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন) ইউরোপ ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠে সংসদীয় গণতন্ত্র। অন্যদিকে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে

বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পার্টি ক্ষমতা দখল করে। যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় জন্ম হলেও পরে টিটোর সাথে স্ট্যালিনের মতানৈক্য হয় ও যুগোস্লাভিয়া দীর্ঘদিন সোভিয়েত বিরোধী শিবিরে অবস্থান করে। এভাবেই পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সরকার। জন্ম হয় দুই সামরিক জোটের। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ারস প্যাক্ট পূর্ব ইউরোপে। আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো, পশ্চিম ইউরোপে। গত ৪৫ বছর ইউরোপ এভাবেই বিভক্ত ছিল। কমিউনিজম ভীতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকে স্নায়ুযুদ্ধকালিন আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছিল। বিশেষ করে সোভিয়েত ভীতি পশ্চিম জার্মানিকে ঠেলে দিয়েছিল অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র পারসিং-২ রকেট এ অঞ্চলে বসাতে। এ সিদ্ধান্ত ছিল ন্যাটোর। তাও ১৯৮৩ সালের। কিন্তু মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে এক বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে। ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল আইএনএফ চুক্তি, তাতে দুই বৃহৎ শক্তিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস করার কথা বলা হয়েছিল।



চিত্র : পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত বিরোধী আন্দোলনের নায়ক পোল্যান্ডের লেস ভালেসা।

এতে করে দুই বৃহৎ শক্তির মাঝে পারস্পরিক অবিশ্বাসের যে বাঁধ দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল, গর্বাচেভ সে বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। গর্বাচেভ ভ্রাতৃপ্রতিম পূর্ব ইউরোপের কথা না বলে বলেছিলেন এক ইউরোপের কথা। যেখানে স্পষ্টতই

ইউরোপের এই বিভক্তিকে তিনি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এরও আগে তিনি *'ব্রেজনেভ ডকট্রিন'* থেকে ফিরে আসেন, যে ডকট্রিনের মূল কথা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যদি সমাজতান্ত্রিক বিরোধী কোনো শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে সামরিক আগ্রাসন চালাতে পারবে (এই ডকট্রিনের প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সাল চেকোস্লোভাকিয়ায় ও সর্বশেষ ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তান সোভিয়েত সামরিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে)। গর্বাচেভ প্রতিটি ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রাগে ১৯৬৮ সালে ট্যাংক নামানোর ঘটনাকে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং আফগানিস্তানের ঘটনাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন *'এক রক্তাক্ত অধ্যায়'* হিসেবে।

গর্বাচেভ ও পূর্ব ইউরোপ

ইউরোপ সম্পর্কে গর্বাচেভের ধারণা ছিল একটা অভিন্ন বাসভূমির। গর্বাচেভ লিখেছেন ইউরোপ হচ্ছে একটা বাসভূমি। কিন্তু প্রতিটি পরিবারের রয়েছে নিজস্ব ফ্ল্যাট আর সেখানে ঢোকার দরজা ভিন্ন ভিন্ন *(গর্বাচেভ : পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা, বাংলা অনুবাদ, মনীষা, কলকাতা, পাতা ১৩২)*। তিনি লিখেছেন, *পৃথিবীতে যদি নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দরকার হয়ে থাকে তাহলে সেটা সবার আগে দরকার ইউরোপে* (ওই)। সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে দুই ইউরোপের মাঝে একটা ইনট্রিগ্রেশন। গর্বাচেভের মতে এটা সম্ভব। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব উভয় অংশেই অর্থনীতির দিক দিয়ে বর্তমান অবস্থা ও তার বাস্তব সম্ভাবনা এমন যে তাতে করে সকলের মঙ্গলের জন্য ইউরোপের দুই অংশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগসাধনের জন্য কোনো একটা ধরন খুঁজে পাওয়া যাবে। (ওই, পাতা ১০৪)। গর্বাচেভের মতে উভয়ের মাঝে (পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ) রেনেসাঁর ও এনলাইটমেন্টের এত মিল যে, তা একটা বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। গর্বাচেভ আরো বলেছিলেন, প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশেরই অধিকার রয়েছে নিজস্ব নিয়মে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করার এবং এক্ষেত্রে তিনি পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গড়া সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন। গর্বাচেভ যা চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক রেখেই (ওয়ারশ প্যাক্ট ও কমিকন) পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো স্ব-উদ্যোগে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করুক। সোভিয়েত ইউনিয়ন এক্ষেত্রে আর পূর্ব ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করবে না। এ কারণে পোল্যান্ডে নন-কমিউনিস্ট সরকার

* সাবেক সোভিয়েত পার্টি প্রধানের নাম অনুসারে।

প্রতিষ্ঠিত হলে গর্বাচেভ দেশটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি এবং আশা করেছিলেন পোল্যান্ড ওয়ারশ সামরিক জোটে থাকবে।

এখানে গর্বাচেভের পূর্ব ইউরোপীয় বৈদেশিক নীতির কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। একদিকে এক ইউরোপের কথা বলে পূর্ব ইউরোপকে তিনি পশ্চিম ইউরোপের সাথে এক করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে প্রথম দিকে আশা করেছিলেন পূর্ব ইউরোপ ওয়ারশ জোটে থাকবে। তার অর্থ এ অঞ্চলে সোভিয়েত কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা। তবে তার আমলেই ওয়ারশ জোট ভেঙে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পূর্ব ইউরোপের এই নির্ভরশীলতা মূলত একদিনে গড়ে ওঠেনি। এটা দীর্ঘ ৪০ বছরের গড়া। ওয়ারশ বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল পুরোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে। এর কমান্ডার ছিলেন একজন সোভিয়েত জেনারেল। পূর্ব ইউরোপের সেনাবাহিনী সরাসরি ওয়ারশ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারের আওতাধীনে আনা হয়েছিল। এক্ষেত্রে পূর্ব ইউরোপের সিভিল নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখতেন না। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের ২৮ নম্বর ধারায় এক অংশে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করা। আর এই নীতির আলোকেই ওয়ারশ বাহিনী দীর্ঘদিন পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছিল। গর্বাচেভ নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেছিলেন কিন্তু সোভিয়েত পার্লামেন্টে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়নি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নির্ভরতা হঠাৎ করে কাটিয়ে ওঠাও ছিল মুশকিল। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের জ্বালানির অন্যতম উৎস ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এক সময় আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়েও অনেক কম দামে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে তেল ও গ্যাস সরবরাহ করতো। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে এই তেলের মূল্য পরিশোধ করতে হতো।

গর্বাচেভ চেয়েছিলেন পূর্ব ইউরোপে আরো বেশি সংস্কার। কেননা তার নিজের জন্য এই সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যায় শুধুমাত্র পূর্ব জার্মানির রেশ ধরেই নয়, বরং এরও আগে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ পূর্ব ইউরোপে সংস্কারের কথা বলে আসছিলেন। মেদভেদেভ, যিনি সোভিয়েত পলিট ব্যুরোর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য (তাত্ত্বিক বিষয়ে) ছিলেন, ১৯৮৭ সালে চেকোস্লোভাকিয়া সফরে এসে বলেছিলেন পূর্ব ইউরোপে যেকোনো সংস্কার গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা রাজনীতিকে শক্তিশালী করবে (রুদে প্রাভো, প্রাগ, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭)। গর্বাচেভের জন্য পূর্ব ইউরোপে সংস্কার বড় প্রয়োজন ছিল।

সারণি : ১৭

পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্ক
(মিলিয়ন রুবল)

দেশ	১৯৭০	১৯৮০	১৯৮৫
বুলগেরিয়া	১·৮	৭·১	১২·৫
হাঙ্গেরি	১·৫	৫·৭	৯·৪
পূর্ব জার্মানি	৩·৩	৯·২	১৫·২
পোল্যান্ড	২·৪	৮·০	১২·০
রুমানিয়া	০·৯	২·৮	৪·২
চেকোস্লোভাকিয়া	২·২	৭·২	১৩·৪
মোট	১২·১	৪০·০	৬৭·১

সূত্র : লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

যারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাদের জন্য পূর্ব ইউরোপের এই পরিবর্তন ছিল বেশ আকর্ষণীয়। গতানুগতিক সমাজতান্ত্রিক কাঠামো থেকে তারা যে বেরিয়ে এসেছিলেন, এটা স্পষ্ট করে বলা যায়। পূর্ব ইউরোপের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছিল, তা যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে কতকগুলো জিনিস লক্ষ করার মতো। এগুলো হচ্ছে : অর্থনীতি থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কমানো ও ব্যক্তিগত খাত সৃষ্টি করা এবং কিছু কিছু শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ (পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড), স্বশাসিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান (হাঙ্গেরি), সরকারি ভরতুকি কমানো (পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড)। সেই সাথে ছিল পশ্চিমের সাথে 'জয়েন্ট ভেনচার'। 'জয়েন্ট ভেনচার'-এ ৭০০টি শিল্পকারখানা হাঙ্গেরিতে গড়ে উঠেছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনা সেখানে ছিল। এক, *সোশাল ডেমোক্র্যাসির কনসেপ্ট* গ্রহণ করা। দুই, পার্টির *'ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজম'*-এর নাম গ্রহণ। হাঙ্গেরি বহুদলীয় রাজনীতিতে ফিরে গিয়েছিল এবং পার্টির নেতৃত্ব মূলত *সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির কনসেপ্ট* গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষ করে নর্ডিকভুক্ত দেশগুলোতে (সুইডেন, ডেনমার্ক) *সোশাল ডেমোক্র্যাসি* রয়েছে। এক সময় গর্বাচেভ এ কনসেপ্টে আকর্ষিত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। অন্যদিকে *'ইউরো-কমিউনিজম'*-এর কথাও বলা যায়। এ কনসেপ্ট-এর মূল কথা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম। সেই সাথে বহুদলীয় গণতন্ত্র, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের পর পূর্ব জার্মানিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একের সাথে অপরের পার্থক্য ছিল।

* স্পেন, ফ্রান্স, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারার সমর্থক ছিল।

পূর্ব ইউরোপের বর্তমান অবস্থান

পূর্ব ইউরোপে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হলেও সে গণতন্ত্র জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি দেশেই বিরাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে। কিন্তু তাতে বেড়েছে বেকার সমস্যা। ক্রাইম, ভায়োল্যান্স, অবাধ সেক্স আজ পূর্ব ইউরোপের স্বাভাবিক ঘটনা। ব্যাপক সাহায্য আসলেও অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসছে না তেমন। মুদ্রার মান কমে গেছে। অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে অনেক গুণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিছুটা নিশ্চিত হলেও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ রয়ে গেছে। সাবেক কমিউনিস্টরা এখন সব জায়গায় ক্ষমতা পরিচালনা করতে না পারলেও তারা কোথাও কোথাও গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। তবে স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে নয়, বরং ভিন্ন নামে, ভিন্ন আদর্শ নিয়ে তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। জনসাধারণের মাঝে কিছুটা হলেও এদের একটা 'বেস' রয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব এখানে লক্ষণীয়। অর্থনৈতিকভাবেও এরা বড় ধরনের 'আগ্রাসনের' সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে উৎপাদিত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভিতরে এখন এদের নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যাদি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আগামী দিনে পূর্ব ইউরোপ যদি 'পশ্চিমের অর্থনৈতিক কলোনিতে' পরিণত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করলেও, সাবেক কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কোনো দেশে ক্ষমতা পেয়েছিল। হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্টরা নতুন নামে ক্ষমতায় ছিল। পোল্যান্ডের সাবেক কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয়, ডিসেম্বরে ('৯৫) সেখানে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে বিজয়ী হয়েছিলেন সাবেক যুব কমিউনিস্ট নেতা আলেকজান্ডার কাওয়াসনিয়েস্কি। কিন্তু পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে দক্ষিণপন্থি উত্থান ঘটেছে। বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে (১৩ নভেম্বর ২০১৯) ইউরোপে সংসদীয় নির্বাচনে যে দক্ষিণপন্থি কট্টর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, তার একটি চিত্র তুলে ধরেছে। হাঙ্গেরি (Fidesz পার্টি, শতকরা ৪৯ ভাগ ভোট), চেক রিপাবলিক ফ্রিডম এন্ড ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি (শতকরা ১৯ ভাগ ভোট), বুলগেরিয়া (ইউনাইটেড পেট্রিয়ট, ৯ ভাগ ভোট), স্লোভাকিয়া (আওয়ার স্লোভাকিয়া, ৮ ভাগ ভোট), পোল্যান্ড (কনফেড়ারেশন, ৬.৮ ভাগ ভোট)। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে (২০১৯) এ ফল পাওয়া গেছে।

সমাজতন্ত্রের নয়া পথ : যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়ার অভিজ্ঞতা

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিংশ শতাব্দীতে ১৯৪৯ সালে চীন দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পূর্ব

ইউরোপে সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ ঘটেছিল, তা ছিল পুরোটাই সোভিয়েত নির্ভর। অর্থাৎ আদর্শগতভাবে সোভিয়েত মডেলকে অনুসরণ করা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ওয়ারশ বাহিনীকে ব্যবহার করা এবং কমিকনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুসরণ করা-এই ছিল পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের মডেল। এক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল সাবেক যুগোস্লাভ ও আলবেনিয়ান মডেল।

এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যোসেফ ব্রোজ টিটোর নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত দলটি কমিউনিস্ট পার্টি অব যুগোস্লাভিয়া নামেই পরিচিত ছিল। এর পর দলটির পরিচিতি হয় *The League of Communists of Yugoslavia*। ১৯১৯ সালে দলটির জন্ম। দলটির বড় অবদান হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সফলতা। ১৯৪৫ সালে গৃহযুদ্ধে পার্টির নেতৃত্বে আগ্রাসী অক্ষ শক্তিকে তারা পরাজিত করে। সেই থেকে ১৯৯০ সালে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাবার আগ পর্যন্ত দলটি এককভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা নিয়ে টিটো ক্ষমতা দখল করলেও, ১৯৪৮ সালে টিটো-স্ট্যালিন দ্বন্দ্বের রেশ ধরে কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিনফর্ম থেকে যুগোস্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। আর ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। টিটো-স্ট্যালিন দ্বন্দ্বের পেছনে মূল কারণ ছিল স্ট্যালিন যুগোস্লাভিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্টরা স্ট্যালিনের এই নীতি মানতে রাজি ছিলেন না। ফলে দ্বন্দ্বটা শুরু হয়।

যুগোস্লাভিয়া আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে নতুন যে 'রাজনীতি' উপস্থাপন করে, তা অনেক পর্যবেক্ষক *টিটোবাদ* বা Titoism হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার দর্শনকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল *'Socialist, but Independent'* সমাজতন্ত্রী, কিন্তু নিরপেক্ষ। এর মাধ্যমে যা বোঝানো হয়েছে, তা হচ্ছে যুগোস্লাভিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কিন্তু নিরপেক্ষ। অর্থাৎ সোভিয়েত মুখাপেক্ষী নয়। যুগোস্লাভিয়া এ কারণেই ওয়ারশ জোট ও কমিকনে যোগ দেয়নি। টিটো ছিলেন 'ফাদার ফিগার', তিনি আন্তর্জাতিকভাবেও প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন।

টিটোবাদের মূল কথা হচ্ছে—প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ ও বিকশিত হবে ওই দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার আলোকে, অন্য কোনো দেশের আদর্শ বা তার নির্দেশ অনুসরণ করে নয়। রাশিয়ার বিপ্লবের পর (১৯১৭) স্ট্যালিন যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি ট্রটস্কির 'Permanent

Revolution' তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'Socialism in one Country' উপস্থাপন করেন, যা পরে ১৯২৪ সালে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। স্ট্যালিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—ইউরোপে সমাজতন্ত্রীরা যখন সর্বত্র ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হন, তখন রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের বিকাশকে ধরে রাখতে হলে *'এক দেশে সমাজতন্ত্র'* এই নীতি ছাড়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাই তিনি রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ হয়েছিলেন। তবে টিটোর দর্শনের সাথে এর পার্থক্য ছিল। টিটো উন্নয়নশীল দেশগুলো, যারা উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তাদের সাথে নিয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। টিটো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর নেতৃত্বের মাঝে সবাই জাতীয়তাবাদী, কিছুটা সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী। টিটো এদের সাথে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন এক *'দর্শন'* উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা ছিল এরকম—প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব নিয়মে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে নিয়োজিত থাকবে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্ট্যালিনের নীতির সমালোচক ছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে *'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ'* বলতেও দ্বিধা করেননি। চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের পর চীনা মিডিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। টিটো যুগোস্লাভিয়ার অর্থনীতিতে 'Self managment' এবং 'Profit sharing' প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, যা সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করেছিলেন। Self Management বা স্বশাসন এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। সনাতন মার্কসীয় দর্শনের এটা বিপরীত। মার্কসীয় দর্শনে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তা পরিচালিত হবে। টিটো এক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শন থেকে কিছুটা ফিরে এসেছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে গর্বাচেভ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে যে অর্থনৈতিক সংস্কার এনেছিলেন (পেরেস্ত্রোইকা) তাতে ওই *Self Management*-এর কথাও ছিল। অন্যদিকে *Profit Sharing* ব্যবস্থায় অর্থনীতিতে টিটো একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে লাভ করতে পারে, তাহলে ওই লাভের অংশ ওই প্রতিষ্ঠার কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। শ্রমিকরা তাদের নির্ধারিত বেতনের বাইরে এই লাভের অংশ পাবে। মার্কসীয় দর্শনে 'লাভ' এর কোনো বিষয় নেই। রাষ্ট্রের

প্রয়োজনে শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করবে, আর রাষ্ট্র তাদের সব দায়িত্ব নেবে। মার্কসবাদীরা মনে করেন 'লাভ' এর বিষয়টি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন করে। তবে বলা ভালো, চীনে প্রয়াত তেং জিয়াও পিং যে অর্থনৈতিক সংস্কার এনেছিলেন, সেখানে কৃষকদের বাধ্যতামূলক 'কমিউন' প্রথা থেকে বাইরে গিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটা অংশ প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি করার সুযোগ ছিল। এর মাধ্যমে কৃষকরা উপকৃত হয়েছিলেন এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছিল। টিটো অনেকটা এরকমই চিন্তা করেছিলেন ষাটের দশকে।

মূলত টিটোর অর্থনৈতিক দর্শন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনা ইত্যাদি কারণেই টিটোর সাথে স্ট্যালিনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। টিটো সোভিয়েত প্রভাবের বাইরে গিয়ে আলাদাভাবে যুগোস্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। টিটো ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৮০ সালের ৪ মে ৮৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরও যুগোস্লাভিয়া টিটো প্রণীত নীতি অনুসরণ করেছে। ১৯৯১ সালে দেশটি ভেঙে যায়।

আলবেনিয়া

এখানে আলবেনিয়ার তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আলবেনিয়া মূলত পূর্ব ইউরোপের মধ্যে মুসলমান প্রধান একটি দেশ। দেশটি এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৯১২ সালের ২৮ নভেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটি আনোয়ার হোজার নেতৃত্বে পিপলস রিপাবলিক অব আলবেনিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীনে ছিল দেশটি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর (১৯৫৩) দু' দেশের মাঝে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এক সময় ওয়ারশ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় আলবেনিয়া। ওই সময় আলবেনিয়া চীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কের অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে আলবেনিয়াকে চীনের দিকে তাকাতে হয়েছিল।

এভাবে হোজার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তেং জিয়াও পিং যখন চীনে অর্থনৈতিক সংস্কার আনলেন, তখন তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং চীনের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে

ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের সম্পর্কোন্নয়নকেও পছন্দ করেননি হোজা। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্র বিরোধী যে ঢেউ সর্বত্র স্পর্শ করেছিল, তাতে আলবেনিয়াও আক্রান্ত হয়েছিল এবং আনোয়ার হোজার সমাজতান্ত্রিক মডেলের পতন ঘটেছিল ১৯৯০ সালে।

আলবেনিয়া হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যে দেশটি ১৯৬৭ সালে নিজেকে *atheist* বা নাস্তিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। আলবেনিয়াতে যত মসজিদ এবং মসজিদের আওতাধীন যত সম্পত্তি ছিল, তা তিনি জাতীয়করণ করেছিলেন। মসজিদগুলোকে তিনি লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সেখানে কোনো ধর্ম পালন করা হতো না। স্ট্যালিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ব্যাপক শিল্পায়নের দিকে গিয়েছিলেন এবং কৃষি সেক্টরকে একটি কো-অপারেটিভের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন।

আনোয়ার হোজা এক চরম সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আলবেনিয়াকে পরিচালিত করেছিলেন। ধর্মহীন আলবেনিয়াতে চার্চও নিষিদ্ধ ছিল। চার্চগুলোকে তিনি তরুণদের জন্য কালচারাল সেন্টারে পরিণত করেছিলেন। ধর্মচর্চা করার শাস্তি ছিল ১০ বছরের জেল। ১৯৬৭ সালে এ ব্যাপারে আইন করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের সংবিধানে বলা হয়েছিল 'The State recognizes no religion and supports and cares out aesthetic propaganda in order to implant a scientific materialistc world outlook in people'।

হেজার এই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিছুটা হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কম্বোডিয়ায় পল পটের সময়কার (অক্টোবর ১৯৭৬-জানুয়ারি ১৯৭৯) সাথে। পল পট ও তার সঙ্গীরাও কম্বোডিয়াকে একটি কট্টর সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। হোজা পেরেছিলেন দীর্ঘ ৪০ বছর। মার্কসবাদে ধর্মকে স্বীকার করে না, এটা সত্য। কিন্তু মার্কসবাদের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে আনোয়ার হোজা যেভাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালিত করেছিলেন, তা মার্কসবাদের ইতিহাসে বিরল। এজন্যই তিনি বিতর্কিত হয়েছিলেন। তার নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক দর্শন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি আলবেনিয়াকে শুধু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বই নয়, বরং পুরো বিশ্ব থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেননি। মেহমেত শেহু ছিলেন তেমনি একজন, যাকে এক সময় তার উত্তরসূরি হিসেবে চিন্তা করা হতো। এক পর্যায় শেহু নিজে আত্মহত্যা করেন (১৮ ডিসেম্বর ১৯৮১)। শেহুর পরিবারের সদস্যদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দুর্বল শরীরের কারণে হোজা মারা যান ১৯৮৫ সালের

১১ এপ্রিল। রামিজ আলিয়া তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। পূর্ব ইউরোপের গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি *(পার্টি অব লেবার)* এককভাবে একমাত্র দল হিসেবে এখন আর ক্ষমতা পরিচালনা করবে না। তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দল গঠন ও অবাধ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। যদিও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আলিয়া ও তার দল বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ডেমোক্রেটিক পার্টির উত্থানের মধ্যে দিয়ে আলিয়া যুগের তথা কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হয়। ১৯৯৮ সালে সংবিধানে পরিবর্তন এনে গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা করে আলবেনিয়া। ২০১৭ সালে আলবেনিয়ায় সর্বশেষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে সমাজতন্ত্রী পার্টি বিজয়ী হয় (১৪০ আসনের পার্লামেন্টে ৭৪ আসনে)। দলটির নেতা এডি রামা এখন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। তবে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হোজার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে হোজার মতবাদের অবসান হয়েছে, এটা বলা যাবে না। কেননা হোজার মতবাদের অনুসারীরা (যাদের পরিচিতি Hoxaist হিসেবে) আন্তর্জাতিকভাবে *'International Conference and the Publication Unity and Struggle'* এর ব্যানারে একত্রিত হয়েছেন। তাদের সংগঠনের নাম *International Conference of Marxist Leninist Parties and Organization (ICMLPO)*। বেনিন, বুরকিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট, মরক্কো, তিউনেশিয়া, ভারত, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্কসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের মার্কসবাদী পার্টি ICMLPO এর সদস্য।

মার্কসবাদী চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন এসেছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন (১৯১৭) হবার ৫০ বছর পর। সম্ভবত টিটোই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি সনাতন মার্কসবাদী আদর্শে পরিবর্তন আনেন। তারপর চীনে তেং জিয়াও পিং, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচেভ, পরবর্তীতে ভিয়েতনাম ও কিউবাতেও পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু অনমনীয় ছিলেন হোজা। তিনি মার্কসবাদের নামে যে নীতি আলবেনিয়াতে প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে আলবেনিয়ার দারিদ্র দূর হয়নি। তার আমলে তার দেশ পশ্চিমা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তার অত্যন্ত কট্টর নীতি তাকে উচ্চাসনে নিয়ে যেতে পারেনি। তার দেশে সংস্কার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। ব্যক্তি এনভর হোজাকে কেন্দ্র করেই ও তার কট্টর রাজনৈতিক মনোভাবকে ধারণ করে আলবেনিয়ার সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু সমাজে তা স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে আলবেনিয়ায় হোজাবাদ বা হোজাতন্ত্রেরও পতন হয়েছে।

যুগোস্লাভিয়ার ভেঙে যাওয়া

বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার উত্থান ও পতন। নানা কারণে যুগোস্লাভিয়া আলোচিত ছিল। প্রথমত, যুগোস্লাভিয়ার একটি রিপাবলিক বসনিয়া হারজেগোভিনার রাজধানী সারায়েভোতে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী আর্কডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের (Archduke Franz Ferdinand) আততায়ীর হাতে মৃত্যু (জুন, ১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। বসনিয়া ছিল ওই সময় অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যোসেফ ব্রোজ টিটোর নেতৃত্বে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল। তৃতীয়ত, টিটো দুই পরাশক্তির (যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) বাইরে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে একত্রিত করে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। চতুর্থত, উগ্র স্বাধীন জাতীয়তাবাদীরা যেমনি আর্কডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল, ঠিক তেমনি সার্বীয় উগ্র জাতীয়তবাদীরাই সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় সার্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে সেখানে গৃহযুদ্ধের সূচনা করেছিল, যা পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে বড় ধরনের গণহত্যা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক আদালতে সার্ব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও হয়েছিল। পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুগোস্লাভিয়া এমন একটি রাষ্ট্র যা গৃহযুদ্ধের কারণে ভেঙে গিয়েছিল।

১৯১৮ সালে যে রাষ্ট্রটির জন্ম, তা ভেঙে গিয়েছিল ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে পরপর কয়েকটি রিপাবলিকের (ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ও বসনিয়া) স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। তবে ওই সময় বসনিয়া হারজেগোভিনার গৃহযুদ্ধ বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। ১৯৯২ সালের মার্চে বসনিয়ায় স্বাধীনতার পক্ষে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় পড়ে। এপ্রিলে (১৯৯২) দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে যুগোস্লাভিয়ার অপর দুটি রিপাবলিক, ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বসনিয়ার জাতিগত অবস্থান ছিল অনেকটা এরকম : মুসলমান শতকরা ৪৫ ভাগ, ক্রোট শতকরা ১৭ ভাগ, আর সার্ব শতকরা ৩১ ভাগ। ক্রোটরা ক্যাথলিক আর সার্বরা অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। বসনিয়ার এই স্বাধীনতা ঘোষণা সার্বরা গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তারা সাবেক যুগোস্লাভিয়ার সার্বিয়া রিপাবলিকের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের প্রথমদিকে সার্বরা একটা বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছিল ও সেখানে থেকে তারা মুসলমানদের উৎখাত করে। আর এভাবেই সেখানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে ৬টি রিপাবলিক ও

২টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিয়ে যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয়েছিল, ওই রিপাবলিকগুলো সবাই এখন স্বাধীন (স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, কসোভো, মেসিডোনিয়া ইত্যাদি)। ২০০৬ সালে মনটেনেগ্রো স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর মেসিডোনিয়া ১৯৯১ সালেই স্বাধীন হয়েছে। শুধুমাত্র ভজভোদিনা একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে সার্বিয়ার সাথে একত্রিত আছে। যুগোস্লাভিয়ার অস্তিত্ব এখন আর নেই।

উপসংহার

পূর্ব ইউরোপে যে পরিবর্তন এসেছিল এ পরিবর্তনের জন্য যদি গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা রাজনীতিকে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে বোধ হয় মিথ্যা বলা হবে না। গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা রাজনীতির জন্য প্রয়োজন ছিল পরিবর্তনের। ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছিল এখানে একের পর এক। পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা থেকে যে রাজনীতির এখানে জন্ম হয়েছিল এবং যে রাজনীতি গত ৪৫ বছর ধীরে ধীরে বেড়েছিল, কেন্দ্রের নির্লিপ্ততায় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্লিপ্ততায় সে রাজনীতি ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা সেখানে পূরণ হয়নি। 'নয়া গণতন্ত্র' সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে সেখানে জনগণের মাঝে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, সেই হতাশাকে পুঁজি করেই পুরানো কমিউনিস্টরা আজ ভিন্ন নামে ক্ষমতায় ফিরে আসছে। আলবেনিয়া এর সর্বশেষ উদাহরণ। রাজনীতিতে একটি দক্ষিণপন্থি প্রবণতারও জন্ম হয়েছে সেখানে।

একাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

> The global economic landscape has undergone profound changes since the end of the Cold War. After the global financial crisis, the world economy entered a "new normal," and there are mounting challenges that need to be managed. Unfortunately, the global governance system has not kept pace with the scale and complexity of these challenges.
>
> **He Fan & Ye Qianlin**
> **Centre for Strategic & International Studies**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই যখন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, ঠিক তখনই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে একটা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। একটি বিশ্বব্যাংক তথা একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সাহায্য সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তাও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তখন উপলব্ধি করেছিলেন। একই সাথে বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে পরিচালিত হবে, সে ব্যাপারেও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর প্রয়োজনীয়তা ছিল এ কারণে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বকে বড় ধরনের একটি সংকটে ফেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছিল ঝুঁকির মুখে। কোনো অর্থনৈতিক নীতি ছিল না। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে, তার কোনো সঠিক নীতি বা আদর্শ ছিল না। ফলে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যের *ব্রেটন উডস* নামক স্থানে ৪৪ দেশের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। এজন্যই আধুনিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ব্যবস্থার মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয় *ব্রেটন উডস* ব্যবস্থাকে। ব্রেটন উডস (Bretton Woods)

এ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়েছিলেন বিধায় একে ব্রেটন উডস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্রেটন উডস সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল গ্রেট ব্রিটেনের। ওই সময় স্বর্ণকে আদর্শ মান ধরে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হতো। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হতো স্বর্ণের মাধ্যমে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই ব্যবস্থার পতন ঘটে। ওই সময়টা ছিল সাম্রাজ্যবাদের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী একটি সংকট তৈরি করে। পরাশক্তিগুলোর দরকার ছিল যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের। কিন্তু তাদের কাছে প্রচুর অর্থ ছিল না। তাদের কাছে যে পরিমাণ সোনা মজুত ছিল, ওই স্বর্ণের পরিমাণ বিবেচনা করেই তারা অর্থ নোট ছাপতে পারতো। অর্থের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তারা সেই অর্থসংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হবার আগেই অর্থব্যবস্থার পতন ঘটে। যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে সারা বিশ্ব জুড়েই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বড় বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, যা অনেক দিন পর্যন্ত বহাল ছিল। তখন এই বিশৃঙ্খলা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, তা পর্যালোচনা করার জন্য ইতালির জেনোয়াতে (Genoa) ১৯২২ সালে ৩৪টি দেশ একটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। রাশিয়া চূড়ান্ত ইশতেহারটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে ওই সম্মেলনটি নয়া অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য ছিল একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ কেনেথ ও মরগান (Kenneth O Morgan) তাই মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'Genoa was a watershed in international diplomacy'। ওই সম্মেলনের পর আংশিকভাবে স্বর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রভাব ছিল বেশি। সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। একটি বিনিময় হার নির্ধারণ করার দরকার ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম পাওনাদার হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশটি পাওনা পরিশোধের জন্য ইউরোপের দেশগুলোকে চাপ দিতে থাকে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র মিত্র দেশগুলোকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিল। এক হিসেবে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা ছিল গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির কাছে। আবার ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়াও ব্রিটেনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল। ওই সব দেশের ঋণ পরিশোধ করার ব্যর্থতা, অর্থনীতির নীতিমালার প্রতি অজ্ঞতাই ১৯৩০ এর দশকে মহাবিপর্যয় ডেকে আনে, যা

The Great Depression নামে পরিচিত। ওই মহামন্দায় সব দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই ব্যবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল। ১৯৩০ সালের দিকেই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা পুনর্গঠন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ১৯১৪ সালের পূর্বে যে অর্থব্যবস্থা ছিল, তা ১৯৪৪ সাল নাগাদ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রেটন উডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নতুন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস এ ১৯৪৪ সালের জুলাই থেকে আলোচনা শুরু হয়। অংশ নেয় ৪৪টি দেশ। ওই আলোচনায় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে মার্কিন ডলারের সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রার নিরূপণে স্বর্ণকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। কিন্তু ১৯৭০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এটা বাতিল করে দেন। নিক্সন ঘোষণা দেন যে স্বর্ণকে মার্কিন ডলারের সাথে বিনিময়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। উল্লেখ্য ৪৪টি দেশের প্রায় ৭৩০ জন প্রতিনিধি ব্রেটন উডস সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা একটি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ব্যাপারে কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, সে ব্যাপারে মতবিনিময় করেন। সম্মেলন দুটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়-একটি International Monetany Fund (IMF) ও অপরটি World Bank বা বিশ্বব্যাংক। এই দুটো সংস্থা এখনও রয়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা তথা নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এই দুটো সংস্থার মাঝে উদ্দেশ্য ও কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। আইএমএফ মূলত কাজ করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ ও কারিগরি সহযোগিতা দেয়। আইএমএফ এর কাছ থেকেও গরিব দেশগুলো ঋণ নেয়, যাতে করে সেইসব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সচল থাকে এবং তারা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে পারে। বিশ্বব্যাংক প্রকল্প ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা দেয়। আইএমএফ দেউলিয়ার হাত থেকে বাঁচতে গরিব দেশগুলোকে ঋণ দেয়। তবে আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিয়ে কথা আছে। অভিযোগ আছে এই ঋণ রাজনৈতিক বিবেচনায় দেয়া হয়। অর্থাৎ বিশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতো, বিশ্বব্যাংক কিংবা আইএমএফ এর কাছ থেকে তারা কোনো ঋণ পেত না। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক ক্ষমতাচ্যুত হন ১৯৫৩ সালে, গুয়েতেমালায় আরবেনজ ১৯৫৪ সালে, ডমিনিকান রিপাবলিক বস ১৯৬৩

সালে, ব্রাজিলে গউলার্ট ১৯৬৪ সালে, ইন্দোনেশিয়ায় সুয়েকর্নো ১৯৬৫ সালে, ঘানায় নক্রুমা ১৯৬৬ সালে, মালিতে কাইটা ১৯৬৮ সালে, ১৯৭০ সালে কম্বোডিয়ায় সিহানুক, বলিভিয়ায় টোরিস ১৯৭১ সালে, আর আলেন্দে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল বলেই সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী একটি শক্তি সেখানে ক্ষমতা দখল করেছিল। অভ্যুত্থানের পর পরই পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে সেখানে ব্যাপক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। চিলিতে আলেন্দে ১৯৭০-১৯৭৩ সালে, আর্জেন্টিনায় ১৯৭২-৭৬ সালে পেরনিস্টরা ও ব্রাজিলে গাউলার্ট বিশ্বব্যাংক থেকে কোনো ঋণ পাননি। কেননা তাদের রাজনীতি ছিল পশ্চিমাবিরোধী ও কিছুটা সমাজতান্ত্রিক। অথচ এরা যখন উৎখাত হন, তখন থেকেই সেখানে বিশ্বব্যাংকের সাহায্য বেড়ে যায়। শুধুমাত্র ১৯৭৬ সালে এককভাবে আর্জেন্টিনা বিশ্বব্যাংক থেকে যত ঋণ পেয়েছে (৫শ মিলিয়ন ডলারের উপর) এর আগের ২০ বছরেও দেশটি বিশ্বব্যাংকের এত সাহায্য পায়নি। ইসরাইলে মাথাপিছু বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। এর মূল কারণ একটিই—রাজনৈতিক। বিশ্বব্যাংকের সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওইসব দেশের বৈদেশিক নীতিতেও পরিবর্তন এসেছিল এবং দেখা যায় তাতে পশ্চিমাদের স্বার্থ বেশি রক্ষিত হয়েছে। ইসরাইল ও ব্রাজিলের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য যে পরোক্ষভাবে হলেও ওইসব দেশের পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোকে উৎখাতের ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিয়ে আরো কিছু কথা আছে। বিশ্বব্যাংকের দুটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে– একটি International Bank for Reconstruction and Development, অপরটি International Development Associotion। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ১৮৯টি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ এর সদস্য। বিশ্বব্যাংক সাধারণত সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল বিশ্ব এই ঋণ পায়। উন্নত বিশ্ব ঋণ পায় না। যেসব ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে তা অনেকটা এরকম : ১. দারিদ্র দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারণসংক্রান্ত প্রকল্প; ২. প্রাথমিক শিক্ষা; ৩. জেন্ডার সমতা, ৪. শিশুমৃত্যুর হার কমানো, ৫. প্রসূতি সেবা ও মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা, ৬. এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও এ সংক্রান্ত রোগ নির্মূল পরিকল্পনা, ৭. পরিবেশগত উন্নতি ইত্যাদি। উল্লিখিত কর্মসূচিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোনো দেশ যদি কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করে, বিশ্বব্যাংক তাতে আর্থিক সহায়তা দেয়। দীর্ঘমেয়াদি এই ঋণ কম সুদে পরিশোধ করতে হয়।

বিশ্বব্যাংক তথা আইএসএফ-এর ঋণের পেছনে যে একটি 'রাজনীতি' আছে, তা বোঝা যায় যখন এই সংস্থা দু'টি নব্বই এর দশকে ঋণের শর্ত হিসেবে *Structural Adjustment* বা কাঠামোগত সামঞ্জস্যের কথা বলে। বাংলাদেশে এটা ব্যাপকভাবে পরিচিত। এটা হচ্ছে এক ধরনের সুপারিশমালা। বিশ্বব্যাংক ঋণের শর্ত হিসেবে এই কাঠামোগত সামঞ্জস্যের কথা বলে থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাংক যেসব শর্ত আরোপ করে থাকে, তা হচ্ছে ১. গ্রহীতা দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা, ২. সরকারি ব্যয় হ্রাস করা, ৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ সেবামূলক খাত ও কৃষিখাতে ভর্তুকি হ্রাস করা, ৪. প্রকৃত মজুরি হ্রাস ও ঋণ সংকোচন, ৫. দাম নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, ৬. জনসেবামূলক খাত, কৃষি উপকরণ, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে বেসরকারিকরণ, ৭. উৎস কর ও সুদের হার বাড়ানো, ৮. আমদানি অবাধ করা, ৯. মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

মূলত কাঠামোগত সামঞ্জস্যের আওতায় বিশ্বব্যাংকের নীতি হচ্ছে পুঁজিবাদি অর্থনীতিকে 'প্রমোট' করা। অর্থাৎ রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কাজে কম অর্থ বিনিয়োগে করবে। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত খাতকে 'প্রমোট' করবে, ব্যক্তিগত খাতের প্রসার বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে। রাষ্ট্রের কাছে যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, তা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে হবে ব্যক্তিগত খাতে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বিনিয়োগ কমাতে হবে, এখানে বাড়াতে হবে ব্যক্তিগত খাত। সব ধরনের রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এই কাঠামোগত সামঞ্জস্যের আওতায় যেসব শর্ত আছে, তা মেনেই ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশও ওইসব শর্ত মেনেই ঋণ নিয়েছে। কিন্তু এতে করে ঋণ গ্রহীতা দেশের অর্থনীতিতে কি তেমন পরিবর্তন এসেছে? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এর জবাব দেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৭-৮৫ সালে পেরুতে বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলা অনুযায়ী কাঠামোগত সামঞ্জস্যের শর্তাবলি গ্রহণ করা হয়। তাতে দেখা যায় এর ফলে মাথাপিছু আয় শতকরা ২০ ভাগ হারে কমেছে, মুদ্রাস্ফীতি ৩০ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০ ভাগে। সেই সাথে বেড়েছিল বেকারত্ব। একই ফল দেখা যায় ফিলিপাইনস এ ১৯৮৪ সালে। কাঠামোত সামঞ্জস্যের ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ১৯৭৫ এর পর্যায়ে চলে যায় ও শ্রমিকদের আয় শতকরা ৪৬ ভাগ কমে যায়। বেশ কয়েকজন গবেষক (সুমান জর্জ, জেমস কের্ভাড) দেখিয়েছেন যে, সাহায্যের একটা বড় অংশ বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগ ইত্যাদির ফলে দাতা দেশেই ফিরে যায়। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় কাঠামোগত সামঞ্জস্যের আওতায় ওই দেশগুলো ঋণ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। মুদ্রার অবমূল্যায়নের

(শর্ত হিসেবে) ফলে স্থানীয় মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। সেখানে বেকার সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জার্মান পার্লামেন্টের একজন সাবেক সদস্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। তার নাম ব্রিগেতে এরলার। জার্মান সাহায্য বাংলাদেশে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এতে বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য সংসদ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন মধ্য আশির দশকে। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে তিনি তার সংসদ সদস্যের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার যুক্তি ছিল যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাতে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছে না। বরং সাহায্যের একটা বড় অংশই বিভিন্ন খাতে আবার জার্মানিতেই ফিরে আসছে। এর প্রতিবাদ স্বরূপই তিনি সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশে জার্মান সাহায্য সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে একটি বই লেখেন, যার নাম Toedliche Hilfe, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় সাহায্য যা মৃত্যুর সমতুল্য। ব্রিগেতে এরলার তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে সাহায্য অপচয় হচ্ছে, কীভাবে তথাকথিত কনসালটেন্সির নামে করে ঋণের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে জার্মান ফার্মের পকেটে। ব্রিগেতে এরলারের বইটি আমাদের কাছে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ যে, বৈদেশিক সাহায্য আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। আমরা জার্মানির দৃষ্টান্ত দিলাম এ কারণে যে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া সাহায্যের ধরন অনেকটা এ রকমই।

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাংক পরিচালনা পদ্ধতিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের তেমন ভোটাধিকার ক্ষমতা ছিল না। এখন এই ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভোটাধিকারের হার অনেকটা এরকম : যুক্তরাষ্ট্র (শতকরা ১৫ দশমিক ৮৫ ভাগ), জাপান (৬ দশমিক ৮৪ ভাগ), চীন (৪ দশমিক ৪২), সৌদি আরব (২ দশমিক ৭৭) ইত্যাদি। সাধারণত যেসব দেশের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী এবং বিশ্বব্যাংকে তাদের শেয়ার হোল্ডারের পরিমাণ বেশি, তাদের ভোটিং ক্ষমতা বেশি। টেরেসা হেয়টার তার *Aid as Imperialism* গ্রন্থে বলার চেষ্টা করেছেন যে উন্নত বিশ্ব তাদের স্বার্থেই ঋণ দিয়ে থাকে। তিনি পঞ্চাশের দশকের বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইউজিন মার্ক এর উদ্ধৃতি দিয়ে তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি তুলে ধরেছেন। মার্ক বলেছিলেন সাহায্য দেবার সুবিধা হচ্ছে : ১. এতে করে মার্কিন দ্রব্য ও সেবার উল্লেখযোগ্য বাজার সৃষ্টি করবে; ২. মার্কিন ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হবে; ৩. বিভিন্ন দেশে মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিশ্বব্যাংকের প্রজেক্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। যেমন—ভারতে নর্মদা নদীতে বাঁধ, চীনে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, বাকু চেহান (Baku-Ceyhan) পাইপ লাইন ইত্যাদি। ভারতে নর্মদা নদীতে বাঁধের কারণে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় জনসাধারণকে নিজস্ব পৈতৃক ভূমি থেকে উৎখাত করে সেখানে রিজার্ভয়ার তৈরি করা হয়েছিল। এতে জনগণের তেমন উপকার হয়নি। ব্রাজিলের আমাজান বনভূমির অন্তর্ভুক্ত Rondonia প্রদেশ উন্নয়নের নামে যে ঋণ দেয়া হয়েছিল, তাতে বিশাল বনভূমি ধ্বংস হয়েছিল, স্থানীয় আদিবাসীরা উৎখাত হয়েছিল, ভূমিধ্বসের সৃষ্টি হয়েছিল। Bake-Ceyhan পাইপ লাইনের কারণে বড় ধরনের দূষণের সৃষ্টি হয়েছিল। আর চীনে দারিদ্র দূরীকরণের নামে তিব্বতে প্রায় ৩৭ হাজার চীনা নাগরিকের সেখানে পুনর্বাসন হয়েছিল। এতে করে তিব্বতি জনগণ ও চীনা নাগরিকদের স্থায়ী বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যই State University of New York-এর Levin Institute-এর একটি মূল্যায়নে (Globalization Jun 2016) মন্তব্য করা হয়েছে এভাবে 'Like the IMF, the World Bank has been criticized for its part in promoting the Washington consensus through its close participation with the IMF in lending only to program that were heavily conditioned. Some believe the programs are focused on austerity measures that hurt the poor, while allowing big corporations to flourish'। এটাই হচ্ছে আসল কথা-যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে এবং কর্পোরেট হাউজগুলোর স্বার্থেই এই ঋণ দেওয়া হয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আইএমএফ সাধারণত (১৯৪৪ সালের ৭ জুলাই গঠিত। আত্মপ্রকাশ ১৯৪৫ সালে, ২৯ দেশ নিয়ে) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে, যাতে দেশগুলো, *'ব্যালেন্স অব পেমেন্ট'* এর বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারে এবং 'ডিফল্টার' হতে না পারে এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে পারে। আইএমএফ একই সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক নীতি উন্নত করতে পারে। সাধারণত একজন ইউরোপীয়ান নাগরিক আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অনেক দেশ আইএমএফ-এর ঋণ নীতির সমালোচনা করে সংস্থাটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিউবা ১৯৬৪ সালে আইএমএফ ছেড়ে চলে যায়। আর ১৯৫৪ সালে সাবেক চেকোস্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আইএমএফ একটি 'বোর্ড অব গর্ভনর' দ্বারা পরিচালিত হয়। ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ রয়েছে। যারা সংস্থাটি পরিচালনা করে। ৮টি দেশ একজন করে নির্বাহী পরিচালক মনোনীত করে। এই দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, চীন, জাপান, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও সৌদি আরব। বাকি ১৬ জন পরিচালক ৪ থেকে ২২ দেশের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। এজন্য দেখা যায় ধনী দেশগুলোরই আইএমএফ এ কর্তৃত্ব থাকে বেশি।

গ্যাট, ডব্লিউটিও এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব

১৯৯৫ সাল থেকে গ্যাট বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থারূপে (ডব্লিউটিও) আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্যাট বলতে আমরা বুঝি শিল্প ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল ১২৪টি দেশ বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য বিস্তার লক্ষ্যে উরুগুয়ে রাউন্ড গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তি ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় এবং এই চুক্তির মাধ্যমেই গ্যাট ১৯৯৫ সাল থেকে বিলুপ্ত হয় আর তার স্থলাভিষিক্ত হয় 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' নামের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা। এটি মূলত বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ'র মতো আরেকটি প্রতিষ্ঠান। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিয়ে সংশয় ছিল। এক সময় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। পরে সিনেটে এই চুক্তি অনুমোদিত হওয়ায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের বড় বাধা অপসারিত হয়। তবে কিছু কিছু বাধা এখনও রয়ে গেছে। চীন ও রাশিয়া এই বাণিজ্য সংস্থায় এখনও যোগ দেয়নি। আশা করা হচ্ছে চলতি বছরের মধ্যে এই দেশ দুটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯১ সালে ডাংকেল প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়িত হয় এবং পিটার সাদারল্যান্ড ছিলেন গ্যাট-এর মহাসচিব। এখন মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ইতালির একজন সাবেক মন্ত্রী। এখানে উন্নত বিশ্ব ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। উন্নত বিশ্ব এই পদটির ব্যাপারে যেমনি আগ্রহী ছিল, তেমনি উন্নয়নশীল বিশ্বও তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চালু হবার সাথে সাথে এই সংস্থাটি এখন বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। সদস্যভুক্ত যেকোনো দেশ তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যদি অন্য কোনো দেশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই দেশের বিরুদ্ধে এই সংস্থার কাছে নালিশ করতে পারবে। এই সংস্থা অভিযুক্ত দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে তত্ত্বগতভাবে বলা হয়েছে কোনো একটি বৃহৎ দেশ আর এককভাবে বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমনকি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

গ্যাট কী

গ্যাট (GATT) হচ্ছে শুল্ক বাণিজ্য নিয়ে একটি বাণিজ্য চুক্তি। এতে বোঝায় General Agreement on Tariffs and Trade। চলতি দশকে আমেরিকা, ইসিভুক্ত উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতি, খোলা বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের

সারণি : ১৮

গ্যাট থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

১৯৪৭	: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে ২৩টি দেশ জেনেভায় এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং কাস্টমস ট্যারিফ হ্রাস করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ অক্টোবর তারা শুল্ক ও বাণিজ্যবিষয়ক সাধারণ চুক্তিতে (গ্যাট) সই করে। প্রথম বৈঠকের ফল হচ্ছে ৪৫ হাজার পণ্যের ওপর থেকে ট্যারিফ হ্রাস, যা সমগ্র বিশ্ব বাণিজ্যের এক-পঞ্চমাংশ। নভেম্বর মাসে ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিরা কিউবার রাজধানী হাভানায় মিলিত হন। লক্ষ্য : প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থায় সনদ প্রণয়নের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা। ১৯৪৮ সালের মার্চে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারসমূহ চুক্তিটি অনুমোদনের কোনো অঙ্গীকার না করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার একটি হাতিয়ার হিসেবেই থেকেই যায় গ্যাট।
১৯৪৮	: ১ জানুয়ারি গ্যাট কাজ শুরু করল।
১৯৪৯	: ফ্রান্সের এনেসি নগরীতে গ্যাট-এর তৃতীয় দফা বৈঠক এবং ২৫ শতাংশ ট্যারিফ হ্রাসে মতৈক্য।
১৯৫৫-৫৬	: ১৯৫৬ সালের মে মাসে আলোচনা অনুষ্ঠিত এবং আড়াই শ' কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসে ঐকমত্য।
১৯৬০-'৬২	: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি, গ্যাট-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ডগলাস ডিলান-এর সম্মানে তার নামে ৫ম গ্যাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ট্যারিফ হ্রাসের পরিমাণ ৪৯০ কোটি ডলারে উন্নীত।
১৯৬৪-'৬৭	: পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সম্মানে তার নামে অনুষ্ঠিত হলো 'কেনেডি রাউন্ড'। বিশ্ব বাণিজ্যে ৪ হাজার কোটি ডলার ট্যারিফ হ্রাসে ঐকমত্য।
১৯৭৩-'৭৯	: জাপানের রাজধানী টোকিওতে ৭ম রাউন্ড শুরু। এতে এ মর্মে ঐকমত্য হয় যে, শুধুমাত্র শুল্ক হ্রাসই নয়, ভরতুকি ও আমদানি লাইসেন্সের মতো বাণিজ্য প্রতিবন্ধকগুলোও অপসারণ করতে হবে। এবারের বৈঠকে শুল্ক হ্রাস ৩০ হাজার কোটি ডলারের উন্নীত।
১৯৮৬-'৯৩	: গ্যাট বাণিজ্যমন্ত্রীরা উরুগুয়ের পুন্টা ডেল এস্টেতে শুরু করেন তথাকথিত উরুগুয়ে রাউন্ড। এটাই এ যাবৎকালের সবচাইতে উচ্চাভিলাষী ও সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য আলোচনা।
১৯৯৪	: গ্যাট বাণিজ্য মন্ত্রীরা মরক্কোর মারাক্কেশ-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে মিলিত হন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তারা অন্যান্য চুক্তিতেও সই করেন।
১৯৯৫	: জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টি। গ্যাট ও ডব্লিউটিও'র মধ্যে মূল তফাতটা হলো এই যে, গ্যাট ছিল একটা সাময়িক আইনি চুক্তিমাত্র। পক্ষান্তরে ডব্লিউটিও হচ্ছে স্থায়ী চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত একটি সংস্থা। এর আছে নিজস্ব সদস্য। কিন্তু গ্যাট-এর ছিল কেবল চুক্তির পক্ষসমূহ। গ্যাট কেবলমাত্র পণ্য বাণিজ্য নিয়েই কারবার করতো, কিন্তু ডব্লিউটিও'র আওতায় সেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

যে প্রক্রিয়া চলে আসছিল তারই নাম গ্যাট। ১৯৪৭ সালে গ্যাট-এর প্রথম রাউন্ডের আলোচনা শুরু হয়, আর গ্যাটের অষ্টম রাউন্ড শেষ হয় ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে মরক্কোর মারাকাসে সর্বশেষ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। এই গ্যাট আলোচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা ও একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠনের একটি প্রেক্ষাপট আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে ব্রেটন উডস-এ একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তিনটি সংস্থা হচ্ছে যথাক্রমে বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা আইএমএফ এবং ডব্লিউটিও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠান প্রায় সাথে সাথেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগল দীর্ঘ ৫০ বছর।

ডব্লিউটিও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যখন প্রথমদিকে গঠিত হতে পারলো না, তখন দেখা গেল ১৯৪৭ সালে *'দি জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড'* বা গ্যাট আলোচনা শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রথম গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর আরো ৮ বার এই গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে প্রথম জেনেভায় গ্যাট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৩টি দেশ মিলে গ্যাট গঠন করে। এ সময় গ্যাট বিশ্বব্যাপী ৪৫ হাজার পণ্যের ওপর থেকে বাণিজ্য কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সের এনিসিতে গ্যাটের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ১৩টি দেশ অংশ নেয়। এতে ৫ হাজার পণ্যের উপর থেকে অতিরিক্ত কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে গ্যাটের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনের টরকুইয়ে। এতে ৩৮টি দেশ ৮৭০০ পণ্যের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্যাটের চতুর্থ বৈঠক ১৯৫৫-৫৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৬টি দেশ অংশ নেয় এবং অতিরিক্ত ২শ ৫০ কোটি ডলার মূল্যের কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ্যাটের পঞ্চম বৈঠক ডিলন বৈঠক হিসেবে পরিচিত। এটি ১৯৬০-৬২ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৬টি দেশ এতে ৪৪শ আইটেমের ওপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্যাটের ৬ষ্ঠ বৈঠক কেনেডি বৈঠক হিসাবে পরিচিত। এটি ১৯৬৪-৬৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। ৩২টি দেশ এতে প্রধান সকল শিল্পজাত পণ্যের উপর থেকে কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা খাদ্যশস্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কেও চুক্তিতে পৌঁছে। গ্যাটের সপ্তম বৈঠক নিয়ন্ত্রণ বৈঠক নামে পরিচিত। এই বৈঠক ১৯৭৩ সালের জাপানের টোকিওতে শুরু এবং ১৯৭৯ সালে জেনেভায় শেষ হয়। বৈঠকে

অংশগ্রহণকারী ৯৯টি দেশ গড়ে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকারি সংগ্রহ, ভর্তুকি, শুল্ক হার এবং বাণিজ্যের কৌশলগত প্রতিবন্ধকতা এই বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি উন্নত রূপরেখা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্যাটের অষ্টম বৈঠক উরুগুয়ে বৈঠক হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে এই বৈঠক প্রধানত ১০৭টি দেশকে নিয়ে শুরু হয়। ব্যাংকিং, বিমা, টেলিযোগাযোগ, শিল্প এবং বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত পুঁজির নিরাপত্তা বিধানসংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো উত্থাপিত হওয়ায়, বৈঠকটি সবচেয়ে জটিল হয়ে ওঠে। উরুগুয়ে বৈঠকের চূড়ান্ত আলোচনায় পৌঁছার জন্য ১৯৯০ সালে ব্রাসেলসে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি ভর্তুকি নিয়ে ইসি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় তা ভেঙে যায়। পরে গ্যাট-এর প্রাক্তন মহাসচিব আর্থার ডাংকেল ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বরে সভা ডেকে ৪৩৬ পৃষ্ঠার এক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানির মতো ধনী দেশগুলোর বিরোধিতার ফলে সমস্ত উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের অষ্টম রাউন্ডের চুক্তি হিসেবে ডাংকেল প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২০টি দেশের প্রতিনিধিরা ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল এক সম্মেলনে ডাংকেল প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

বর্তমান গ্যাট চুক্তিতে কী আছে

২২ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ডাংকেল প্রস্তাবের বহুল আলোচিত চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথমটি GATS, দ্বিতীয়টি TRIM, তৃতীয়টি TRIP এবং চতুর্থটি MFA। GATS হচ্ছে General Agreement on Trade in Services, TRIM হচ্ছে Trade Related Investment Measures, TRIP হচ্ছে Trade Related Intellectual Property Rights, আর MFA হচ্ছে Multi-Fibre Agreement। GATS-এর আওতায় ব্যাংক, বিমা, পর্যটন, দোকানপাট, পরিবহন, বিমান, হোটেল, সিনেমা, টেলিভিশন, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি সার্ভিস বা সেবামূলক বাণিজ্যিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আনা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেবা খাত পরিচালনা করবে বেসরকারি লোক বা সংগঠন এবং এ খাতে অবাধ বাণিজ্যের পাশাপাশি বিদেশিদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। TRIM'র আওতায় যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এখন থেকে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে দেশীয় কোম্পানির মতো দেখতে হবে। কোনো আলাদা নিয়মকানুন এদের ওপর আরোপ করা যাবে না। TRIP'র অর্থ হলো বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব। এ প্রস্তাবে পণ্যের কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং পেটেন্ট মালিকানাতে নতুন নতুন

বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মালিকের অনুমতি ছাড়া পণ্য ব্যবহার না করার নাম ট্রিপ। এ চুক্তির ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। MFA'র নামে আরেকটি বিধান ডাংকেল প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। এ প্রস্তাব অনুযায়ী অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে রপ্তানিকারক দেশের জন্য বর্তমান বিশ্বের কতিপয় দেশে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি চালু আছে তা তুলে দেবার শর্ত দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৫ সালের মধ্যে কোনো কোটা থাকবে না।

বাংলাদেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে

বাংলাদেশ গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষ ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ অভিমত পোষণ করেছেন যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সে ব্যাপারে একটা ধারণা নিচে দেয়া হলো :

১. গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চুক্তি বাস্তবায়নের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো পোশাক শিল্পের রপ্তানি কোটা তুলে নিলে বাজার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশকে গার্মেন্টস শিল্পে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। বর্তমানে দেশে ৪৬২১টি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প রয়েছে। এ খাতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩৪.১৩ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ বিদেশে যত রপ্তানি করে, তার শতকরা ৮৪.২১ ভাগ আসে এ খাত থেকে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক এই খাতে কাজ করে। জিডিপিতে এই খাতের অবদান ১১.১৭ ভাগ। তৈরি পোশাকের মাঝে ইইউতে যায় ৬১.৯১ ভাগ, আর যুক্তরাষ্ট্র যায় ১৭.৯৭ ভাগ (Textile Focus, February 2020)। করোনা ও নানাবিধ বিধি নিষেধের কারণে এই খাত ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

২. গ্যাট চুক্তিতে শিল্পপণ্যের ৪০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে সংশ্লিষ্ট দেশ আগের মতো আর ভর্তুকি পাবে না। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশ ৮ বছর এবং উন্নত দেশ ২ বছর সময় পাবে। এর ফলে আমদানি নির্ভর দেশে পণ্যমূল্য বেড়ে যাবে। বাড়তি চাপ পড়বে ক্রেতাদের উপর। আবার রপ্তানিতে ভর্তুকি দেওয়ার ফলে যাদের রপ্তানি বেড়েছিল, তারা এখন আর সেই সুযোগ পাবে না। এর ফলে এদের রপ্তানি কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কেননা বাংলাদেশ আমদানি নির্ভর দেশ।

৩. 'ট্রিপ'-এর ফলে 'বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মেধা এখন বাণিজ্যকরণ হবে। গরিব দেশগুলো এতদিন নিজস্ব 'প্যাটেন্ট' আইনের আওতায় উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছিল। বাংলাদেশ এ থেকে বাইরে ছিল না। এখন আর বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের প্রযুক্তি আগের মতো সহজে ব্যবহার করতে পারবে না। এই সুযোগ গ্যাটের চুক্তি বলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মেধা সম্পদ অধিকার সংরক্ষিত হলে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে উন্নত প্রযুক্তি খরিদ করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে। এ অবস্থায় আমাদের ঔষধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এ আইনে আক্রান্ত হবে। ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত ঔষধ, রসায়ন শিল্প, জৈব প্রযুক্তি, কীটনাশক, নানা গাছপালা ও প্রাণী, কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন, মহাকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি গবেষণা আগের মতো আর স্থানীয়ভাবে করা যাবে না।

৪. প্যাটেন্ট আইন আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে আগামীদিনে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম বীজ, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি এককভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাবে। তারা চুটিয়ে ব্যাবসা করার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। উৎপাদন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা এখানে বেশি। এর সুযোগ নিয়ে উন্নত বিশ্ব আগামীতে বাংলাদেশে তাদের কৃষি বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটা সুযোগ পাবে। কৃষি খাতের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখন পর্যন্ত প্যাটেন্ট সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সস্তায় কিছু কিছু ঔষধ তৈরি করতে পারছে। আগামীতে এটা আর পারবে না। বাংলাদেশকে ঔষধ উৎপাদনের প্যাটেন্ট জোগাড় করতে হবে। তখন তৈরির চেয়ে আমদানিতে বেশি মুনাফা থাকায় আমদানিকেই ব্যবসায়ীরা প্রাধান্য দেবে বেশি। যখন কোনো বহুজাতিক কোম্পানি নতুন কোনো ঔষধ আবিষ্কার করবে এবং বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি তার কাছ থেকে প্যাটেন্ট ক্রয় করবে, তখন পরবর্তী ২০ বছর অন্যান্য কোম্পানি এই ঔষধ তৈরি করতে পারবে না। তার একক মনোপলি থাকবে ২০ বছর। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনও সরকারি হাসপাতালগুলোতে কিছুটা হলেও বিনামূল্যে চিকিৎসা পান। এটা বন্ধ হয়ে যাবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিপূর্ণ বাজার হয়ে উঠবে।

৫. গ্যাট চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের পরিষেবা খাত। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিষেবার অনেক খাত মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যে পরিণত হবে। গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ব্যাংক, বিমা,

টেলিকমিউনিকেশন, যোগাযোগ, হোটেল ইত্যাদি পরিষেবা বিদেশি পুঁজির কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে বিদেশি কোম্পানিগুলো পুঁজি বিনিয়োগ করবে এবং পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো খাত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

বাংলাদেশে এই চুক্তির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই প্রতিবাদ উঠেছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান এক সেমিনারে মন্তব্য করেছেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সার্ভিস সেক্টর বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দিতে হবে। এর ফলে বিদেশি ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি এসে জেঁকে বসতে পারে। অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেছেন, গ্যাট চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আরো খর্ব হলো (জনকণ্ঠ, ১৩ এপ্রিল, ৯৪)। তবে বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম রেজার মতে গ্যাট চুক্তির ফলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা ১০ থেকে ১৫ বছরের সময় পাচ্ছি। এর মধ্যে বাংলাদেশকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তার মতে গার্মেন্টস-এ কোটা সিস্টেম তুলে দেওয়ায় বাংলাদেশ এখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এখনই বাংলাদেশের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। তিনি শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন (বাংলাবাজার, ২৫ ডিসেম্বর, ৯৩)। গ্যাট চুক্তির পর বেশ কিছু সময় পার হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমস্যায় পড়েছে।

'ডব্লিউটিও' : গ্যাটের উত্তরসূরি

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হচ্ছে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য পদ্ধতির আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। বিভিন্ন সরকার কীভাবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে 'ডব্লিউটিও' তার মুখ্য চুক্তিবিষয়ক বাধ্যবাধকতাসমূহ নির্ধারণ করে। এই সংস্থাই হচ্ছে সেই মঞ্চ যার ওপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত বিতর্ক, আলোচনা এবং মীমাংসার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'ডব্লিউটিও' হচ্ছে উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনার প্রতিফলন এবং গ্যাটের উত্তরসূরি সংস্থা।

ডব্লিউটিও-র লক্ষ্য: 'সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির' প্রস্তাবের একটি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো অন্য কোনো দেশের পণ্যসামগ্রীকে অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় অনুরূপ সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। "জাতীয় আচরণ" শীর্ষক শর্তে বলা হয়েছে যে, বাইরের পণ্যসামগ্রীকে কোনোভাবেই কম সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

বাজারগুলোতে ক্রমবর্ধমান এবং সম্ভাব্য প্রবেশাধিকার : কোটা পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করা হলেও 'ডব্লিউটিও'র আওতায় শুল্ক এবং

কাস্টম শুল্ক বৈধ। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মাধ্যমে একশ' বিশটি দেশ যে শুল্ক হ্রাস করেছে, সেটা প্রায় ২২,৫০০ পৃষ্ঠাসংবলিত জাতীয় শুল্ক তফশিলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো এখন ডব্লিউটিও-র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিচিত। শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে পাঁচ বছরে সম্পন্ন হবে। এর ফলে শিল্পায়িত দেশগুলো কর্তৃক উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীর ওপর আরোপিত শুল্ক চল্লিশ শতাংশ কর্তন করা হবে। গড়পড়তা ছয় দশমিক তিন শতাংশ থেকে তিন দশমিক আট শতাংশ শুল্ক হ্রাস পাবে। এই শুল্ক হ্রাসের আওতায় উরুগুয়ে রাউন্ড সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহের পরিমাণ উন্নত দেশ এবং উত্তরণ প্রক্রিয়াধীন দেশগুলোর জন্য প্রায় একশ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। সদস্য দেশসমূহ বিভিন্ন সেবা খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিধিমালা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক কিছু অঙ্গীকার করেছে। এসব অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে শুল্ক হ্রাসের মতো কিছু বিষয়, যেগুলো বাধ্যতামূলক জাতীয় তফশিলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ন্যায়সংগত প্রতিযোগিতার বিকাশ : ভূতপূর্ব গ্যাটের আওতায় যেসব নিয়মকে বিভিন্ন সরকার দুই ধরনের "অন্যায়" প্রতিযোগিতার ওপর ক্ষতিপূরণমূলক শুল্ক আরোপ করার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারত, 'ডব্লিউটিও' সেই নিয়মাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করেছে এবং সেগুলো সম্প্রসারণ করেছে। এই দুটো 'অন্যায়" প্রতিযোগিতা হচ্ছে 'ডাম্পিং' (বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য রপ্তানি) এবং ভুর্তকি। কৃষি সম্পর্কে ডব্লিউটিও চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কৃষি খামার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকতর ন্যায়সংগত আচরণ নিশ্চিত করা। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিযোগিতার শর্তসমূহের বিকাশ ঘটাবে যেখানে নতুন ধ্যানধারণা ও নতুন ধারা সংশ্লিষ্ট। অন্য একটি ক্ষেত্রে 'ডব্লিউটিও' সেবা খাতে সংশ্লিষ্ট শর্তাদির উন্নয়ন ঘটাবে।

উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারকে উৎসাহ প্রদান : উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত গ্যাট বিধিমালাগুলো ডব্লিউটিওতে অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে সেই শর্তগুলোর আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য উন্নত দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে। 'ডব্লিউটিও'র অপেক্ষাকৃত দুরূহ শর্তগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উত্তরণের সময় প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোকে আরও অধিক নমনীয়তা এবং সুবিধা দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা বাজারে প্রবেশের সুবিধাজনক শর্ত দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

প্রধান দায়িত্বসমূহ : 'ডব্লিউটিও'-র মূল দায়িত্বগুলো হচ্ছে বহুপক্ষীয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করা, যেগুলো একত্রে 'ডব্লিউটিও'-র সৃষ্টি করেছে। সংস্থার অপরাপর দায়িত্বগুলোর মধ্যে রয়েছে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনা ফোরাম হিসাবে কাজ করা, বাণিজ্য সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করা, জাতীয় বাণিজ্য নীতিসমূহ তদারক করা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগিতা করা।

'ডব্লিউটিও'-র কাঠামো : 'ডব্লিউটিও'-র সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাখা হচ্ছে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন, যেটা প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সংস্থার দৈনন্দিন কাজ অবশ্য কিছু সাবসিডিয়ারি শাখার উপর ন্যস্ত, যেমন সাধারণ পরিষদ জেনারেল কাউন্সিল, যেটা বিরোধ নিষ্পত্তি শাখা (ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি) এবং বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা শাখা ট্রেড পলিসি রিভিউ বডি হিসাবেও কাজ করে থাকে। সাধারণ পরিষদ তিনটি প্রধান বিভাগের ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে থাকে। এগুলো হচ্ছে "কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন গুডস', ট্রেড ইন সার্ভিসেস" এবং "ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস।" বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা শাখা "কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন গুডস", "ট্রেড ইন সার্ভিসেস", এবং "ট্রেড রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস।" মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অন্য তিনটি বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলো হচ্ছে, "কমিটি অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট", "কমিটি অন ব্যালেন্স অব পেমেন্টস" এবং "কমিটি অন বাজেট, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।" 'ডব্লিউটিও'-র আওতাভুক্ত প্রতিটি বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির নিজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ রয়েছে, যেগুলো জেনারেল কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে অসামরিক বিমান, সরকারি ক্রয়, দুগ্ধজাত পণ্য এবং গবাদি পশুর গোশতবিষয়ক চুক্তি।

সচিবালয় এবং বাজেট : 'ডব্লিউটিও'র সচিবালয় জেনেভায় অবস্থিত। এই সচিবালয়ে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৬২৭ জন। মহাপরিচালক রবার্টো আজেভেডো (Roberto Azevedo) এর প্রধান। এছাড়া রয়েছে আরও চারজন উপমহাপরিচালক। এই সচিবালয়ের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে চুক্তিভিত্তিক আলোচনা এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে 'ডব্লিউটিও' ডেলিগেটদেরকে সেবা প্রদান। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা কম উন্নত দেশগুলোকে টেকনিক্যাল সমর্থন প্রদান করা 'ডব্লিউটিও' সচিবালয়ের একটি বিশেষ দায়িত্ব। সংস্থার অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি এবং বাণিজ্য নীতির বিশ্লেষণ প্রদান করে থাকেন।

'ডব্লিউটিও'-র আইনবিষয়ক কর্মকর্তারা বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংস্থার নিয়মাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। নতুন যেসব দেশ সদস্য হতে আগ্রহী তাদেরকে সচিবালয় সহায়তা করে থাকে।

ডব্লিউটিও-র বার্ষিক বাজেট হচ্ছে ১৯৭.২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাংক, যা ২০০ মিলিয়ন ডলারের সমান। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত মোট বাণিজ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি সদস্য দেশের চাঁদা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই বাজেটের অংশবিশেষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রও পেয়ে থাকে।

গ্যাট উদ্যোক্তাদের মতে এই চুক্তির মাধ্যমে বছরে বিশ্বে ২০ হাজার কোটি ডলারের নতুন সম্পদ সৃষ্টি হবে। বাণিজ্য বাড়বে ৭০ হাজার কোটি ডলারের। এর ফলে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হবে, তা সত্যি সত্যিই একটা চিন্তার ব্যাপার। কৃষি, বস্ত্র, স্বাস্থ্যসেবা, বুদ্ধিজীবী সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে যেসব কথা উঠেছে, তা ফেলে দেবার নয়। বস্ত্র খাতে কোটা সিস্টেম বিলোপ হবে আগামী দশ বছরে ধাপে ধাপে। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ বিল ফ্রেনজেল বিশ্বাস করেন কৃষি সম্পর্কিত চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দুভাবে সহায়তা করবে: উৎপাদন ভর্তুকি হ্রাসের ফলে উন্নয়নশীল দেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানিকারকদের পক্ষে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করা সহজ হবে। শুধুমাত্র শিল্পায়িত দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী বাজার প্রবেশের বর্ধিত সুবিধার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে। বলা হচ্ছে, জাপান ও কোরিয়ার চাপে বাজার উন্মুক্ত হবার ফলে থাইল্যান্ড লাভবান হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে গম ও ভুট্টার জন্য হ্রাসকৃত ভর্তুকির ফলে আর্জেন্টিনাসহ অন্যান্য দেশ অধিক পরিমাণ দানাদার শস্য রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে Intellectual Property Righty ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এগারো বছর সময় দেওয়া হয়েছে।

গ্যাট চুক্তির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এটা সত্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। ভারতে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এছাড়া চুক্তিভুক্ত দেশ জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের অনেক দেশ আগে থেকেই গ্যাট চুক্তির কৃষিনীতি সম্পর্কে প্রতিবাদ করে আসছে। এসব দেশের মতে কৃষিক্ষেত্রে মুক্তবাজার কোটি কোটি ছোট কৃষি ফার্মকে ধ্বংস করে দেবে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক বেকারত্ব বাড়াবে। তবে এটা সত্য উন্নত বিশ্ব এই গ্যাট চুক্তি নিয়ে যতটা না চিন্তিত, তার চাইতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর চিন্তা ও উদ্বেগ অনেক বেশি। জানুয়ারি (৯৫) মাসে দিল্লিতে সমাপ্ত ৮২টি উন্নয়নশীল দেশের শ্রমমন্ত্রীদের ৫ দিনব্যাপী সম্মেলনে এই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ধনী দেশগুলোর সংরক্ষণবাদী

নীতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে। প্রস্তাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সসহ শিল্পোন্নত দেশগুলো শ্রমের মান বজায় রাখতে আগ্রহী দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। এর ফলে শিশুশ্রম এবং অন্যান্য সামাজিক মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুশ্রমের ব্যবহার রোধকল্পে ধনী দেশগুলো এসব দেশের পণ্য আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ঘোষণায় গরিব দেশগুলোর রপ্তানির ওপর থেকে কোটা পদ্ধতি এবং শুল্ক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারে ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। ধনী দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলো তাদের ন্যায্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। সুতরাং আগামী দিনগুলোতে সংস্থাটি পরিচালনায় একটি অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একটি বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান

Ethnic cleansing as a concept has generated considerable controversy. Some critics see little difference between it and genocide. Defenders, however, argue that ethnic cleansing and genocide can be distinguished by the intent of the perpetrator : whereas the primary goal of genocide is the destruction of an ethnic, racial, or religious group, the main purpose of ethnic cleansing is the establishment of ethnically homogeneous lands, which may be achieved by any of a number of methods including genocide.

Andrew Bell-Fialkoff, *Foreign Affairs*, 72
Nov 3, Summer 1993

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে একটি কালো অধ্যায় হচ্ছে বিভিন্ন দেশে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান। এই জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান শুধুমাত্র একটি অঞ্চল বা একটি দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইউরোপ থেকে আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এই জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের ভয়াবহতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বলতে দ্বিধা নেই, জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম জার্মানিতে নাজিদের শাসন আমলে, ইতিহাসে যা চিহ্নিত হয়ে আছে Holocaust হিসেবে। পর্যায়ক্রমে আমরা জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান প্রত্যক্ষ করেছি বুরুন্ডি এবং বসনিয়া হারজেগোভিনাতে। এই জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির লোকজনদের হত্যা, তাদের উচ্ছেদ ও নিজ জাতির কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা। Holocaust-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি জার্মান জাতি ইহুদি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে, দাস শিবিরে পাঠিয়ে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এটা করতে গিয়ে লাখ লাখ ইহুদিকে নাজিরা হত্যা করে জার্মানকে ইহুদি মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপে বসনিয়া

হারজেগোভিনায় আমরা দেখেছি সার্ব জাতি (অর্থোডক্স খ্রিষ্টান) কর্তৃক মুসলমানদের উচ্ছেদ ও গণহত্যা সংঘটিত করা। আফ্রিকায় বুরুন্ডিতে হুতু তুতসির দ্বন্দ্ব সেখানে নব্বই এর দশকে বড় ধরনের মানবিক সংকটের জন্ম দিয়েছিল।

জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের (Ethnic Cleansing) সাথে গণহত্যার (Genocide) বিষয়টি সরাসরি জড়িত। Oxford Handbooks এ বলা হয়েছে, 'Since 1990's ethnic cleansing has become one of the most widely known forms of violence directed againt groups. Ehnic cleansing is related to genocide but ethnic cleansing is focused more closely than genocide on geography and on forced removal of ethnic or related groups from particular areas'। এর একটি ধর্মীয় দিক যেমনি আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন গ্রুপ, দল-উপদলের বা গোত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ধর্মীয় দিকটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বসনিয়া হারজেগোভিনায়, আর উপদলীয় তথা গোত্র দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গণহত্যা আমরা দেখেছিলাম আফ্রিকার বুরুন্ডিতে।

পুরানো কথা

বিংশ শতাব্দীতে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম ঘটনা তৎকালীন জার্মান সম্রাট কর্তৃক আজকের নামিবিয়ায় Hereo, Namaqua ও San জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। এটা ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের ঘটনা (Hereo and Namaqua Genocide)। ইতিহাসে আছে স্যামুয়েল মাহারেরোর (Samuel Maharero) নেতৃত্বে Herero জনগোষ্ঠী ও হ্যানড্রিক ভিটবই (Hendrik Witbooi) এর নেতৃত্বে Nama জনগোষ্ঠী জার্মান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। নামিবিয়া ছিল জার্মান কলোনি। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জার্মান সেনা অভিযানে ২৪ হাজার থেকে ১ লাখ Hereos এবং ১০ হাজার Nama- কে হত্যা করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে জার্মান সরকার ওই গণহত্যার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ তারা দেয়নি। ১৯১২-১৯১৩ সালে সংঘটিত প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। ওই সময় কসভো, মেসিডোনিয়া, সানজাক ও থার্স (Thrace) এলাকায় জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। টার্গেট ছিল মুসলমানরা, পরে খ্রিষ্টানরাও উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হন। ইতিহাসে Pontian Genocide-এর খবরও (১৯১৭) আছে, যেখানে অটোমান সম্রাজ্যের সময় তুর্কিরা প্রায় ৩৫৩০০০ জাতিগত গ্রিকদের

(ধর্মীয়ভাবে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান) হত্যা করেছিল। Greek Genocide (1914-1922)-এ ৪ লাখ থেকে ৭ লাখ মানুষের মৃত্যুর খবরও আছে। জাপানি সেনাবাহিনী যখন ১৯৩০ সালে চীনে অভিযান চালিয়েছিল, তখন তারা কয়েক লাখ চীনা নাগরিকদের হত্যা করেছিল। আবার ইতালি কর্তৃক লিবিয়া দখলের সময় সেখানে তারা গণহত্যা চালিয়েছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে ইউক্রেনে 'খাদ্যের অভাবে মৃত্যু'র জন্য তৎকালীন সোভিয়েত শাসক স্ট্যালিনকে দায়ী করা হয়। ইতিহাসে এই ঘটনা চিহ্নিত হয়ে আছে Holodomor (ইউক্রেনীয় শব্দ, যার অর্থ না খেতে দিয়ে হত্যা) হিসেবে। ইউক্রেনে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিলেন স্ট্যালিন। জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণের পর (৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১১০০০০ থেকে ১২০০০০ জাপানি নাগরিকদের (যারা ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র বসবাস করতেন) যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্যাম্পে স্থানান্তর বা ট্রান্সফার করেছিল। ১৯৪৪ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ক্রিমিয়ার তাতার জনগোষ্ঠীকে (প্রায় সাড়ে ৪ লাখ) উজবেকিস্তানসহ অন্যান্য অঞ্চলে নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত করে সেখানে পুনর্বাসন করেছিল। তাতার জনগোষ্ঠী তার্কিশ বংশোদ্ভূত ও ইউক্রেনের Donetsk, Crimea, Luhansk Oblast, Kherson Oblast, Odessa অঞ্চলে বসবাস করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি জার্মানির সেনাবাহিনী কসোভো ও Metohija এলাকায় ১০ হাজার সমর্থককে হত্যা করেছিল। ১৯৪৪ সালে সার্বরা Vojvodina এলাকায় ৪০ হাজার হাঙ্গেরিয়ানকে হত্যা করেছিল প্রতিশোধের অংশ হিসেবে। এর আগে ১৯৪১-১৯৪৪ সময়সীমায় নাজি বাহিনী সাবেক যুগোস্লাভিয়ার সার্ব, রোমা ও ইহুদি জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল। ইতিহাসে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান দখলিকৃত অঞ্চল থেকে প্রায় ১৪ মিলিয়ন জার্মানকে উৎখাত করা হয়েছিল। এ ধরনের জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান আমরা ইন্দোনেশিয়াতে (১৯৪৯ সালে Indos জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে), ইথিওপিয়ায় (Harari মুসলমান জনগোষ্ঠী), আলজেরিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়াতে (Igbo জনগোষ্ঠী, ১৯৬৬) এবং কম্বোডিয়ায় পরিচালিত হতে আমরা দেখি। এইসব জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে লাখ লাখ মানুষকে নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছে করা হয়েছে, অথবা হত্যা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের রাখাইন স্টেট থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে গণহত্যা চালিয়েছিল (Holocaust), তা জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের অতীত সব রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়।

হলোকাস্ট (Holocaust)

জার্মানির নাজি সরকার ১৯৪১-৪৫ সময় সীমায় নিজ দেশের দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হত্যা কনসেনটেশন ক্যাম্পে নিয়ে রাখা, গ্যাস চেম্বারে রেখে হত্যা ইত্যাদি নানা ঘটনা চিহ্নিত হয়ে আছে 'হলোকাস্ট' হিসেবে। হলোকাস্টের ঘটনায় প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা ও ডিপোর্টেশনের জন্য জার্মানরা সারা বিশ্বের কাছে তাদের সম্মান হারিয়েছে। তারা অভিযুক্ত হয়েছে। ইহুদি হত্যার দায়ভার আজও জার্মানি বহন করে চলেছে। ওই সময় ইউরোপে যে ইহুদি জনগোষ্ঠী বসবাস করতো, তার তিনভাগের দুই ভাগই হলোকাস্টের শিকার হয়েছিল। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যেসব অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল, সেইসব জায়গায় 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' তৈরি করে ইহুদি জনগোষ্ঠীতে সেখানে স্থানান্তর করেছিল। যেমন, বলা যেতে পারে Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka ক্যাম্পের কথা। এইসব স্থাপনাগুলো আজকের পোল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত। আজও সেই ক্যাম্পগুলো সেভাবে রেখে দেয়া হয়েছে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে। ওইসব ক্যাম্পে গ্যাস চেম্বারগুলো এখনও আছে, যেখানে ইহুদি নারী পুরুষদের চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হতো।



চিত্র : নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের একটি চিত্র

মূলত জার্মানিতে এডলফ হিটলার চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্তির (৩০ জানুয়ারি ১৯৩৩) পর পরই এই ইহুদি হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এজন্য ২৪ মার্চ (১৯৩৩) একটি আইন *Enabling Act* পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে হিটলারের নেতৃত্বাধীন সরকারকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়, যাতে করে তারা ইহুদি জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করতে পারে, ইহুদিদের কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বয়কট করতে পারে। Nuremberg Laws পাশ করা হয় ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এটা ছিল জাতিগত বিদ্বেষ যুক্ত একটি আইন। এই আইন বলে বিশুদ্ধ জার্মানির পারিবারিক ঐতিহ্য (রক্তের বন্ধন) ও জার্মানির সম্মান বজায় রাখার কথা বলা হয়। ওই আইনবলে কোনো ইহুদি নারী ও পুরুষের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, ৪৫ বছরের নিচে কোনো জার্মান নারীকে ইহুদি প্রতিষ্ঠান চাকরি নিষিদ্ধ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র খাঁটি জার্মান রক্তের উত্তরসূরিরাই জার্মানির নাগরিক হতে পারবেন বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৮ সালের ৯-১০ নভেম্বর জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের ৮ মাস পর সেখানকার সব ইহুদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে দেশটি দখল করে নেয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। ওই সময় পোল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প করে ইহুদিদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ওই সময় নাজি পার্টি (*ন্যাশনাল সোশালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি*, প্রতিষ্ঠিত ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২০, নিষিদ্ধ ১০ অক্টোবর ১৯৪৫) *Eizsatzgruppen* নামে একটি 'ডেথ স্কোয়াড'ও গঠন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোপনে ইহুদিদের হত্যা করা। জার্মান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় প্রায় ১৩ লাখ ইহুদিকে (১৯৪১-১৯৪৫) এরা হত্যা করেছিল বলে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে হিটলার কিংবা নাজি পার্টি কেন ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন, কিংবা কেনই বা তিনি লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে ইতিহাস থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, তরুণ বয়স থেকেই তিনি ছিলেন ইহুদি বিদ্বেষী। পরবর্তীতে তার রাজনৈতিক দর্শনে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধিতা পাওয়া যায়। তিনি উগ্র এক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানিতে ব্যাপক সংখ্যক ইহুদি জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটে রাশিয়া থেকে। হিটলার তাদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন ওইসব ইহুদিরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। হিটলার মনে করতেন ওইসময় বিশ্ব, বিশেষ করে জার্মানির 'খারাপ' অবস্থার জন্য ইহুদিরা দায়ী। ইহুদিরা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়

এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যে তাদের প্রভাব অনেক বেশি–হিটলারের এই চিন্তাধারায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন দু'জন রাজনীতিবিদ- জর্জ রিটার ভন শোনারয়ার (George Jor Von Schonerer) ও কার্ল লুগার (Karl Lueger) শোনারয়ার ছিলেন প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী। তিনি মনে করতেন জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির সমগ্র অঞ্চল বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি মনে করতেন, ইহুদিরা জার্মান নাগরিক হবার যোগ্য নন। অন্যদিকে কার্ল লুগার ছিলেন ভিয়েনার মেয়র, যেখানে হিটলার তার কৈশোর পার করেছিলেন। তার দর্শন থেকেও হিটলার অনেক কিছু শিখেছিলেন। এখানে বলা ভালো, হিটলার কৈশোরে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে চরম বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। বামপন্থিরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে এবং মিউনিখে (ব্যাভেরিয়া প্রদেশ) একটি পিপলস রিপাবলিক গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থিরাও এর বিরোধিতায় নামে এবং অনেক স্থানে সংঘর্ষ হয়। এমনি এক সময়ে হিটলার *জার্মান ওয়ার্কার্স* পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং দলটিতে যোগ দেন। হিটলার ইহুদির জীবাণুর সাথে তুলনা করতেন। তিনি বলতেন, যদি জীবাণুর উৎস ধ্বংস করা না যায়, তাহলে জীবাণু পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস ও উচ্ছেদ করা যাবে না। আর এ কারণেই ইহুদিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যদি গোড়াতেই ধ্বংস করা না যায়, তাহলে ইহুদিদের উচ্ছেদ করা যাবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ইহুদিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রথমে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেন ও পরে ইহুদিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে তাদের হত্যা করেন। হিটলার জাতি ও বর্ণবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিশ্বে দুটি শ্রেণি থাকবে–High বা উচ্চ শ্রেণি আর Law বা নিম্নশ্রেণি। তিনি মনে করতেন জার্মানরা খাঁটি জাতির ও উচ্চ শ্রেণির। আর এই জাতিই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এই জাতির সাথে অন্য জাতির মিশ্রণ হতে পারে না। ইহুদিরা কোনোদিনই জার্মান নাগরিকত্ব পেতে পারে না। হিটলার তার বহুল বিতর্কিত গ্রন্থ Mein Kampf (১৯২৫ সালে লিখিত) এ তার দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বলা ভালো, হিটলার জার্মান নাগরিকদের ভোটে জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৩৩ সালে। এবং ১৯৩৪ সালে তিনি Fuehrer বা নেতা হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তার অতিউগ্রবাদ, ইহুদি বিদ্বেষ, সমাজতন্ত্রবিরোধী ভূমিকা তাকে ইহুদি গণহত্যা বা হলোকাস্ট সংঘটিত করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

এই ইহুদি গণহত্যার জন্য বিশ্বের চোখে জার্মানরা ছিল ঘৃণিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান সরকার চেষ্টা করে এই বদনাম কাঁটিয়ে উঠতে এবং জার্মানির ইমেজ বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হিটলার পরবর্তী যে নীতি তারা গ্রহণ করেছিল, তা আখ্যায়িত করা হয়েছিল *'Entnazifizierung.* অর্থাৎ *Denazification*। উদ্দেশ্য ছিল জার্মান সমাজকে নাজি আদর্শমুক্ত করা। সমাজের প্রতিটি স্তর, অর্থনীতি, বিচার বিভাগ, মিডিয়া এবং সর্বোপরি রাজনীতি থেকে নাজিবাদ অপসারণ করা হয়। নাজি পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়। পটসডাম চুক্তির (Potsdam Agreement)* মধ্যে দিয়েই এই উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল।

'হলোকাস্ট' এর লিগেসি জার্মানি এখনও বহন করে চলেছে। ১৯৫১ সালে ইসরাইল ৫ লাখ ইহুদি, যারা নাজি বাহিনীর হাত থেকে বেঁচেছিলেন, তাদের জন্য ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে। বেঁচে যাওয়া ইহুদি নাগরিক ও তাদের পরিবারবর্গের আবাসনের জন্য এই অর্থ চাওয়া হয়েছিল। ইসরাইলের অভিযোগে ছিল নাজি জার্মানি ইউরোপের ইহুদিদের ৬ বিলিয়ন ডলার অর্থ আত্মসাৎ করেছে। জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে ৮৪৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে পশ্চিম জার্মানি আরো ১২৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে। নাজি জার্মানিতে বিভিন্ন কোম্পানি (বিএমডব্লিউ, ডয়েচে, ব্যাংক, ফোর্ড মটর, সিমেন্স) ইহুদি নাগরিকদের *'forced labor'* বা জোর করে কাজ করতে বাধ্য করেছিল–এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হলে পশ্চিম জার্মান সরকার ২০০০ সালে ৪ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ইউরো পরিশোধ করে। এর বাইরেও জার্মান সরকার *'হলোকাস্ট'* থেকে বেঁচে যাওয়া নাগরিক ও তাদের পরিবারদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু এর পরও জার্মানি পুরো দায়মুক্ত হয়েছে, এটা বলা যাবে না। জার্মানির ইতিহাসের জন্য এটা একটা বড় ক্ষত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হলোকাস্টের ঘটনা জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান ও গণহত্যার ঘটনা বড় ধরনের সংবাদের জন্ম দিলেও, শতাব্দীর শুরুর দিকে আর্মেনিয়ায় গণহত্যা এবং শেষের দিকে আফ্রিকায় হুতু-তুতসি দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গণহত্যা, ইউরোপে বসনিয়া হারজেগোভিনায় মুসলমানদের উচ্ছেদ ও গণহত্যা ইতিহাসে অন্যতম গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সব ক্ষেত্রেই জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছেন।

* ১৯৪৫ সালের আগস্টে স্বাক্ষরিত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জার্মানির চুক্তি।

আর্মেনিয়ান গণহত্যা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আর্মেনিয়ান গণহত্যা (Armenian Genocide) বা *Armenian Holocaust* ইতিহাস গণহত্যা সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনাবলির একটি। এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। ওই সময় তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের শাসকরা তুরস্ক ছাড়িয়েও একটি বিশাল এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৫ লাখ আর্মেনিয়ান জনগোষ্ঠীকে অটোমান শাসকরা তুরস্ক থেকে বিতাড়িত তথা হত্যা করেছিল। এর শুরুটা হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২৪ এপ্রিল। অটোমান শাসকরা কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) যা বর্তমানে ইস্তাম্বুল, সেখান থেকে আর্মেনিয়ানদের বিতাড়ন করে তাদের আঙ্গোরা (Angora, বর্তমানে আঙ্কারা) পাঠানো হয়েছিল। ওই দলে ২৩৫ থেকে ২৭০ জন আর্মেনিয়ান বুদ্ধিজীবী ছিলেন, যাদেরকে পরে খুন করা হয়েছিল। এটাই ছিল জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানের প্রথম প্রকাশ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর্যায়ক্রমে আর্মেনিয়ান শিশু ও মহিলাদের বিভিন্ন কনসেনট্রেশনে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাদের কোনো ধরনের পানি ও খাদ্য ছাড়াই সিরিয়ান মরুভূমিতে হেঁটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পথেই অনেকে মারা যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের শাসকরা মূলত ছিলেন আর্মেনিয়ান বিরোধী। ব্যাপক তুর্কিকরণ, ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আর্মেনিয়ানরা ছিলেন মূলত খ্রিষ্টানধর্মের অনুসারী (ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান, এপোসটলিক)। বলা ভালো আর্মেনিয়ানরা ঐতিহাসিকভাবেই আজকের যে তুরস্ক, সেখানে বসবাস করে আসছিলেন। কনস্টান্টিনোপেল এলাকায় এদের বসতি ছিল বেশি। এই এলাকা যখন তুরস্কের অটোমান শাসনদের নিয়ন্ত্রণে আসে, তখন প্রথমদিকে অটোমান শাসকদের সাথে আর্মেনিয়ানদের সম্পর্ক ভালো ছিল। এদের আর্থিক ভিত্তি অনেক শক্তিশালী ছিল। ধীরে ধীরে আর্মেনিয়ানদের সাথে তুর্কিদের জাতিগত বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। এই জাতিগত বিদ্বেষের কারণে উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রায় এক লাখ আর্মেনিয়ান ইউরোপে অভিবাসী হয়েছিলেন। আর এভাবেই আর্মেনিয়ান বিরোধিতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে আর্মেনিয়ার গণহত্যার জন্ম দিয়েছিল। আর্মেনিয়ান নাগরিকদের বিরুদ্ধে যে গণহত্যা হয়েছিল, তা তুরস্ক কোনোদিন স্বীকার করেনি। গণহত্যা শব্দটির ব্যবহারের ব্যাপারে তুরস্কের বরাবর আপত্তি ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে এসে ৩২টি দেশের সংসদ (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি) এটা স্বীকার করে যে সেখানে গণহত্যা হয়েছিল।

সাবেক যুগোস্লাভিয়া

নব্বই এর দশকের প্রথম দিকে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বসনিয়া-হারজেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া কিংবা কসভোতে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। মোট ৮টি রিপাবলিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে যে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গিয়েছিল। এক এক করে দেশগুলো স্বাধীন হচ্ছিল। এর মধ্য দিয়ে সার্বদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল। সার্বরা তাদের কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য সেখানে বসনিয়ার মুসলমান ও ক্রোটদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছিল। স্রেব্রানিসার হত্যাকাণ্ড ওই সময় ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সার্ব নেতাদের বিচার পর্যন্ত হয়েছিল।

সংকটের শুরু বসনিয়া-হারজেগোভিনায়। এখানে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সার্ব ও ক্রোটরাও এই প্রদেশে বসবাস করতো। এই তিন শ্রেণির জনগোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে গণহত্যায় লিপ্ত হলে সর্বত্র এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে ১৯৯৫ সালের ২১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ডেটন শহরে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। শান্তিচুক্তিতে বসনিয়ার বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানে একটি রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল। একই সাথে সেখানে ন্যাটো বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু গণহত্যার ইতিহাস মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্রেব্রেনিসা হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নব্বই এর দশকে স্রেব্রেনিসা (Srebrenica) হত্যাকাণ্ড ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে সেখানে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত (১৯৯৫) ৮ হাজার বসনিয়ান, অর্থাৎ মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল সার্ব নিয়ন্ত্রিত আর্মি অব রিপাবলিক স্প্রাসকা। রাটকো ম্লাদিস ছিলেন এর নেতা। বসনিয়ায় জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরপূর্ব বসনিয়ার একটি ছোট্ট শহর স্রেব্রেনিয়াকে একটি Safe area হিসেবে ঘোষণা করে এবং ওই অঞ্চলটিকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু জাতিসংঘ ওই সময় অবরুদ্ধ স্রেব্রেনিসার শিশু, মহিলা ও কিশোরদের রক্ষা করতে পারেনি। জাতিসংঘের নির্দেশ উপেক্ষা করে আর্মি অব রিপাবলিক স্প্রাসকা সেখানে গণহত্যা চালায়। ২০০৫ সালে তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান স্রেব্রেনিসা হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আর ২০০৪ সালে International

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ও ২০০৭ সালে International court of Justice সেব্রেনিসা হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। ২০১৩ সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট টমিস্লাভ নিকোলিক সেব্রেনিসার হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চাইলেও এটাকে Genocide বা গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করে নেননি। ২০১৫ সালে রাশিয়া জাতিসংঘে সেব্রেনিসা হত্যাকাণ্ড গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আনীত একটি প্রস্তাবে ভেটো দেয়। আর ২০১৭ সালে রাটকো ম্লাদিসকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করে ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

কসভো

আমরা কসভোর গণহত্যা নিয়েও আলোচনা করতে পারি। বসনিয়া-হারজেগোভিনার ঘটনাবলির পাশাপাশি কসোভোর ঘটনাবলি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ পেয়েছিল। যুগোস্লাভিয়ার সার্বীয় নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বসনিয়ার সার্বরা যেমনি সেখানকার মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতিতে কসোভোতে সার্বিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী সেখানকার আলবেনীয় মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল। এই গণহত্যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালের প্রথম দিক থেকে। সার্বীয় নিরাপত্তা বাহিনী আলবেনীয় মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করেছিল। তাদের বাধ্য করেছিল দেশান্তরিত হতে। পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যোগ হয়েছিল রাসাক এলাকার ঘটনা। সেখানে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে ৪৫ জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। রাসাক এলাকার ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে হেগের যুগোস্লাভিয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ঘটনাটি তদন্তের নির্দেশ দেয়। আদালত কৌসুলি লুইস আরাবুককে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিলেও যুগোস্লাভিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী কৌসুলি আরাবুককে রাসাক গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে বেলগ্রেডে গিয়েছিলেন দু'জন সিনিয়র ন্যাটো জেনারেল– জেনারেল ক্লার্ক ও জেনারেল নরম্যান। সার্ব নেতা মিলোসেভিচের সাথে তাদের দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘণ্টা আলাপ হয়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এর পর ন্যাটোর বিমান হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

কসোভোতে সার্বীয় অবস্থানের উপর ন্যাটোর বিমান হামলার ঘটনা এই প্রথম ছিল না। অক্টোবর ('৯৮) মাসের প্রথম দিকেও এরকম একটি সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল। সেদিন বেলগ্রেডে ছুটে গিয়েছিলেন মার্কিন মধ্যস্থতাকারী রিচার্ড হলব্রুক। ন্যাটোর বিমানগুলো সেদিন প্রস্তুত ছিল বিমান হামলা চালানোর জন্য। শুধু অপেক্ষা করছিল হলব্রুকের একটি নির্দেশের জন্য। হলব্রুক অবশ্য

সেদিন সফল হয়েছিলেন। সেদিন যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে কসোভো থেকে সার্বীয় পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ছিল। সেই সাথে ছিল দু হাজার আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ, যা তদারকি করে ওএসসিই বা *অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ*। একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসনও গড়ে তোলা হয়। সমঝোতার পর অক্টোবর মাসে লোক দেখানো কিছু সার্বীয় নিরাপত্তারক্ষী সেখানে থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা পরে থেমে যায়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক কিংবা কসোভোতে একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল পরে।

রুয়ান্ডা

রুয়ান্ডার গণহত্যা ব্যাপকভাবে আলোচিত। আফ্রিকার একটি ছোট দেশ রুয়ান্ডা। মাত্র ২৬ হাজার ৩৩৮ কিলোমিটারের এই দেশটি আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের ছয় ভাগের এক ভাগ। লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬১ লাখ ৬৭ হাজার। ছোট্ট এই দেশটির উত্তরে উগান্ডা, পূর্বে তানজানিয়া, দক্ষিণে বুরুন্ডি, আর পশ্চিমে জায়ার, বর্তমানে কঙ্গো। আন্তর্জাতিক রাজনীতি তো দূরের কথা, আফ্রিকার রাজনীতিতেও এই দেশটির তেমন কোনো ভূমিকা বা অবদান ছিল না। অথচ দেশটি ১৯৯৪ সালে অন্যতম আন্তর্জাতিক সংবাদে পরিণত হয়। ৭ এপ্রিল ('৯৪) থেকে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলে এক উপজাতির বিরুদ্ধে আরেক উপজাতির। দুটো উপজাতির নাম হুতু আর তুতসি। কিন্তু এ যুদ্ধের চরিত্র ছিল ভিন্ন। এখানে ক্ষমতাসীন হুতুদের সাথে বিদ্রোহীদের যুদ্ধের পাশাপাশি চলেছিল পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড। হুতুরা হত্যা করেছে তুতসিদের, কিংবা তুতসিরা হত্যা করেছে হুতুদের। সে হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষও যেন এক আনন্দ উৎসবে মেতেছিল রুয়ান্ডায়। জাতিগত দ্বন্দ্বের এই ভয়াবহতা আর অন্য কোনো দেশে এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। এভাবে হত্যাযজ্ঞে কেউ কোথাও দেখেনি। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। স্কুলের শিশুরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। ভিক্টোরিয়া লেকে হাজার হাজার লাশ ভাসতে দেখা গেছে। উগান্ডা কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার লাশ গণকবরে দাফন করেছে। মৃত্যুর পর যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হয়, এদের ভাগ্যে তা জোটেনি। রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আফ্রিকা সবচেয়ে বড় ধরনের এক উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। লাখ লাখ মানুষ, এদের কেউ হুতু, কেউ তুতসি, পার্শ্ববর্তী উগান্ডা, তানজানিয়া ও জায়ারে আশ্রয় নেয়।

রুয়ান্ডার এই সমস্যার জন্ম হয়েছিল গত ৭ এপ্রিলে ('৯৪)। ওইদিন রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট একই বিমানে করে তানজানিয়া থেকে রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে ফিরছিলেন। কিন্তু কিগালিতে বিমান অবতরণ করার আগেই রকেট হামলায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এতে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট জেনারেল হাবিয়ারিমানা ও বুরুন্ডির প্রেসিডেন্ট সাইপ্রয়েন নাটারিয়ামিরা মারা যান। ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই থেকে হাবিয়ারিমানা দেশটি শাসন করে আসছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং দেশটিকে মার্কসবাদী লেনিনবাদী আদর্শে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তার দলের নাম ছিল *Movement Revolutionnire national pour de Developpment* (National Revolutionary Movement for Development)। ১৯৭৫ সালে তিনি এটি গঠন করেন। ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিলও ছিল, যা পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করতো তবে হাবিয়ারিমানার মৃত্যুর জন্য কারা দায়ী এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তৎকালীন সরকার অবশ্য বিদ্রোহী *প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্টকে* দায়ী করেছিল, কিন্তু ফ্রন্ট তা অস্বীকার করেছিল। এখানে বলে রাখা ভালো হাবিয়ারিমানা প্রতিনিধিত্ব করতেন হুতু উপজাতির। রুয়ান্ডার মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৫ ভাগ হচ্ছে হুতু উপজাতির, আর শতকরা ১৪ ভাগ হচ্ছে তুতসি উপজাতির। *প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট* মূলত তুতসি উপজাতি নিয়ন্ত্রিত। প্রেসিডেন্ট হাবিয়ারিমানার মৃত্যুর পর সারা দেশে প্রতিহিংসার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্টের গার্ড বাহিনী দেশ জুড়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা মহিলা প্রধানমন্ত্রী অগোথো গিরিমালাকেও হত্যা করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বেশ কয়েকজন বেলজীয় সৈন্য এবং ধর্মযাজকও এদের হাতে মারা যান।

রুয়ান্ডায় এই হত্যাযজ্ঞের পেছনে কাজ করেছিল কর্তৃত্ব করার প্রবণতাটি। হুতু ও তুতসি উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের ইতিহাস শত বছরের পুরানো। পার্শ্ববর্তী দেশ বুরুন্ডিতেও হুতু ও তুতসি উপজাতীয়রা ছড়িয়ে আছে। এক সময় এই দেশ দুটি বৃহত্তর ইস্ট আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দেশ দুটির এক সাথে নাম ছিল তখন রুয়ান্ডা উরুন্ডি। উরুন্ডি পরে বুরুন্ডি নামে আত্মপ্রকাশ করে। রুয়ান্ডা স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬২ সালের ১ জুলাই। এর আগে দেশটি তুতসি রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুতসি রাজতন্ত্র ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকেই দেশটি শাসন করে আসছিল। অন্যদিকে বুরুন্ডিও স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬২ সালে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বুরুন্ডিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৪-৮৫ সালে দেশটি জার্মান কলোনিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে রুয়ান্ডা জার্মানরা দখল করে নিয়েছিল ১৮৯৯ সালে। ১৯১৬ সালে জার্মানরা তাদের কলোনি ছেড়ে দেয়। জাতিপুঞ্জ তখন দেশটির শাসনভার বেলজিয়ামের হাতে ছেড়ে দেয়। সেটা ছিল ১৯২৩ সাল। বুরুন্ডি স্বাধীনতা লাভ করার পরও কিছুদিন রাজতন্ত্র অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে রুয়ান্ডায় ১৯৬১ সালের ২৮ জানুয়ারি তুতসি রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। ইতিহাস বলে এই দুটি দেশের আদি জনগোষ্ঠী হচ্ছে পিগমি সম্প্রদায়ের। আজকে হুতু নামে পরিচিত বান্টু ভাষাভাষী উপজাতির লোকরা এক সময় কঙ্গো অববাহিকা থেকে এদেশে এসেছিল। তারা পিগমীদের গভীর বনে তাড়িয়ে দেয়। প্রায় তিনশ' বছর আগে ওয়াতুতসি বা বাওয়াতুতসি, যা কি না আজ তুতসি নামে পরিচিতি পেয়েছে, এরা এসেছিলেন ইথিওপিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে। এরা হুতুদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে হুতুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তুতসিরা মেধাসম্পন্ন। সেনাবাহিনীতে ছিল এদের প্রাধান্য। যুগ যুগ ধরে কর্তৃত্ব করার এই প্রবণতা সেখানে চলে আসছে। হুতুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট বরাবরই তাদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে অর্থনীতি, সেনাবাহিনী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো তুতসিরা। অতীতে এই দুই উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্বে রুয়ান্ডায় অনেক রুক্ত ঝরেছে। সাময়িকভাবে দুই উপজাতির মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলেও, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কখনও। অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্রের মতো রুয়ান্ডায়ও কোনো একক জাতিসত্তার জন্ম হয়নি। একটি সাংবিধানিক নীতিমালা এদের জন্য তৈরি করা হয়নি। সুতরাং যখনই কোনো একটি ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে একটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তখনই এটা পরিণত হয়েছে জাতিগত দ্বন্দ্বে তথা স্বার্থসংঘাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হুতুরা তাদের অধিকার ও প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে চাইছে। এখানেই সৃষ্টি হয়েছে সমস্যার। তুতসিরা চেয়েছে তাদের দীর্ঘদিনের প্রাধান্য, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখতে। রুয়ান্ডার প্যাট্রিওটিক ফ্রন্ট পরে কিগালিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তারা একজন হুতুকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রায় দু'লাখ লোক হত্যার মধ্য দিয়ে তুতসি ও হুতু উপজাতির মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস করার যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সহজে কেটে যাবে না। দীর্ঘ ৩শ' বছরের বৈরিতা সহজে মুছে যাবার নয়। সাধারণ তুতসি ও হুতুদের মধ্যে একে অপরকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করার প্রবণতা এখনো আছে।

বুরুন্ডি

রুয়ান্ডার পাশাপাশি বুরুন্ডিতেও তুতসি আর হুতুদের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জাতিগত দ্বন্দ্বের রেশ ধরে ২৫ জুলাই ('৯৬) সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। আর এই অভ্যুত্থানের নায়ক

ছিলেন ৪৬ বছর বয়স্ক মেজর পিয়েরে বুয়োয়া। সংখ্যালঘু তুতসি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন বুয়োয়া। এর আগেও তিনি বুরুন্ডির ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৮৭ সালে এমনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেছিলেন তিনি। তারই তত্ত্বাবধানে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে দেশটিতে গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা হারান তিনি। তিন বছরের মাথায় সেই তিনিই আবার গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে বুরুন্ডির অবস্থা পার্শ্ববর্তী দেশ রুয়ান্ডার মতো। সমস্যাও তাই এক। অর্থাৎ হুতু-তুতসি জাতিগত বিরোধ। বুরুন্ডির ৬০ লাখ জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশই হুতু এবং ১৪ শতাংশ তুতসি সম্প্রদায়ভুক্ত। মাত্র ১৪ শতাংশ তুতসি হলেও এদের ক্ষমতার দাপটই বেশি। বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে তুতসিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সরকারেও তাদের প্রাধান্য। অর্থাৎ তারাই ক্ষমতাসীন জাতি। সংখ্যাগুরু হুতুরা এটা মেনে নিতে পারেনি কখনো। ফলে জাতিগত দাঙ্গাই দেশটির চরিত্র হয়ে ওঠে। ১৯৯৩-৯৪ সময় সীমায় বুরুন্ডিতে সরকার ও বিদ্রোহী হুতুদের মধ্যে সংঘর্ষে দেড় লাখ লোক নিহত হয়েছিল। আরও পিছনে দিকে তাকালেও কেবল হত্যা এবং রক্তারক্তির ইতিহাসই চোখে পড়বে। ২০০০ এবং ২০০৪ সালেও সেখানে গণহত্যা হয়েছে।

১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভ করে বুরুন্ডি। স্বাধীনতার পর থেকেই সংখ্যাগুরু হুতুরা তুতসিদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। তুতসি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে হুতুদের বিদ্রোহই দেশটিকে ঠেলে দিয়ে গৃহযুদ্ধের দিকে। ১৯৭২-৭৩ সালে হুতুরা এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনায় দেড় লাখ হুতু নিহত হয়েছিল এবং দশ হাজার তুতসি প্রাণ হারিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তানজানিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এক লাখ হুতু। তবু মাঝে মধ্যেই জাতিগত সমঝোতার উদ্যোগ ছিল, ছিল পারস্পরিক সহ-অবস্থান বজায় রেখে দেশ পরিচালনার উদ্যোগ। কিন্তু বারবার সে উদ্যোগও পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে দু পক্ষেরই অনমনীয়তার কারণে। সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল একটি ১৯৯৩ সালের জুন মাসে। তুতসি নিয়ন্ত্রিত বুয়োয়া সরকার ওইসময় দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিলে হুতু সম্প্রদায়ের নেতা মেলশিয়ো নদাদায়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সেনাবাহিনী তুতসিদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা সেনা সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালের ২১ অক্টোবর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হত্যা করে হুতু রাষ্ট্রপতিকে। ফলে নতুন করে দাঙ্গার বিস্তৃতি ঘটেছিল, হত্যাকাণ্ড ও জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে হুতু ও

তুতসিদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী হুতু প্রেসিডেন্ট এবং তুতসি প্রধানমন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের ওপর দেশ শাসনের ভার পড়ে। কিন্তু তবু থেমে থাকেনি দাঙ্গা। প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন সন্দেহ, সন্ত্রাস, হত্যাপ্রবণতা জাতি দুটির মধ্যে জেগে উঠত। এমন কোন দিন ছিল না, যেদিন কোনো না কোনো পক্ষের কেউ কেউ মারা না যেত। গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা এবং নিহতের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। দশ বছর আগেও গণহত্যার খবর আমরা পেয়েছি।

জায়ার

রুয়ান্ডা-বুরুন্ডির জাতিগত দ্বন্দ্ব ও গণহত্যার সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ জায়ারের একটি যোগসূত্র আছে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে সেখানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। বিদ্রোহী *অ্যালায়েন্স অব ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস ফর দি লিবারেশন অব কঙ্গো-জায়ার* (এএফডিএল) এর নেতা লরেন কাবিলার নেতৃত্বে বিদ্রোহী বাহিনী ক্ষমতাসীন মবুতু সেসে সেকোকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

জায়েরের পার্শ্ববর্তী দেশ রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির জাতিগত দ্বন্দ্বের রেশ ধরে জায়ারের এই বিদ্রোহ সংগঠিত হলেও, প্রেসিডেন্ট মবুতুর স্বেচ্ছাচারিতাও অনেক অংশে দায়ী। মবুতু দেশটি শাসন করে আসছিলেন দীর্ঘ প্রায় ৩২ বছর ধরে। মবুতুর একদলীয় শাসনের ফলশ্রুতিতে দেশটিতে বাহ্যত কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। আফ্রিকার অন্যান্য দেশে যেখানে একে একে একদলীয় শাসনের পতন ঘটছিল, সেখানে ব্যতিক্রম ছিল শুধু জায়ার। ১৯৬০ সালে দেশটি বেলজিয়ামের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে কঙ্গো নামে। আর ১৯৭১ সালে দেশটির কঙ্গো নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় জায়ার। ১৯০৮ সালে দেশটি বেলজিয়ামের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। মবুতু দেশটির স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বৈরশাসন, দুর্নীতি দেশটিকে আজ ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করেছে। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশটির দারিদ্র দূর হয়নি। ফলে মানুষের মাঝে হতাশা বাড়ছিল। আর এই হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিদ্রোহীদের প্রতি জনগণের সমর্থনের মধ্য দিয়ে।

তবে এই বিদ্রোহের আরো একটি প্রেক্ষাপট আছে। সেটি হচ্ছে রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির জাতিগত দ্বন্দ্বের রেশ। এই দুটো দেশে হুতু ও তুতসি জাতির মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের খবর ১৯৯৪ সালে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কয়েক লাখ মানুষ এই জাতিগত দ্বন্দ্বে প্রাণ হারায়। ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রেশ ধরে লাখ লাখ মানুষ বিশেষ করে হুতু উপজাতির লোকেরা পূর্ব

জায়ারে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল হাজার হাজার শরণার্থী শিবির। পূর্ব জায়ারে ঐতিহাসিকভাবেই তুতসিরা বসবাস করে আসছিল। এখানেও জাতিগত দ্বন্দ্বের রেশ ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব জায়ারের তুতসিরাও আলাদা সংগঠনের ব্যানারে সংঘটিত হয়।

মবুতু সরকার অভিযোগ করেছিল যে, বিদ্রোহীরা রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির তুতসি নিয়ন্ত্রিত সরকারের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র পেয়েছে। অন্যদিকে বিদ্রোহীরা অভিযোগ করেছিল যে, মবুতু সরকার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া হুতুদের নিয়ে একটি গেরিলা সংগঠন গড়ে তুলেছিল, যারা পূর্ব জায়ারের তুতসিদের উপর অতিক্রমণ চালিয়েছিল এবং একই সাথে রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির উপর গুপ্ত হামলা চালিয়েছিল। জায়ারের বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা একটি উদ্যোগ নিলেও তা কোনো সমাধান বয়ে আনতে পারেনি। মবুতু ছিলেন অসুস্থ। কোনো বিকল্প নেতৃত্ব তিনি তৈরি করেননি। সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে কোনো বেতন পাচ্ছিলেন না।

এমনি এক পরিস্থিতিতে লরা কাবিলা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তারা দেশটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন *ডেমোক্র্যোটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো*। কিন্তু তার দেশে বিপুলসংখ্যক তুতসি ও রুয়ান্ডা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সেখানে দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধে (১৯৯৮-২০০৩) সংঘটিত হয়। ওই যুদ্ধে ৯টি আফ্রিকান দেশ ও ২০টি সশস্ত্র গ্রুপ জড়িত হয়ে পড়ে। এতে করে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায় ২০০১ সালের জানুয়ারিতে লরা কাবিলা তার নিজ দেহরক্ষী দ্বারা নিহত হন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে জোসেফ কাবিলা তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ২০১৯ সালে পর্যন্ত সে দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গৃহযুদ্ধে জর্জরিত দেশটি থেকে ৬ লাখ নাগরিক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। নারী নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ ওঠে দেশটির বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতেও অভিযোগে ওঠে কঙ্গোর বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি ও জাতিগত দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে দেশটি এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইরানি বিপ্লব

The state Islamic Republic-serves the revolution, and the revolution has ambitions far beyond the boundaries of the state. It is an ideological challenge that needs to be understood, absorbed and fully appreciated. How to engage, contain or confront, it is a matter for policymakers to choose. But what should not be in doubt is the nature of the revolution itself.

Tony Blair Institute for Global Change, 2019

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিয়া ধর্ম নির্ভর একটি বিপ্লব, যা ইরানে সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। এটি সনাতন বিপ্লবের যে চরিত্র, তা বদলে দিয়েছিল। মার্কসবাদী আদর্শকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব রাশিয়ায় সম্পন্ন হয়েছিল ১৯১৭ সালে। ওই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে সমাজ পরিবর্তনে শ্রমজীবী মানুষ একটি ফ্যাক্টর। তারা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে এবং রাশিয়াতে তা প্রমাণিতও হয়েছিল। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল কৃষকদের সংগঠিত করে। ইরান বিপ্লব নতুন একটি মাত্রা পেয়েছিল। শিয়া ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয়ভাবে এই বিপ্লবকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে শিয়া ধর্মের স্পিরিট ও শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেনির আদর্শকে ধারণ করে এই বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল এবং বিপ্লবের পর ইরানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। একুশ শতকে এসে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে একটা রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায়–এটা ইরানি নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করেছেন। ইসরাইলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ইহুদিধর্ম একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শতকরা ৭৪.১ ভাগ মানুষ ইহুদিধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু ইসরাইলকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা যাবে না, যে অর্থে ইরান একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। স্টেফেন গোল্ডস্টেইন (Stephen Goldstein) তার একটি প্রবন্ধে (Israel : A

Secular or a Religious State) লিখেছেন, 'Israel is neither a religious nor a seceular state'। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না ইসরাইলে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। তবে ধর্ম এখানে একটি ফ্যাক্টর। কিন্তু ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের বিষয়টি একটু ভিন্ন। ইরানে শিয়া মতাদর্শ, ইমাম খোমেনির চিন্তাধারা বিপ্লবকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে দিয়েছিল। ইরানের ইতিহাস বলে ইরানের শিয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বরাবরই ইরানি সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। ধর্মীয় নেতারাই মূলত ইরানের মূল চালিকাশক্তি, যা রেজা শাহের আমলেই ছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে–ইরানে শাহ বিরোধী যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাতে ছিল, কিন্তু তাতে নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল শিয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি হয়ে উঠেছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। রেজা শাহের শাসন আমলে তিনি ইরানকে পশ্চিমা ঘেঁষা করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রচুর ইরানি, যারা ইউরোপ তথা যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম হলো না ইরানে? তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করে ৪টি বামপন্থি তথা মার্কসবাদী সংগঠনের কথা জানা যায়, যারা বিপ্লবের পূর্বে সক্রিয় ছিল। এগুলো হচ্ছে the Fedai, the Pro-Tudeh Fedai Munshib, the Islamic Mujahedin এবং *Marxist Mujahedin*। এইসব সংগঠন সশস্ত্র সংগ্রাম লিপ্ত ছিল এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রেজা শাহকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। এর বাইরে *Tudeh* Party'র অস্তিত্ব ছিল। সোভিয়েত সমর্থিত Tudeh পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল না। সনাতন একটি কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে ইরানে বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর ইরানে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর, এইসব কমিউনিস্ট সংগঠনের অস্তিত্ব তেমন একটা নেই। এটা ঠিক ইরানে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই ইসলামিক ভাবধারায় বিশ্বাসী। এদের প্রতিনিধিত্বও রয়েছে ইরানের পার্লামেন্টে (Majles-e Showra ye Eslami-Islamic Consultative Assembly)। ২৯০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের প্রতিনিধিত্ব অনেকটা এরকম : PCR (১২০ সদস্য) PGC* (৮৬), PV (১০), নিরপেক্ষ (৬৬) ও সংখ্যালঘু (৫)। এরা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। বলা ভালো, ইরানের সংবিধান

* PCR : Islamic Coalition Party, PGC : Principlists Grand Coalition, PV : Voice of Nations

অনুযায়ী (১৯৭৯ সালের ২৪ অক্টোবরে গৃহীত) একজন প্রেসিডেন্ট থাকলেও, সর্বোচ্চ ক্ষমতা ইরানের সর্বোচ্চ নেতার (Supreme Leader) হাতে ন্যস্ত। সরকার রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানকে আলাদা করেছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সরকার প্রধান। Assembly of Experts সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত করেন। রুহুল্লা খোমেনির মৃত্যুর পর এরা আলি খামেনিইকে দেশের সুপ্রিম লিডার বা সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত করেছিলেন ১৯৮৯ সালের ৪ জুন। Assembly of Experts Majles-e Khobregan-e-rahbari-এর সদস্য সংখ্যা ৮৮ এবং সবাই মূলত ধর্মীয় শীর্ষ নেতা। এদের মনোনয়ন একটি Guardian Council কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। এদের সময়কাল ৮ বছর। কোমে (Qom) অবস্থিত ধর্মীয় স্কুলগুলোই মূলত এই Assembly of Experts কে নিয়ন্ত্রণ করে। সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সর্বোচ্চ নেতাই হচ্ছেন ইরানের মূল ব্যক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করেই ইরানের রাজনীতি, সমাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। এখানে কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। রুহুল্লা খোমোনি এ পদে ছিলেন, এখন আছেন খামেনিই।

এখানে বলা ভালো, ইরানে ধর্মীয় স্কুলগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। এরা রাজনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবেও ইরানের সমাজে আগে থেকেই একটি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে আসছে। ৭টি ধর্মীয় স্থান আছে ইরানে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতাদের মাজার আছে, আর ওইসব মাজারকে কেন্দ্র করে রয়েছে ধর্মীয় স্কুল। ইরানে ইসলামিক আন্দোলন তথা একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এইসব ধর্মীয় স্কুল একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করে আসছে। এগুলো নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত: ১. Mashhad, 2. Qom, 3. Shiraz, 4. Yazd, 5. Isfahan, 6. Tehran, 7. Chakchok। এইসব শহরে প্রতিটি স্থানে শিয়া ধর্মীয় নেতাদের মাজার রয়েছে আর ওইসব মাজার শুধুমাত্র এক একটি ধর্মীয় স্থানেই পরিণত হয়নি, বরং মাজারগুলোকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতারা একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। যেমন, বলা যেতে পারে প্রয়াত রুহুল্লা খোমোনির কথা। তিনি কোম (Qom) থেকে এসেছিলেন। তার জীবন, শিক্ষা, অধ্যয়ন সবই ছিল কোমে। বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা খামেনিইও কোম থেকে এসেছেন এবং তিনি সেখানে খোমোনির ছাত্র ছিলেন।

আগেই উল্লেখ করেছি ইরানি বিপ্লব সংগঠিত করার ব্যাপারে এইসব ধর্মীয় স্কুল ও ধর্মীয় নেতারা একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সামাজিকভাবে এদের একটা বড় গ্রহণযোগ্যতাও আছে। ইরানের সাথে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর পার্থক্য এখানেই যে, ইরানের ধর্মীয় নেতারা সামাজিকভাবে যত বেশি গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত, অন্যান্য দেশে এমনটি নেই। মিশর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, এমনকি সৌদি আরবের মতো সুন্নি প্রধান দেশগুলোতে মাদ্রাসা, মক্তব বা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের সাথে ইরানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনা করা যাবে না। এ কারণেই যেকোনো পরিবর্তনে ইরানের ধর্মীয় নেতারা যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন, সুন্নি প্রধান দেশগুলোর ধর্মীয় নেতারা সেই ভূমিকা পালন করতে পারেননি।

এখানে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। এর একটি ধর্মীয় দিক আছে, সেই সাথে আছে রাজনৈতিক দিকও। ইসলাম ধর্মে শিয়া-সুন্নি বলে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পর এই শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সময়টা ৬৩২ সাল। দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছিল নেতৃত্বের প্রশ্নে, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর পর কার হাতে নেতৃত্ব থাকবে, দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকেই। সুন্নিরা মূলত *আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত* নামে পরিচিত। সুন্নি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ 'সুন্নাহ' থেকে। সুন্নাহ শব্দের অর্থ প্রথা, বিধান বা আচরণ। সাহাবিরা হজরত মুহাম্মদ (সা.) বাণী ও তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেন বিধায় তাঁর অনুসারীরা সুন্নি নামে পরিচিত। অন্যদিকে শিয়া শব্দটির অর্থ দল বা অনুসারী।

হজরত আলীর অনুসারীরাই *শিয়াত-ই-আলী* বা আলীর দল নামে পরিচিত। হজরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচনকালে (অর্থাৎ যারা তাঁর মৃত্যুর পর ওই সময়কার রাষ্ট্রপরিচালনা করবে) একদল লোক হযরত আলী (রা.)-কে সমর্থন করেন। তিনি ছিলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর চাচাতো ভাই এর ছেলে ও মেয়ে ফাতেমার স্বামী। তিনি ছিলেন চতুর্থ খলিফা (৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)। প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবুবকর, দ্বিতীয়জন হজরত ওমর, তৃতীয়জন হজরত ওসমান (রা.) এবং চতুর্থজন ছিলেন আলী। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলী (রা.) আততায়ীর হাতে শহিদ হলে শিয়া আন্দোলন জোরদার হয়। এর কিছু পরে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হুসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী কর্তৃক নৃশংশভাবে শহিদ হলে শিয়া আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং সেই থেকে শিয়া মতবাদ বিকশিত হতে থাকে। রাজনৈতিকভাবেও শিয়া সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর

১৬০ কোটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাঝে শতকরা ৮৫ ভাগই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে আরো কিছু তথ্য দেওয়া প্রয়োজন। হজরত আলী (রা.) ও হজরত হুসাইন (রা.)'র মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর প্রাচীন সাফাভিদ (Safavid Empire, 1501-1736) সাম্রাজ্য (আজকে যা ইরান) ইরাকের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ইরাক বাহ্যত আরবীয় সংস্কৃতি ধারণ করে, আর ইরান পারস্য সংস্কৃতি। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের বৈরিতা তৈরি হয়েছিল, যা সাদ্দাম হোসেনের সময়কাল পর্যন্ত ছিল। পাঠক, ইরান-ইরাক ৮ বছর যুদ্ধের কথা (১৯৮০-১৯৮৮) স্মরণ করতে পারেন। ইরাকি সুন্নিদের ভয় ছিল ইরাকের শিয়ারা ইরানি শিয়া নেতৃত্ব দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। সাফাভিদ সাম্রাজ্যই ইরানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে শিয়া ধর্মকে প্রবর্তন করেছিল। ১৫০১ সালে সাফাভিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে ইরানে সুন্নি ধর্মের প্রচলন ছিল। এই শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব এই অঞ্চলের রাজনীতির জন্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ২০১৪ সালে আইএস এর উত্থানের মধ্য দিয়ে। ইরাকের ও সিরিয়ার একটি অংশ দখল করে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস এর উত্থান ঘটেছিল। আইএস ছিল সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে ওই সময় ইরাকের শিয়া নেতৃত্ব আইএস দমনে ইরানের সহযোগিতা চেয়েছিল। ইরান সেই সহযোগিতা দিয়েছিল। বলা হয় প্রয়াত মেজর জেনারেল সুলাইমানি (মৃত্যু ৩ জানুয়ারি ২০২০) আইএস উৎখাতে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ইরানের সাবেক শাসক রেজা শাহ পাহলেভীর অত্যাচার, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা, তথাকথিত 'শ্বেত বিপ্লব' বা White Revolution-এর নামে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রবর্তন ইত্যাদি নানা কারণে ইরানি বিপ্লবের জন্ম হলেও, এই বিপ্লবের নানা দিকও রয়েছে। এরফান্দ আব্রাহামিয়ান (Ervand Abrahamian) এর লেখা *A History of Modern Iran* (২০০৮) এ তিনি ইরান বিপ্লবকে আখ্যায়িত করেন *'A complex combination of nationalism, political populism and Shia Islamic Religious radicalism* (p. 141)। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, পপুলিজম বা সস্তা জনপ্রিয়তা, এবং শিয়া ইসলামের উগ্রবাদের সমন্বয়েই এই বিপ্লবের জন্ম। Ervand Abrahamian হচ্ছেন ইরানি আমেরিকান। তাকে গণ্য করা হয় আধুনিক ইরানের শীর্ষ একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে। তিনি নিউইয়র্কের বারুজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। অধ্যাপক এরফান্দ আব্রাহামিয়ান মনে করেন ইরানের জাতীয়তাবোধ, শিয়া জাতি হিসেবে তাদের ঐতিহ্য ও সংগ্রাম, শিয়া মতাদর্শ, আত্মত্যাগ এবং সেই সাথে এক ধরনের দক্ষিণপন্থি

প্রবণতা, যা 'পপুলিজম' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত—এই বিষয়গুলো ইরানি ইসলামিক বিপ্লবকে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিল। ইতিহাস বলে পারস্যীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাস অনেক পুরানো। ৬ষ্ঠ শতাব্দী BCE (Before Common Era, অথবা BC-Before Christ) এর *Achaemenid* সাম্রাজ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর পাহলেভী সাম্রাজ্য পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫৫০-৩৩০ BC থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত যে সময়সীমা, সেই সময়সীমায় পারসীয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সাফাভিদ সাম্রাজ্যের (Safavid Dynasty, 501-1736 AD) কথা ইতিহাসে আছে, যখন ইরান বা তখনকার সময়ে পারস্য একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে পারস্য বা আজকের ইরানের একটা ঐতিহাসিক জাতিগত ঐতিহ্য রয়েছে। এই জাতিগত ঐতিহ্যই ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের একটা বড় অংশ। সেই সাথে রয়েছে শিয়া মতাদর্শ, যা ইরানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। ইরানি বিপ্লবে এই মতাদর্শ ছিল অন্যতম একটি ফ্যাক্টর। শিয়া নেতৃত্বের জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় কমিটমেন্ট, দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়, শক্ত নেতৃত্ব বিপ্লবকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করেছিল। এর সাথে যোগ হয়েছিল *'পপুলিজম'* এর কনসেপ্ট, বা *পপুলিজম* এর ধারণা। *'পপুলিজম'* এর ধারণা এখন সমাজতন্ত্র পরবর্তী ইউরোপে ব্যাপকভাবে লক্ষ করি। এই *পপুলিজম* এর সাথে জড়িয়ে আছে দক্ষিণপন্থি প্রবণতা ও সস্তা জনপ্রিয়তা। ইরানি বিপ্লবের আগে খোমেনির সাম্রাজ্যবাদ তথা পশ্চিমা সংস্কৃতি বিরোধী ভূমিকা, সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলা, ইরানি ঐতিহ্যকে তুলে ধরা তার জনপ্রিয়তাকে আকাশচুম্বী করে তুলেছিল। বিকল্প কোনো নেতৃত্ব ওই সময় ইরানে ছিল না। এমনকি শাহের আমলকে মানুষ তুলনা করতো 'ধনী ও সুবিধাবাদীদের' সমাজ হিসেবে। অর্থাৎ ওই সময় শাহ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা আর্থিকভাবে আরো ধনী হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিকদের তথা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। এ কারণেই সাধারণ মানুষ খোমেনির ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিল ও তার প্রতি আস্থা রেখেছিল। এখানে ইসলামিক রেভ্যুলুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। *আইআরজিসি* ছিল বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি। এই গার্ড বাহিনী মূলত খোমেনির আদর্শে তৈরি হয়েছিল ও তার নির্দেশে পরিচালিত হতো। এখন পরিচালিত হয় সর্বোচ্চ নেতা খামেনাইর নির্দেশ। এরা তরুণ শক্তি নির্ভর। শিয়া নেতৃত্বের র‍্যাডিকাল অংশ নিয়েই এই গার্ড বাহিনী গঠিত হয়েছে। বিপ্লব পরবর্তী ইরানে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের ঐক্যবদ্ধ করতে এই গার্ড বাহিনী একটি বড় ভূমিকা পালন করে আসছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটাস বার্নাড লুইস (Bernard Lewis) এর মতে, 'The Iranian revolution expresses itself in the lauguage of Islam, that is to say, as a democratic movement with a religious leadership, a religiously formulated critique of the old order, and religiously expressed plans for the new. Muslim revolutionaries look to the birth of Islam as their model, and see themselves as engaged in a stuggle against Paganism, oppression and empire (Islamic Revolution)। অধ্যাপক বার্নাড লুইসের ব্যাখ্যার সাথে হয়তো অনেকে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। ইরানি বিপ্লব আদৌ গণতান্ত্রিক ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে রেজা শাহ পাহলেভী জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না, তার সাথে জনগণের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু জনগণের ভোটে তিনি উৎখাত হননি। একটি আন্দোলন, যার চরিত্র ছিল ইসলামিক, শুধু শাহকে উৎখাতই করেনি, বরং ইরানি সমাজকেই বদলে দিয়েছিল। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এ অঞ্চলে এক সময়ের মিত্র ইরানকে হারিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ প্রসঙ্গে একটি নিউজপোর্টাল মন্তব্য করেছে এভাবে, 'The **Iranian revolution** was a cataclysmic event that not only transformed **Iran** completely, but also had far-reaching consequences for the world. It caused a deep shift in **Cold War** and global geopolitics. The US not only lost a key strategi cally against the communist threat, but it also gained a new enemy' (the Conversation.com)।



চিত্র : ইরান বিপ্লবের নায়ক আয়াতুল্লাহ খোমেনি।

বিপ্লবীরা প্রায় ১৪শ বছর আগে প্রবর্তিত ইসলামি সমাজব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তন ও ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসরণ করে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। ইরানের ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছেন। তাদের সাফল্য এখানেই। প্রতিটি বিপ্লবের ক্ষেত্রে যা হয় (ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব), শোষিত মানুষদের দুঃখ, বঞ্চনা ও অত্যাচারকে ব্যবহার করা, ইরানি বিপ্লবীরাও শাহ আমলের অনাচারকে ব্যবহার করেছিলেন। সেই সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইরানি জনগণ অনেক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যে শোষণের শিকার হয়েছিলেন, তা কোনো কোনো লেখকের গবেষণায় উল্লেখ আছে (Robert Graham, Iran : The Illusion of Power)। ইরানি বিপ্লবের মূল স্পিরিট ছিল *'Estiqlal, Azadi, Jomhuri-ye-Eslami'*, অর্থাৎ 'Independence, Freedom and Islamic Republic'। স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা-এই ছিল বিপ্লবের মূলমন্ত্র। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে ইমাম রুহুল্লা খোমেনির আদর্শ বিপ্লবে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। খোমেনি বিশ্বাস করতেন ইসলামে 'Walayatl-e-faqih'-এর প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ এই 'Walayatl-e-faqih' হচ্ছে শীর্ষ ধর্মীয় নেতৃত্ব। এরা দেশ ও সরকার পরিচালনা করবে এবং এক ধরনের Guardianship বা অভিভাবকত্ব নিশ্চিত করবে (Dabashi, Theology of Discontent, 1993, p. 419-443)। কেননা খোমেনির মতে ইসলাম ধর্মে আনুগত্য ও শরিয়া আইনের কথা বলা আছে। খোমেনির মতে, 'This law was not only the Islamically correct thing to do, it would prevent poverty, injustice, and the plundering of muslim land by foreign unbelievers. Sharia had to be protected from innovation and deviation, and this required putting Islamic jurists in control of goverment' (Khomeni : Algar, Islam and Revolution, p. 52, 54, 80)। স্পষ্ট বক্তব্য। শারিয়া আইন সমাজকে দারিদ্র মুক্ত করে, অবিচার রোধ করে, অমুসলিমদের ভূমি দখল থেকে জনগণকে রক্ষা করে। এজন্যই দেশে শারিয়া আইন প্রবর্তন, তা বাস্তবায়ন এবং ইসলামিক পণ্ডিত তথা ইসলামিক আইনজ্ঞদের রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব দিতে হবে। তার এই দর্শন ইরানে একটি Theocracy বা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনে একটি ভিত্তি রচনা করেছিল। খোমেনি এটাও মনে করতেন–একটি ন্যায্য সমাজ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইসলামিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এজন্য একটি 'ইসলামিক বিপ্লব' রপ্তানিকেও তিনি

একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। *'Export of Revolution'* কিংবা বিপ্লব রপ্তানিকে তিনি মনে করতেন, does not mean interfering the other nations affairs, but, answering their questions about knowing god'–এর অর্থ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করা নয়, বরং মহান আল্লাহতালার ব্যাপারে তাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দেওয়া। যদিও এটা ঠিক, ইরানের তথাকথিত এই ইসলামিক বিপ্লব রপ্তানির ক্ষেত্রটা খুব সহজ হয়েছে, এটা বলা যাবে না। একটা অভিযোগ ছিল, কিছু কিছু দেশে, যেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে ইরানি স্টাইলে বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে সফলতা আসেনি। সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে, যেখানে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন বসবাস করে, সেখানে ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলেশনারি গার্ড অত্যন্ত তৎপর। এ প্রসঙ্গে *কুদস ফোর্সেস* এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালে এই ফোর্সটি গঠন করা হয়েছিল। এটি পরিচালনা করে আসছিলেন মেজর জেনারেল কাশেম সুলেইমানি, যাকে যুক্তরাষ্ট্র ড্রোন হামলায় হত্যা করে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে। সুলেইমানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের সংগঠিত করছিলেন। সুলেইমানি তার কাজের জন্য সরাসরি জবাবদিহি করতেন শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিইর কাছে। এক কথায়, ইরান মধ্যপ্রাচ্যে যে সামরিক প্রভাব তৈরি করতে চাইছে তার মূল কারিগর ছিলেন জেনারেল সুলেইমানি। ইরাক, লেবানন এবং সিরিয়াতে এক ধরনের প্রভাব তৈরি করা, এমনকি ইয়েমেনেও হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইরানের যে যোগাযোগ আছে বলে আমেরিকা বলে আসছে, সেখানেও জেনারেল সুলেইমানির একটি ভূমিকা আছে বলে পশ্চিমাদের ধারণা।

বিবিসি'র মতে, কোন পররাষ্ট্রনীতিতে ইরান চলবে, কোন দেশের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে–এমন যেকোনো সিদ্ধান্তে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত থাকলেও শেষ কথাটি বলতেন জেনারেল সুলেইমানিই। তিনি যা বলতেন সেটিই গ্রহণ করা হতো এবং সেই অনুযায়ীই ইরানের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা হতো। ইরানের অনেকেই তাকে ইরানের একজন জাতীয় বীর বলে মনে করতেন। ইরানের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন সময় তাকে নিয়ে নানা সংবাদ পরিবেশন করা হতো। পররাষ্ট্র সংক্রান্তসহ নানা কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের

মিত্রদের নজরে ছিলেন তিনি বহুদিন ধরে। তাদের ধারণা ছিল, ইরানের রেভ্যুলুশনারি গার্ড এবং কুদস *ফোর্সকে* যদি থামানো না যায় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান যে সামরিক এবং অন্যান্যভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে সেটিকে থামানো যাবে না। ইরানি বিশেষজ্ঞরা জেনারেল সুলেইমানিকে ইরানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বলেই মানতেন। সুপ্রিম নেতার পরেই ছিল তার অবস্থান। সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীও ছিলেন তিনি।

২০০৫ সালে ইরাকে সরকার গঠনের পর সেখানকার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেন সুলেইমানি। সে সময় ইরাকে গঠিত হয় দেশটির সবচেয়ে পুরানো প্রক্সি বাহিনী হিসেবে পরিচিত শিয়াভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও প্যারামিলিটারি বাহিনী বদর *অর্গানাইজেশন*। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সময় ইরাকি মিলিশিয়াদের আসাদ সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন সুলেইমানি।

এছাড়া ইরাকে জঙ্গি গোষ্ঠী *আইএস* বিরোধী যুদ্ধে ইরান-সমর্থিত শিয়া প্যারামিলিটারি ইউনিটগুলো ও বিখ্যাত *হাশদ আল-শাবি* (পপুলার মোবালাইজেশন ফোর্সেস) ইরাকি মিলিটারির সঙ্গে মিলে লড়াই করে। এসব সংগঠনের অনেকই ছিল সুলেইমানির নিয়ন্ত্রণে। লেবাননে হিজবুল্লাহরও প্রধান অভিভাবক ছিলেন কাসেম সুলেইমানি। ইসরাইলের পুনঃপুন বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও হিজবুল্লাহ অতীতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এখন। পুরোপুরি ইরানের হয়ে কাজ করছে তারা।

কুদস এর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হচ্ছে এই সংগঠনটি উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে শিয়া ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে প্যারামিলিটারি ফোর্স গঠন করেছে। যেমন– সিরিয়াতে রয়েছে Liwa al Baqir, Quwat al-Ridha, লেবাননে Hizbullah, ইরাকে রয়েছে Asaib Ahlal-Haq, Badr Organization, Harakat Hizbullah al-Nujaba, Kataib Hizbullah, বাহরাইনে রয়েছে Al-Ashtar, পাকিস্তানে রয়েছে Liwa Zainabiyoun, আফগানিস্তানে Liwa Fatemiyoun। এছাড়া ফিলিস্তিনে হামাস ও প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ এবং ইয়েমেনে হুতিদের সাথে এই সংগঠনের যোগসূত্র রয়েছে (সূত্র Gzero, Signal : ৮ জানুয়ারি, ২০২০)। প্রসঙ্গক্রমেই উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী শিয়া জনগোষ্ঠীর একটি পরিসংখ্যান আমাদের জানা প্রয়োজন। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে শিয়া ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান অনেকটা এ রকম :

বাহরাইন	:	শিয়া : শতকরা ৭০ ভাগ
		সুন্নি : শতকরা ৩০ ভাগ
ইরান	:	শিয়া : ৯০ ভাগ
		সুন্নি : শতকরা ৯ ভাগ
ইরাক	:	শিয়া : ৬৩ ভাগ
		সুন্নি : ৩৪ ভাগ
কুয়েত	:	শিয়া : ২৫ ভাগ
		সুন্নি : ৬০ ভাগ
লেবানন	:	শিয়া : ৩৬ ভাগ
		সুন্নি : ২২ ভাগ
কাতার	:	শিয়া : ১৪ ভাগ
		সুন্নি : ৮৬ ভাগ
সৌদি আরব	:	শিয়া : ৫ ভাগ
		সুন্নি : ৯৫ ভাগ
ইয়েমেন	:	শিয়া : ৩৬ ভাগ
		সুন্নি : ৬৩ ভাগ

ইরানি বিপ্লব একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এবং একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছিল ইসলামিক বিশ্বে শিয়া ইসলামিক আদর্শে অনুরূপ একটি বিপ্লব সম্পন্ন করার। কিন্তু তা হয়নি।

এখানে ইরানি বিপ্লবের মূল কারণ তথা আদর্শিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলেও, গবেষকরা এর সাথে আরো কিছু কারণ যোগ করেছেন, যা পরোক্ষভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। যেমন বলা যেতে পারে পাহলেভীর রাজবংশের (১৯২৫-১৯৭৯) শাসন আমলে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজয়, রেজা শাহের আমলে (১৯৪১-১৯৭৯) কৃষকবিদ্রোহ, সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ও সেনাবাহিনীর অসন্তোষ ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরান দখল করে নিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাহলেভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ অপসারিত হয়ে তার ছেলে মোহাম্মদ রেজা শাহের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৫-১৯৪৬ সময়সীমায় ইরান-আজারবাইজান সংকট ও দোফার বিদ্রোহ (১৯৬৩-১৯৭৬) ইরানকে বড় ধরনের সংকটে ফেলে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিত্রশক্তি ইরান দখল করে নিলে এক পর্যায়ে ১৯৪৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আজারবাইজানে জনপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়। একই সময় কুর্দিদের পক্ষ থেকে

রিপাবলিক অব মাহাবাদ (Republic of Mahabad) এর ঘোষণা আসে। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে দক্ষিণ আজারবাইজান ও মাহাবাদ ইরানের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হয়। কিন্তু এর একটা প্রতিক্রিয়া থেকে যায়, যা ইরানের সংহতির জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ। এখানে দোফার বিদ্রোহ (Dhofar rebellion) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। দোফার ছিল ওমানের অন্তর্ভুক্ত একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। ১৯৬৩ সালে *Dhofar Liberation Front* নামে একটি গেরিলা গ্রুপ চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় দোফারের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। তাদের অন্যতম দাবি ছিল পুরো পারসীয় অঞ্চল থেকে ব্রিটেনের প্রত্যাহার। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। ইরান ১৯৭৩ সালে ওই গেরিলা যুদ্ধে ওমানি শাসকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ১৯৭০ সালে ওমানি শাসক কাবুস বিন সাইদ তার পিতা সাঈদ বিন কাবুসের বিরুদ্ধে 'প্রসাদ ষড়যন্ত্র' করে পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতায় বসেন। ব্রিটিশ বাহিনী তাকে সহায়তা করেছিল। ১৯৭৬ সালে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। দোফার বিদ্রোহ দমনে ইরানের ভূমিকা পারসীয় অঞ্চলে ইরানের ভূমিকা শক্তিশালী করলেও, রেজা শাহ অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান নজর দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কৃষক অসন্তোষের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৬৩ সালে তথাকথিত *White Revolution* বা শ্বেত বিপ্লব শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ধনী কৃষকরা আরো ধনী ও সম্পদশালী হয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ব্যাপক অভিবাসন ঘটেছিল। কিন্তু সাধারণ কৃষকরা এতে করে উপকৃত হয়নি। তাদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছিল। তাদের মাঝে একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল যে এই *শ্বেত বিপ্লব* শুধুমাত্র কৃষকদের জন্যই করা হয়েছে। এই অসন্তোষ প্রকারান্তরে বিপ্লবীদেরই সহায়তা করেছিল। রেজা শাহ পাহলেভীর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগে ছিল দেশটি (ইরান) বিদেশি ব্যাংক থেকে অনেক ঋণ নিয়েছিল, যা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আবার এই ঋণ নিয়ে রেজা শাহের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবরা উপকৃত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের উপকার এতে হয়নি। পাহলেভী ফাউন্ডেশনের নামে একটি সরকারি ব্যাংক থেকে ৫৭০ মিলিয়ন (570 Million) ডলার গ্রহণ করা হয়েছিল, যা অপব্যবহার করা হয়েছিল (নিউইয়র্ক টাইমস, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯)। রেজা শাহ নিজে ও তার পরিবার ধনী ব্যক্তিকে পরিণত হয়েছিলেন। বিপ্লব পরবর্তী সরকারের

মতে শাহ ও তার পরিবার ৫৬ বিলিয়ন ডলার সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। ABC টিভির উপস্থাপিকা বারবার ওয়ালটার্সের মতে শাহ পরিবার ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের মালিক। ইরান সরকার এই সম্পদ ফেরত চেয়ে নিউইয়র্কের ফেডারেল কোর্টে একটি মামলাও দায়ের করেছিল (The Christian Science Monitor, April 26, 1980)। এটা ঠিক রেজা শাহ ও তার পরিবারের সদস্যরা ইরানে অনেক ব্যবসায় জড়িত ছিলেন এবং এককভাবে তারা ওইসব ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এভাবেই শাহ পরিবার সম্পদশালী হয়েছিল। ওইসব অনিয়ম ও অনাচার পরোক্ষভাবে ইরানে ইসলামিক বিপ্লব সংগঠিত হতে উদ্দীপ্ত করেছিল।

ইরানে ইসলামি বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিপ্লব ইতোমধ্যে চার দশক পার করেছে। এই ইরান এখনও তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে উঠছে যে এখানে সনাতন পশ্চিমা ধ্যানধারণা সমৃদ্ধ, কিংবা বাম রাজনৈতিক মতাদর্শের কোনো স্থান নেই। ইরানি পার্লামেন্টের স্ট্রাকচারের দিকে তাকালেই এটি বোঝা যায়। মূলত ইসলামিক দলগুলোরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে পার্লামেন্টে এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক মতাদর্শও ইসলামিক। রাজনীতিবিদদের প্রায় সবার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ধর্মীয় স্কুল। কিন্তু পরবর্তীতে সবাই উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। পিএইচডি ডিগ্রিও আছে অনেকের। বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন, এমন সংখ্যাও অনেক। বিপ্লবের পরপরই খোমেনি একজন গণতন্ত্রী মেহেদি বাজারগান, যিনি পাহলেভী রাজবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল পর্যন্ত খেটেছিলেন, তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। যদিও বাজার খান খোমেনিকে একসময় *'turbaned shah'* হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বাজারগান ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র নয় মাস। এর পর থেকে আর গণতন্ত্রকামী তথা মডারেটদের রাজনীতিতে কোনো স্থান ছিল না।

ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি *ইসলামিক রেভ্যুলেশনারি* গার্ড বাহিনী এই রাজনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। এই গার্ড বাহিনী সরাসরি আলি খোমেনিই কর্তৃক পরিচালিত হয়। গার্ড বাহিনীর অনেকেই আবার অবসর নিয়ে রাজনীতিতে আসছেন। নিহত কাশেম সুলেইমানি বেঁচে থাকলে, তিনি হতেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। বর্তমান পার্লামেন্ট স্পিকার আলী লারিজানি (তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী) এক

সময় রেভ্যুলুশনারি গার্ডের কমান্ডার ছিলেন।

ইরান বিপ্লবের ৪০ বছর পর ইংল্যান্ডের *Tony Blair Institute for Global Change* ইরান নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে (দেখুন, Kasra Arabi, the Fundamentals of Iran's Islamic Revolution" February 2019)। গবেষণার ফলাফল অনেকটা এরকম : 1. state sanctioned Shia Islamist ideology unites Iranian 'hardliners' and 'moderates' 2. Iran is as committed to exporting the Islamic Revolution today as it was in 1979; 3. Shia Islamism shares key ideological overlaps with Sunni Islamism, 4. the 2015 International Nuclear deal did not after Iran's anti-US stance; 5. A determination to eradicating Israel is entrenched across the Iranian establishment। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে ইরানি বিপ্লব 'কট্টরপন্থি' ও 'নরমপন্থি'দের একত্রিত করেছে, ইরান বিপ্লব রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনও 'কমিটেড', শিয়া ইসলাম সুন্নি ইসলামকে অতিক্রান্ত করেছে, ইরানের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাবের আদৌ কোনো পরিবর্তন আসেনি, এবং ইসরাইল বিরোধী মনোভাব ইরানি নেতৃত্বের মাঝে এখনও সক্রিয়। ২০১৯ সালে সম্পাদিত এই গবেষণায় একুশ শতকের ইরান সম্পর্ক একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

বস্তুত ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লব এ অঞ্চলের রাজনীতিতেই শুধু পরিবর্তন আনেনি, বরং বলা যেতে পারে বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। প্রায় ৪০ বছর পর ইরান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন পর্যবেক্ষক Michael Axworthy মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'Fourty years ago, Ayatollah Khomeini returned from exile to overthrow Iran's corrupt monarchy। The revolt radicalised the region and inspired Muslims across the globe' (*Iran : the Revolution that Shook the World*, New Statesman, 13 February 2019)। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ইরানি বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা থাকলেও মৌলবাদী আন্দোলনে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছিল। তবে সুন্নি প্রভাবাধীন অঞ্চলে এই প্রভাব তেমন একটা পড়েনি। ইরান বিপ্লবের পর দুটো বিষয় লক্ষণীয়। এক. সুন্নি প্রভাবাধীন অঞ্চলে *আল কায়দা* কিংবা *ইসলামিক স্টেট*-এর মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতা লক্ষ করা গেলেও, ইরানে এর তেমন একটা প্রভাব পড়েনি। দুই. রেজা শাহের শাসন আমলে ইরানকে গণ্য করা হতো *'পারস্যের পুলিশ'* হিসেবে। অর্থাৎ পারসীয় উপসাগরীয় অঞ্চলের কর্তৃত্ব ছিল ইরানে হাতে।

ইরানে সরকার পরিবর্তন হলেও, ইরানের সেই স্ট্রাটেজিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে মানুষের মাঝে কিছুটা অসন্তোষ আছে বলেই মনে হয়।

ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ

গেল দু'বছর মাঝে মধ্যে ইরানের বেশ কয়েকটি শহরে সরকারবিরোধী যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নতুন একটি মাত্রা এনে দিয়েছে। সিরিয়া ও ইরাক থেকে জঙ্গিগোষ্ঠী *আইএস* উৎখাতের পরও সেখানে সংকট কাটেনি। এই ইরানি বিক্ষোভের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার এক টুইট বার্তায় (২০১৯) ইরানে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখার জন্য তৈরি থাকতে বলেছিলেন! এর মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট কী মেসেজ দিলেন কি না, তা স্পষ্ট না হলেও এটা সত্য, সাম্প্রতিক সময়ে ইরান নিয়ে তিনি নানা মন্তব্য করেছেন। ২০১৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসন আমলে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যে ছয় জাতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা তিনি মানবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিক্ষোভের সঙ্গে ট্রাম্পের টুইট বার্তাকে অনেকে মিলিয়ে দেখতে পারেন। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনিও বলেছেন, ইরানের এ বিক্ষোভে 'শত্রু পক্ষের' ইন্ধন আছে। যদিও তিনি কোনো দেশ বা কোনো পক্ষকে 'শত্রুপক্ষ' হিসেবে উল্লেখ করেননি। তবে ইরানি জনগণ ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রকেই 'শত্রুপক্ষ' হিসেবে মনে করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা জানেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসন আমলে তিনি ইরানের সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন উঠেছে। নিঃসন্দেহে এ সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের আগে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো ইরান। রেজা শাহ পাহলেভী ছিলেন তখন ইরানের রাজা। ইরানি বিপ্লবে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এর পর দীর্ঘদিন ইরান আঞ্চলিক রাজনীতিতে তেমন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে ইরানি প্রভাব বাড়ছে। ইরান সৌদি রাজবংশকে উৎখাত করতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা সৌদি রাজপরিবারে তৈরি হয়েছিল। ইরানের এ ভূমিকাকে সৌদি যেমন পছন্দ করছে না, ঠিক তেমনই পছন্দ করছে না যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। ফলে এ অঞ্চলে সৌদি আরব-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল একটি অলিখিত অ্যালায়েন্স গড়ে উঠছে ইরানের বিরুদ্ধে।

সারণি : ১৯

ইরান সম্পর্কে কিছু তথ্য

• বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটেন ও রাশিয়া ইরানে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। ১৯০৮ সালে ইরানের সম্রাট একটি ব্রিটিশ কোম্পানির সাথে তেল উত্তোলনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
• ১৯২১ সালে সেনা কর্মকর্তা রেজা খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি রেজা শাহ পদক গ্রহণ করেন এবং পাহলেভী রাজবংশের পত্তন ঘটান।
• তার শাসন আমলে তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতি ইরানে চালু করেন, যা ইরানে ধর্মীয় নেতাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
• ১৯৪১ সালে রেজা শাহ ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে তার ছেলে মোহাম্মদ রেজা শাহের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।
• ১৯৫১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক ইরানে তেল কোম্পানিগুলো জাতীয়করণের উদ্যোগ নেন। যাতে করে বিদেশি কোম্পানিগুলো ইরানি থেকে সম্পদ বিদেশে নিয়ে যেতে না পারে।
• সিআই এর প্ররোচনায় ও উদ্যোগে মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ও মোসাদ্দেকের পদত্যাগ। শাহ নিজের হাতকে শক্তিশালী করেন।
• ১৯৬৩ সালে শাহ তথাকথিত শ্বেত বিপ্লব (White Revolution) শুরু করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ শ্বেত বিপ্লব এর বিরোধিতা করেন ধর্মীয় নেতারা। ইমাম খোমেনি বিরোধীদের নেতৃত্ব দেন।
• ১৯৭০ সালে তেল সম্পদে ইরান লাভবান হলেও, সম্পদশালী হয়ে ওঠে শাহ'র পরিবার। সাধারণ মানুষ এই তেল সম্পদ থেকে আদৌ কোনো সুবিধা পায়নি।
• ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকেই অসন্তোষ বাড়তে থাকে। শাহ অত্যন্ত কঠোরভাবে এই অসন্তোষ দমন করেন। ৮ সেপ্টেম্বর শাহ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ৯-১৩ সেপ্টেম্বর তেল উত্তোলনকারী সকল প্রতিষ্ঠান হরতাল পালন এবং অক্টোবরে দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালন।
• পুরো নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ইরানের সর্বত্র বিক্ষোভ। ফ্রান্সে নির্বাসিত ইমাম খোমেনির বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন।
• ১৯৭৯ সালে ১৬ জানুয়ারি শাহ মিশরের উদ্দেশ্যে তেহরান ত্যাগ করেন। শাহপুর বখতিয়ারের নেতৃত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
• ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) খোমেনি ফ্রান্স থেকে ইরানে প্রত্যাবর্তন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহপুর বখতিয়ারের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
• ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) সেনাবাহিনী ঘোষণা করে তারা শাহপুর বখতিয়ারকে সমর্থন করবেন না। এই ঘোষণা খোমেনির ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সাহায্য করে।
• ১ এপ্রিল (১৯৭৯) আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানকে ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করেন।

ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি নিশ্চিত করেছিলেন–ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিটি তিনি মানবেন না। এরই ধারাবাহিকতায় তার প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ২১ মে (২০১৭) রিয়াদে তিনি যখন আরব-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তখনও তিনি তার এই ইরান বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট করেছিলেন। রিয়াদে তিনি বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য ইরান দায়ী! ফলে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতির যে পারমাণবিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তা তখন থেকেই বড় প্রশ্নের মুখে ছিল। বলা ভালো, ওই সমঝোতা চুক্তিতে (২০১৫) ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে দেখা যায়, আগামী ১০ বছরের মধ্যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে পারবে না। তাদের পরমাণু কেন্দ্রে চলবে নজরদারি। অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে এবং তেহরান শর্ত ভাঙলে ৬৫ দিনের মধ্যে ফের কিছু নিষেধাজ্ঞা বহাল হবে। একই সঙ্গে ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে কতটা এগিয়েছে, তা তদন্ত করবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ। এ চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইরানের যে সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল, তা ইরানকে ফেরত দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করার ফলে ইরান তার যাত্রীবাহী বিমান সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারতো। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১০ বছর পর ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আরও গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করতে পারবে। কিন্তু এর পরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। নিষেধাজ্ঞা আরো বেড়েছিল।

নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক প্রশ্নের মুখে আছে। বলতে দ্বিধা নেই, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরিভাবে উঠে গেলে ইরান এ অঞ্চলে অন্যতম একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে, যা ইসরাইল ও সৌদি আরব কারোই পছন্দ নয়। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে অন্যতম ফ্যাক্টর হচ্ছে ইসরাইল। পারমাণবিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা একটা ঐতিহাসিক ভুল।'

ইসরাইলের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ চুক্তির কোনো কোনো ধারা নিয়ে সমালোচনাও করেছেন। ফলে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ওই চুক্তির প্রশংসা এবং ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এ চুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে বলে মন্তব্য করলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে দ্রুত বদলে যাচ্ছিলো দৃশ্যপট। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করছে– এ অভিযোগ তুলে ২০০৬

সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধির কর্মসূচি বাতিল করার দাবিসংবলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পর অন্তত এ সংক্রান্ত আরও ছয়টি প্রস্তাব পরে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ইরান ওই কর্মসূচি বাতিল না করায় ২০১০ সালে জাতিসংঘ ইরানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার সম্পদ জব্দসহ দেশটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। উল্লেখ্য, ২০০৬ সাল থেকেই ইরানের সঙ্গে ছয় জাতি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানি) আলোচনা চলে আসছিল। কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। ২০১৩ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উদারপন্থি হিসেবে পরিচিত হাসান রুহানি বিজয়ী হলে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। ফলে ছয় জাতি আলোচনা আরও গতি পেয়েছিল। ২০১৪ সালের নভেম্বরে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং এপ্রিলে (২০১৫) সুইজারল্যান্ডের লুজানে একটি খসড়া চুক্তিতে ইরান ও ছয় জাতি উপনীত হয়। ওই বছরের ৩০ জুনের মধ্যে এ খসড়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। জুলাই (২০১৫) মাসে খসড়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অন্তত একটি জিনিস স্পষ্ট হয়েছিল, আর তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক বৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ সম্পর্ক আরও উন্নত করার প্রয়োজন ছিল। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে, প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে এখনও ১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লবের পর দীর্ঘ ৪৪৪ দিন *রেভোল্যুশনারি স্টুডেন্টস* কর্তৃক তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেওয়ার ঘটনার স্মৃতি একটি 'ক্ষতচিহ্ন' হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে সম্পর্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনাটা অত সহজ ছিল না। এর পর যোগ হয় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। ওই ঘটনার দীর্ঘ ৩৬ বছর পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দেশ দুটিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এর ফলশ্রুতিতেই ওই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের 'বন্ধু' ইসরাইলের আপত্তি সত্ত্বেও। ২০১৮ সালের ৮ মে যুক্তরাষ্ট্র ওই চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

নিঃসন্দেহে ইরানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের সম্পর্কের অবনতি ইরানি বিপ্লবের জন্য খারাপ খবর। এই সংকট ইরান কীভাবে কাটিয়ে উঠবে সেটাই দেখার বিষয়। এ ব্যাপারে একজন ইরানি বিশেষজ্ঞ ও ব্রুকিংস এর দোহা সেন্টারের ভিজিটিং ফেলো আলি ফাতুল্লাহ

নেজাদ (Ali Fathollah-Nejod) এর একটি মন্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি মন্তব্য করেছেন এভাবে 'As Iranian society finds itself traped between a precarious present and uncertain future, a number of scenarios could play out, including a militarized Islamic Republic, de facto led by the Islamic Revolutionray Guard Corps (IRGC)। Yet, even such a scenario would neither resolve Irans crisis, nor extinguish Iran's indomitable desire for social justice and good governance (Brookings, April 27, 2020)। তিনি যে তিনটি সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে socioeconomic, political and ecological, অর্থাৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও পরিবেশগত সংকট। তাই একুশ শতকে ইরানের রাজনীতি কোন দিকে যায়, সেদিকে লক্ষ থাকবে অনেকের।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিশ্বায়ন

> Globalisation was sold as a way of boosting prosperity for all by making markets bigger and more efficient. For a while the model worked, but when it blew up and caused extensive collateral damage, a backlash was inevitable. Deglobalisation is the result.
>
> **Larry Elliott, Guardian, 13 February**

বিংশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের বিষয়টি বহুল আলোচিত। এর যেমন একটি নেতিবাচক দিক আছে, ঠিক তেমনি এর একটি ইতিবাচক দিকও আছে। যদি এক কথায় বিশ্বায়ন বা Globalisation কী, তা বলতে বলা হয়, তাহলে বলতে হবে 'Globalisation is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology...Likewise, the centuries, people and corporations have invested in enterprises in other countries'। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হচ্ছে একটি ধারণা, যা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, টেকনোলজি ট্রান্সফারের মাধ্যমে এক ধরনের একীভূত হয়েছে। 'এক বিশ্বে'র ছায়াতলে সব দেশ একত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগে সহজ হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর হয়েছে, বাণিজ্য উন্মুক্ত হয়েছে, বাধানিষেধ কমানো হয়েছে। বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্য বাধা দূর হবার কারণে ছোট ছোট দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক বড় পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেইসব দেশে বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়েছে। অভিযোগ আছে এই বড় পুঁজি স্থানীয় পুঁজির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যার ফলে স্থানীয় পুঁজি সেভাবে বিকশিত হয়নি। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব এক হয়ে যাবার কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের পণ্য উন্নত বিশ্বে একটা স্থান করে নিতে পেরেছিল। যেমন বলা যেতে পারে গার্মেন্টস শিল্প। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বিংশ শতাব্দী

তো বটেই, একুশ শতকে এসেও তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে তৈরি হওয়া তৈরি পোশাক। বিশ্বে তৈরি পোশাকের বাজার ৪২১ বিলিয়ন ডলারের (২০১৯)। এ খাতে চীন রয়েছে শীর্ষে, বিশ্ব রপ্তানির শতকরা ৩৪.৪ ভাগ। বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় থাকলেও, জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০-এ ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে টপকে গেছে। ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৩০.৯৪ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ করেছে ২৮.৮২ বিলিয়ন ডলার (The Business Standard, 29 August, 2020) অন্যদিকে প্রযুক্তি বিদ্যায় অভাবনীয় সাফল্য চীনকে একটি 'উৎপাদন কারখানায়' পরিণত করেছে। সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে চীন সস্তায় পণ্য, বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন করে এবং বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম ট্যারিফের সুযোগে নিয়ে বিশ্বে অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এটা ঠিক ইতিহাস বলে, মানুষ যুগ যুগ ধরেই নিজ জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য নিয়ে গিয়েছে। আমরা চীনের কথা বলতে পারি। অতীত যুগে হান সাম্রাজ্যের সময় (২২০ খ্রি.পূ.-২০৬ খ্রি.পূ.) চীনা সম্রাট '*সিল্ক রুট*' এর প্রচলন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল চীনের বিখ্যাত সিল্কের ব্যবসা মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা এবং এইসব অঞ্চল থেকে পণ্য নিয়ে পুনরায় চীনে ফিরে যাওয়া। আজকের বিশ্বায়নের কনসেপ্ট অনেকটা সেরকম। পণ্যের বাণিজ্য, আইডিয়া সম্প্রসারন, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, আজকের বিশ্বায়নের ধারণার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বিশ্বায়ন এক ধরনের আন্তর্জাতিকতার জন্ম দিয়েছিল। বলা হয় 'The process by which business or other organizations develop international influence or start operating on an international scale'।

এখানে বলা ভালো, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নব্বই এর সময়ে বিশ্বায়ন একটা বড় প্রভাব ফেলেছিল বিশ্বে। ওই সময় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন, পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি চালু করা (মুক্ত বাজার, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন ইত্যাদি) এবং অন্যতম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চীনের উত্থান বিশ্বায়নের এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বিশ্বায়নের নামে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব বাড়ছে, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ছে এবং এক ধরনের 'আমেরিকান সংস্কৃতি' চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে বিশ্ব ধীরে ধীরে এক ধরনের অসমতা লক্ষ করছিল। একুশ শতকের দু'দশকের মধ্যেই এই অসমতা আরো স্পষ্ট হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, চেইন স্টোর চালু করা ও স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তথা চাষিদের উৎপাদিত পণ্যের দাম না পাওয়া, তথাকথিত বিধিনিষেধের কারণে ওই দেশগুলোর পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা ও সেখানে নব্য ধনিক শ্রেণির উত্থান, শ্রমিক শোষণ বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি ছিল বিশ্বায়নের কতগুলো নেতিবাচক দিক। ফলে একুশ শতকের প্রথম দশক থেকেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়ন বিরোধী জনমত বাড়তে থাকে। সর্বত্র বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কসহ অন্যান্য বড় বড় শহরে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে যে *Occupy Movement*-এর জন্ম হয়েছিল, তা ছিল মূলত অসমতা, অন্যায় আর কর্পোরেট হাউজগুলোর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। প্রতীকী অর্থে বিক্ষোভকারীরা নিউইয়র্ক শহরে ম্যানহাটন এলাকায় যেখানে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অবস্থিত, তার কাছাকাছি *'জুকোটি পার্কে'* জমায়েত হয়ে সেখানে দিনের পর দিন অবস্থান করে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। অনেকে এই আন্দোলনকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'Global Justice Movement' হিসেবে (Manfred Steger)। কারণ ওই আন্দোলন, যা একটি ক্ষমতাময় বিশ্ব গড়া, সকল ধরনের শোষণের অবসান ও নতুন একটি সমাজ গড়ার দাবি জানিয়েছিল, তা প্রায় পৃথিবীর সব প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল (৯৫১টি বড় বড় শহর, ৮২টি দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৬০০ কমিউনিটিতে তা ছড়িয়ে গিয়েছিল)। এটা ছিল বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বড় প্রতিবাদ। ওই আন্দোলনের একটা স্লোগান ছিল এ রকম *We are the 99%*- আমরাই শতকরা ৯৯ ভাগ। অর্থাৎ সমাজের মাত্র ১ ভাগ মানুষ সব সম্পদ ভোগ করে, আর ৯৯ ভাগ মানুষ শোষিত হয়। যদিও বলা হয়, *'অকুপাই মুভমেন্ট'* মধ্যপ্রাচ্যের 'আরব বসন্ত', ২০০৯ সালের ইরানের Green Movement এবং স্পেনের *Indignados Movement* দ্বারা অনেক অংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। The Washingtion Post-এর মতে, ওই আন্দোলন ছিল *'democratic awakening'*- অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ। *'অকুপাই মুভমেন্ট'* ছিল প্রকারন্তরে বিশ্বায়নকে চ্যালেঞ্জ করা ও বিশ্বায়ন যে বিশ্বে এক ধরনের অসম সমাজের জন্ম দিয়েছে, তা তুলে ধরা। তাদের দাবি ছিল ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের আইনের আওতায় আনা, ব্যবসায় যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়, তা কমানো, ব্যাংক পরিচালনায় স্বচ্ছতা, রাজনীতিতে কর্পোরেট হাউজগুলোর প্রভাব ও কর্তৃত্ব কমানো, সবার জন্য চাকরি নিশ্চিত করা, অতিরিক্ত করের বোঝা কমানো ইত্যাদি। কেউ কেউ এ ধরনের আন্দোলনকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন/Arun Gupta, *In These*

Times, 13 Feb 2012, Peter Gelderloos, *Counterpunch*, 13 February 2012-এর প্রবন্ধ)। আবার কারো কারো মতে (Peter Walker, *The Guardian*, 24 November 2011) আন্দোলনকারীরা সত্যিকার অর্থেই *'Participatory Democracy'* চেয়েছিলেন। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে–আরব বসন্ত যেমনি কোনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারেনি, ঠিক তেমনি 'অকুপাই মুভমেন্ট'ও সফলতা পায়নি।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছে এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর একটা যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। তবে প্রধানত আর্থিক অথবা বৈষয়িক বিশ্বায়নের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বৈশ্বয়িক বিশ্বায়ন দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে বিশ্বায়ন একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশ ও জনগোষ্ঠীকে এক কাতারে নিয়ে আসা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থে কতগুলো নির্দিষ্ট আর্থিক ও বৈশ্বিক নীতির সমাহার, যে নীতিগুলো গ্রহণ করলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে। যেমন বলা যেতে পারে আইএমএফ (IMF) কিংবা বিশ্বব্যাংকের কথা। এদের কাজ হচ্ছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ধনী ও দরিদ্র দেশ বিশ্বায়ন নীতির সমর্থন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুটো বৈশ্বিক আর্থিক সংস্থায় যোগ দিলেই আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। দ্বিতীয় ভাগে আছে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকজনের অভিগমন (Immigration) ও নির্গমন (Migration)। তৃতীয় ভাগে রয়েছে বিভিন্ন দেশের মাঝে টাকা ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন। চতুর্থ ভাগে রয়েছে এক দেশের মূলধন অন্যদেশে বিনিয়োগে করে সেখানে শিল্পদ্রব্য, কৃষিজ পণ্য অথবা পরিষেবা পণ্য উৎপাদন করে সে দেশে অথবা অন্য দেশে বিক্রয়ের প্রবাহ। পঞ্চম ভাগে রয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মহাজনি মূলধনের (Finance) আদান প্রদান। ষষ্ঠ ভাগে, বহুজাতিক অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব। সপ্তম ভাগে রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদান প্রদান। আর অষ্টমভাগে রয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য মাধ্যমের বিস্তার এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য মাধ্যমের উপর তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের ফল (আমিয়কুমার বাগচী, বৈষয়িক বিশ্বায়নের রূপরেখা, ২০০৫)।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই স্থানীয় পণ্যের আন্তর্জাতিককরণ হতে শুরু করে। এজন্য তৈরি হয় নতুন নতুন আইন। স্থানীয় আইনকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনা হয়। যুক্ত হয় নতুন নতুন আইডিয়া ও

প্রযুক্তি। বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগ। সস্তা শ্রমের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সস্তা শ্রমের সুযোগে অত্যন্ত কম দামে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয় এবং পশ্চিমা বিশ্বে এই পণ্য খুব সহজেই জায়গা করে নেয়। এর মধ্যে দিয়ে চীনের মতো দেশ ধীরে ধীরে বড় অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর (১৯৪৯) চীনে দারিদ্র ছিল প্রধান সমস্যা। কিন্তু চীন অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনে, সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম উৎপাদন কারখানায় পরিণত করেছে। এমন কোনো পণ্য নেই, যা চীন উৎপাদন করে না। এসবই হচ্ছে বিশ্বায়নের ফল। চীনের মতো আরো কিছু দেশ সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে পণ্যের অবাধ চলাচলের সুযোগ নিয়ে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এক ধরনের ট্যারিফ সুবিধা নিয়ে (যেমন তৈরি পোশাক) নতুন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত, ব্রাজিল, কিংবা ইন্দোনেশিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। OECD এই নয়া শিল্পোন্নত দেশগুলোকে New Emerging Economy (NEE) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। OECD এর মতে ২০০০ সালে উন্নত দেশগুলো যেখানে বিশ্ব বাণিজ্যের ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো (৪০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উন্নয়নশীল বিশ্ব), সেখানে ২০১০ সালে এ পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৫১ ও ৪৯ ভাগে। অর্থাৎ নয়া শিল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। ২০৩০ সালে এই রেশিও চলে আসবে ৪৩ আর ৫৭ ভাগে। অর্থাৎ NEE ভুক্ত দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ব বাণিজ্যের ৫৭ ভাগ। এটাই বিশ্বায়ন। বলা যেতে পারে বিশ্বায়নের প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আছে অনেক। বিশ্বায়ন বড় পরিবর্তন এনেছে বিশ্ব ব্যবস্থায়। শুধুমাত্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই যে পরিবর্তন এসেছে, তেমনটি নয়। বরং অর্থনীতি, পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা, প্রযুক্তি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটি দেশের অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির অংশ। প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির আলোকেই পরিচালনা করতে হয়। বৈশ্বিক যে পরিবর্তন এসেছে, এই পরিবর্তনের ফলে কোনো একটি দেশের পক্ষে এককভাবে টিকে থাকা সম্ভব না। বিশ্বায়ন পারস্পরিক নির্ভরশীল একটি বিশ্ব তৈরি করেছে। এই নির্ভরশীলতা আঞ্চলিকতা এবং বহুপাক্ষিকতার জন্ম দিয়েছে। ছোট ছোট দেশগুলো অঞ্চল ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে, অর্থনৈতিক জোট গঠন করে বিশ্ব আসরে তার অবস্থান রাখছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আসরে তারা সুযোগে সুবিধাও পাচ্ছে। এরই নাম বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়ন একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির জন্ম দিয়েছে। জন্ম হয়েছে অনেক বহুজাতিক কোম্পানির (MNC)। এই কোম্পানিগুলো এক একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে পরিণত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ

করছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে, যাতে করে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ১৯৭০ সালে যেখানে বিশ্বে FDI বা বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলার, সেখানে বর্তমানে এর পরিমাণ ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশনের জন্ম হয়েছে, যারা এখন বিশ্বের অনেক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বায়ন না ঘটলে এদের ব্যবসায় বিস্তৃতি ঘটতো না। এমনকি সত্তর দশকের শেষের দিকে বাণিজ্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় চীনেও জন্ম হয়েছে বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থার, যারা এখন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করছে। UNCTAD আমাদের একটি হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখা যায় ১৯৬০ সালে বিশ্বে মাত্র ৭ হাজার বহুজাতিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গত ৫০ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার। তবে *2012 Fortune Global 500 List* এ ৫০০ বহুজাতিক সংস্থাকে গ্রহণযোগ্যতায় নেওয়া হয়, যারা বিশ্বায়নের কারণে এখন বিশ্ব বাণিজ্যের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যানে শীর্ষ কোম্পানিগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে ১২১-টি কোম্পানি, চীনের রয়েছে ১১৯টি, আর জাপানের ৫২টি। ভারতের আছে ৮টি। ব্রিটেনের আছে ১৮টি। চতুর্থ অবস্থান আছে ফ্রান্সের ৩১টি। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শীর্ষ ১০টি বহুজাতিক কোম্পানির তালিকা সারণি : ২১-এ দেওয়া হলো :

সারণি : ২০

শীর্ষ বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ

কোম্পানি	দেশ	সেক্টর	আয় (বিলিয়ন ডলার)
১. ওয়ালমার্ট	যুক্তরাষ্ট্র	চেইনস্টোর	৫১৪
২. সিনোপেন গ্রুপ	চীন	পেট্রোলিয়াম	৪১৫
৩. রয়েল ডাচ শেল	হল্যান্ড	পেট্রোলিয়াম	৩৯৭
৪. চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম	চীন	পেট্রোলিয়াম	৩৯৩
৫. স্টেট গ্রিড	চীন	এনার্জি	৩৮৭
৬. সৌদি আরমাকো	সৌদি আরব	এনার্জি	৩৫৬
৭. বিপি	যুক্তরাজ্য	পেট্রোলিয়াম	৩০৪
৮. এক্সন মবিল	যুক্তরাষ্ট্র	পেট্রোলিয়াম	২৯০
৯. ভক্সওয়াগেন	জার্মানি	অটোমোবাইল	২৭৮
১০. টয়োটা মটর	জাপান	অটোমোবাইল	২৭৩

সূত্র : Fortune Global 500 List.

এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শাখাপ্রশাখা এখন ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ওয়ালমার্টের শাখা আছে ২১টি দেশে। তাদের স্টোরের সংখ্যা ১০ হাজার। আমাজন এখন ভারতে শাখা ওপেন করে সেখানে ব্যবসা করছে। বিশ্বে পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপকতা আসায় বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়টি। এটি এখন আর এককভাবে কোনো দেশের সমস্যা না, এটা বৈশ্বিক সমস্যা।

সাধারণ তিনভাগে বিশ্বায়নকে ভাগ করা যায়। Political Globalisation বা রাজনৈতিক বিশ্বায়ন, Social Globalisation বা সামাজিক বিশ্বায়ন, আর Economic Globalisation বা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। এর বাইরে Technological Globalisation, Ecological Globalisation এর কথায় বলেছেন কেউ কেউ। কারো কারো লেখায় Financial Globalisation কিংবা Sociological Globalisation এর কথাটাও এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয় যে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে কিছু নীতিমালার ভিত্তিতে একটি কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এক কাতারে নিয়ে আসা। রাষ্ট্রগুলো বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রশ্নে সেইসব আইন মানতে বাধ্য। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জি-৮ এর কথা। এইসব সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো আঞ্চলিকভাবে অথবা বৈশ্বিকভাবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এখানে নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ থাকে। যেমন গণতন্ত্রকে প্রমোট করা, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান, মুক্তবাজার, উন্নয়নশীল দেশগুলোর কিছু সুযোগ সুবিধা। যেমন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ থাকায় চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দীর্ঘদিন যোগ দিতে পারেনি। পেরেছে ২০০১ সালে যখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অনুসৃত নীতি দেশটি গ্রহণ করে। কিউবা ১৯৯৫ সালে, আর ভিয়েতনাম ২০০৭ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেয়। Social Globalisation হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া বা interaction। পরিবার, ধর্ম, শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। পরিবারের ব্যাপ্তি বেড়েছে, দুই সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধন তৈরি হচ্ছে। সেই সাথে শিক্ষা নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন করেছে। এর সাথে Cultural Globalisation কে এক সাথে দেখা যেতে পারে। সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, ইংরেজি ভাষা, সিএনএন বা বিবিসির মতো প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় নতুন এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এটাই বিশ্বায়ন। আবার আফ্রিকাতে নতুন এক প্রজন্মের জন্ম হয়েছে, যাদের বাবা চৈনিক কিন্তু মা আফ্রিকান। এক শংকর জাতির জন্ম হয়েছে। এদের সংখ্যা কয়েক লাখ। চীনারা কাজ করতে গিয়ে

সেখানে আফ্রিকার নারীদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে জন্ম হচ্ছে শংকর জাতির। এটাকে আমরা Social বা Cultural Globalisation এর ফলশ্রুতি বলে মনে করতে পারি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রযুক্তিবিদ্যায় এত উন্নতি হয়েছে যে প্রযুক্তি নির্ভর একটা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। ইন্টারনেট, ফেসবুক মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ বাড়িয়েছে। কম্পিউটার, আইপ্যাড, আইফোন আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা মুহূর্তের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারছি। রোবট শিল্পের বিকাশ ঘটেছে, যা মানুষের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে Technological Globalisation অন্যদিকে Economic Globalisation কিংবা Financial Globalisation কে এক সাথে দেখা যেতে পারে। একজন গবেষক Rakesh Mohan Joshi তার গ্রন্থ *International Business* এ অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে লিখেছেন, 'Economic Globalisation refer to the widespread international movement of goods, capital, service, technology and information. it is the increasing economic integration and interdependence of national, regional and local economies across the world through an intensification or cross border movement of goods 'service' technologies and capital'। পণ্যের উৎপাদন, এর বৈশ্বিকীকরণ, পুঁজির জোগান, সেবা নিশ্চিত করা, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় পুঁজিকে আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে একত্রীকরণকে মূলত বোঝায় অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কারণে সীমান্ত বাধা উঠে গেছে। স্থানীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক রূপ পেয়েছে। পণ্য এক দেশে উৎপাদিত হচ্ছে, কিন্তু বাজারজাত হচ্ছে অন্য দেশে। সীমান্ত বাধা এই অর্থনীতিকে আটকে রাখতে পারেনি। বরং উন্মুক্ত হয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক আইন হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কিংবা *General Agreement on Tariffs and Trade* এর জন্ম হয়েছে। ট্যারিফ বাধা কমানো হয়েছে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো কিছু সুবিধা পায়। এর প্রয়োজনও ছিল। বিশ্বে পণ্যের চাহিদা বেড়েছিল। এই চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন ছিল পণ্যের সরবরাহের, যা কোনো কোনো দেশের একার পক্ষে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) প্রয়োজন মেটানো সম্ভব ছিল না। প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি এই প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করেছে। এটাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। এক্ষেত্রে Financial Globalisation বা আর্থিক বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় অর্থের প্রবাহ। স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙা করতে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে যে অর্থের জোগানোর প্রয়োজন হয়, তা আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে সরবরাহ করা হয়। স্থানীয় অর্থনীতির

আন্তর্জাতিক ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে যোগসূত্রকেই মূলত আর্থিক বিশ্বায়ন বোঝায়। এই আর্থিক বিশ্বায়নের যেমনি প্লাস পয়েন্ট আছে, তেমনি আছে মাইনাস পয়েন্টও। প্লাস পয়েন্টের মধ্যে আছে 'development of financial sector, international risk sharing, expanded liquidity constraints'। আবার মাইনাস পয়েন্টের মধ্যে আছে 'processes in financial markets are mismanaged, adverse outcome occur, excessive risk taking by Banks, debt accumulation by governments, financial and currency crisis)।'

সামগ্রিকভাবে আমরা বিশ্বায়নকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করি না কেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বিশ্ব বদলে গেছে। মানুষের চাহিদা বেড়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি বাজারে আসছে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়েছে। মানুষের মধ্যে এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা বেড়েছে। পণ্যের বহুমুখীকরণ ঘটেছে। আর এভাবেই এমন একটি আবহ তৈরি হয়েছে, যা সীমান্তের বেড়াজাল ভেদ করে রাষ্ট্রগুলোকে এক পতাকাতলে নিয়ে এসেছে। আর এই প্রসারকেই আমরা বলছি বিশ্বায়ন।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে বিশ্বায়নের মাত্রা বাড়লেও, একুশ শতকের শুরুতে শিল্পায়নের নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, যেমন ইন্টারনেটের সুযোগে ব্যাপক আউট সোর্সিং, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বড় বড় কোম্পানির কাজ এখন ঢাকায় বসে হচ্ছে। এতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে, আবার সাশ্রয়ী হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশ, কিংবা ভারত আইটি, সেক্টর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়ে এক ধরনের 'বিপ্লব' এনেছে। দিনরাত্রির ব্যবধানের সুযোগে নিয়ে আমেরিকার অনেক কোম্পানির ডাটা এখন ঢাকাতে প্রসেস হচ্ছে। বিশ্বায়নের এটা নতুন একটি মাত্রা। সোশাল মিডিয়ার (ফেসবুক) ব্যাপক ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় তথা মানুষকে একত্রিত করেছে। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিদিন ১.৫৯ মিলিয়ন। আর টুইট ব্যবহার করেন ৩৩০ মিলিয়ন (মাসিক)। এই সোশাল মিডিয়া এখন বিজ্ঞাপনের এক বড় বাজার তৈরি হয়েছে। এতে করে ফেসবুককে কেন্দ্র করে একটি বিশাল আর্থিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। ফেসবুকের রাজস্বের (২০১৯) পরিমাণ ১৭.৬৫২ বিলিয়ন ডলার, যা গেল বছরের চাইতে শতকরা ২৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর টুইটারের ২০১৮ সালের রাজস্বের পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলার (২০১৭ সালে ছিল ২.৪ বিলিয়ন ডলার)। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রনায়ক (ট্রাম্প, মোদি) টুইটার ব্যবহার করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায়শই টুইট করে বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে মন্তব্য করেন। বিশ্বায়নের আরেকটি মাত্রা

হচ্ছে ই-কমার্স ও ই-ওয়ালেট (e-wallets)। ব্যাবসা বাণিজ্যের জন্য এখন আর বড় ধরনের ওয়ারহাউজের দরকার নেই। প্রচুর কর্মচারী কিংবা বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেরও দরকার নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে-কোনো পণ্য অর্ডার করা যায়, যা নিজ নিজ বাসাতে পৌছে দেওয়া হয় কোম্পানির খরচে। আলীবাবা কিংবা আমাজনের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। আলীবাবা চীনা কোম্পানি। শত শত চীনা কোম্পানি আলীবাবার সাথে কাজ করে। গ্রাহক অর্ডার করলে, তা কোম্পানি পৌছে দেয়। মূল সদর দপ্তর চীনে। কিন্তু আমেরিকা থেকেও পণ্যের অর্ডার দেওয়া যায়। ২০১৯ সালে এই কোম্পানি আয় করেছে ১১.৯৫৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ২০১৯ সালে আমাজনের আয় ৩.৩ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং বোঝাই যায় ই-কর্মাস কী বিশাল এক আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও ই-কর্মাস শক্তিশালী হচ্ছে। অনেক কোম্পানি বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্বায়নের আরো একটা অগ্রগতি e-Wallets। মানুষ এখন পণ্য কেনাকাটায় কার্ড ব্যবহার করে, ক্যাশ টাকা ব্যবহার করেন না অনেকেই। বিশ্বায়ন মানুষকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। এমনকি অন্য দেশে বিনিয়োগ ও টাকা ট্রান্সফারের বিষয়ও সহজ হয়েছে। এগুলো সবাই অগ্রগতি। বিশ্বায়ন এইসব অগ্রগতিকে সাধারণ মানুষের জন্য আরো সহজ করেছে।

বিশ্বায়নের এইগুলো ইতিবাচক দিক। আবার নেতিবাচক দিকও আছে। বিশ্বায়নের কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে, সেখানে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। আমরা চীনের দৃষ্টান্ত দিতে পারবো। চীন আশির দশকে এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র থেকে তুলে আনতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের কারণে। চীন ১৬.৬ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রমুক্ত করতে পেরেছিল (চায়না ডেইলি, ২২ আগস্ট, ২০১৯)। বাংলাদেশের কথাও আমরা বলতে পারি। আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প বিকাশের কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার এটি সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বায়ন আরো একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যাকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন Comparative advantage (উনিশ শতকের ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্ব)। এর অর্থ হচ্ছে একটি দেশ নির্ধারণ করবে কোন পণ্য উৎপাদন বা সার্ভিস 'প্রভাইড' করে দেশটি লভবান হবে। বিশ্বায়ন এ ধরনের একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। আবার চীন ও বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চীন ক্ষুদ্র ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্বের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণ করেছে। সস্তা শ্রমের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

অন্যান্য দেশ এটি পারেনি। বিশ্বায়নের কারণে অনেক উৎপাদিত পণ্যের দাম অনেক কমে গিয়েছিল। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস পণ্যের ক্ষেত্রে। একদিকে চাহিদা বাড়ছিল, সেই সাথে কমছিল পণ্যের দামও। কাঁচামালের জোগান অনেক সস্তা ও সহজ হয়েছিল, (বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর কাঁচামাল), যা উৎপাদনকারীদের ব্যাপক উৎসাহ জুগিয়েছিল। বিশ্বায়ন বিশ্বের বড় বড় উৎপাদনকারী হাউজ কিংবা বিক্রয় হাউজগুলোর জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, যাতে করে তারা স্থানীয় আইনের কড়াকড়ি এড়িয়ে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) যেসব দেশে আইন অত কঠোর নয়, সেখানে তাদের পণ্য উৎপাদন করা। এক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলোর আইন অত কঠোর ছিল না। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এই সুযোগটি নিয়েছিল। বিশ্বায়নের ফলে, উন্নয়নশীল দেশে এক ধরনের *'জ্ঞান ট্রান্সফার'* হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো (যেমন বাংলাদেশ) উন্নত দেশের প্রযুক্তিগত জ্ঞান (বিনিয়োগের সুযোগে) নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বিশ্বে নেতৃত্বে দেখার ক্ষমতাও অর্জন করেছে (বাংলাদেশের তৈরি পোশাক)। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বে বেকার সমস্যা সমাধানে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ওইসব দেশের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল থাকায়, তাদের পক্ষে ব্যাপক শিল্পায়ন সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের কারণে একদিকে বিনিয়োগ বেড়ে যায়। নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আর এতে করে ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়। এই কর্মসংস্থান হতো না, যদি না বিশ্ব উন্মুক্ত হতো এবং রাষ্ট্রগুলো বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিদ্যমান আইন, তাতে কিছুটা শিথিলতা আনতো। বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে এই দেশগুলোতে কর্মসংস্থান হয়েছে। বিশ্বায়নের কারণে নতুন কিছু (১০টি) দেশের জন্ম হয়েছে, যাদেরকে আইএমএফ বলছে Big Emerging Markets (BIM)। এই Big Emerging Market দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও তুরস্ক। বিশ্বায়ন নিঃসন্দেহে এই দেশগুলোকে নতুন শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশ্বায়ন বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকও আছে। বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু দেখা গেল সরকার তথা আইনকানুনের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে নতুন নতুন ধনী শ্রেণি তৈরি হয়েছে। সেখানে শ্রমিক শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিকরা কখনোই লাভাংশের

কোনো অংশ পায় না। উপরন্তু দেখা গেছে সদ্য গজিয়ে ওঠা নব্য ধনী শ্রেণি দেশের প্রচলিত আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশে দেশের সম্পদ পাচার করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে গত ২৯ জানুয়ারি (২০১৯)। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিদেশে টাকা পাচারের দ্বিতীয় অবস্থান বাংলাদেশ। ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা *গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি* (জিএফআই) এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে চার প্রক্রিয়ায় ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। এই টাকার বেশির ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে পাচার করা হয়। জিএফআই এর মতে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক লেনদেনের ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনোভাবেই পাচার হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য নিয়ে বহুজাতিক সংস্থার পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে তারা স্থানীয়ভাবে যেমনি বাজার পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও তারা যেতে পারছে না। বহুজাতিক সংস্থার পণ্য এক ধরনের মনোপলি তৈরি করেছে। যেমন কম্পিউটারে মাইক্রোসফট এর উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য, স্বীকৃত ও তারা একটি বিশাল বাজার তৈরি করেছে। অনেকটা তাদের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি। ওরা যেসব পণ্য তৈরি করে, আমরা তা ব্যবহার করতে বাধ্য থাকি। এইসব বহুজাতিক সংস্থা তাদের পণ্যের অংশবিশেষ স্বল্প বেতনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশে তৈরি করে। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধিতে তাদের আগ্রহ থাকে কম। ফ্রি ট্রেডের সুযোগে তাদের মাঝে শোষণ করার প্রবণতা থাকে। কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা কিংবা জীবনমানের উন্নতির ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকে কম। প্রায় সময়ই তারা আন্তর্জাতিক আইনের সূত্র উল্লেখ করে অনেক নিয়মকানুন পণ্যের কোয়ালিটি কন্ট্রোলের নামে চাপিয়ে দেয়। এজন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তদারকি তারা নিশ্চিত করে (বাংলাদেশে একর্ড, তৈরি পোশাক খাতে)। এইসব নিয়মকানুনের বেড়াজালে তারা আটকে যায়। বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়নেও বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষ কিছু উৎপাদিত পণ্যের উপর গুরুত্ব বেশি দেওয়ার কারণে অন্যান্য শিল্প বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বায়নের কারণে এক ধরনের Structural Unemployment তৈরি হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ভারতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম পাচ্ছে না। কারণ ভারতে বড় বড় চেইনশপগুলো তাদের প্রতিটি শাখায় বৈশ্বিক ফার্মগুলোর খাদ্যপণ্য কম মূল্যে বিক্রি করে থাকে। এতে স্থানীয় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম পায় না। তাদের মাঝে হতাশা থেকে তৈরি

হয় বেকারত্ব। এটাকেই বলা হচ্ছে Structural Unemployment। এটা উন্নয়নশীল বিশ্বের 'কমন চিত্র'। বিশ্বায়ন মূলত পুঁজিবাদের নতুন একটি রূপ। এতে করে ধনী ও গরিব রাষ্ট্রগুলোর মাঝে বৈষম্য আরো বেড়েছে। ধনী দেশগুলো আরো ধনী হয়েছে, আর গরিব দেশগুলোতে গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।

বিশ্বায়নের কারণে কর্পোরেট হাউজগুলোর দৌরাত্ম্যের কারণে বিশেষ এক ধরনের অসমতা তৈরি হয়েছে। নিচের এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা অসমতার একটি চিত্র পাবো।

সারণি : ২১

অসমতার চিত্র

• ২০১৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বের শতকরা ৭০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে ১০ হাজার ডলারের নিচে সম্পদ রয়েছে। অথচ মাত্র ০.৭ ভাগ লোকের কাছে ১০ লাখ ডলার বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে।
• বিশ্বের ৬ ভাগ মানুষের কাছে আছে বিশ্ব সম্পদের ৫২ ভাগ। ধনী ২ ভাগের কাছে আছে ৫১ ভাগ বিশ্ব সম্পদ। মোট বিশ্ব সম্পদের ৮৫ ভাগ আসার ১০ ভাগ মানুষের কাছে কেন্দ্রীভূত।
• বিশ্ব জনসংখ্যার ৫০ ভাগ ১ শতাংশ সম্পদের মালিক।
• বিশ্ব সম্পদের পরিমাণ ১২৫ ট্রিলিয়ন ডলার।
• ১১২৫ জন বিলিওনিয়ার (ডলার) ৪ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক
• বিশ্বের ৮০ ভাগের উপর মানুষ দৈনিক বেঁচে থাকে ১০ ডলারের নিচে আয় করে। জনগোষ্ঠীর ৫০ ভাগ বেঁচে থাকে দিনে ২ ডলারের নিচে আয় করে। আর ২০ ভাগ মানুষ বেঁচে থাকে ১.২৫ ডলারের নিচে আয় করে।
• ৪৩ ভাগ মানুষের (৩.১৪ বিলিয়ন) দৈনিক আয়, ২.৫ ডলারের নিচে। আর ২১.৫ ভাগ মানুষের (১.৪ মিলিয়ন) আয় দৈনিক ১.২৫ ডলারের নিচে।
• ২০০৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্নয়নশীল বিশ্বের ১৭ ভাগ মানুষ একরকম না খেয়ে থাকতো।
• ৭৮ ভাগ মানুষ গরিব (বছরে যাদের আয় ৩,৪৭০ ডলারের নিচে)।
• ইন্দোনেশিয়া কিংবা ডমিনিকান রিপাবলিক সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ জিডিপির ২-৩ ভাগ। সুইডেন কিংবা ফ্রান্সে এর পরিমাণ প্রায় ৩০ ভাগ।

সূত্র : Global Inequality, Inequality.org, The Gini coefficient, www.spiegel.de, United Nations Research Institute for Social Development, en-wikipedia.org

উপরে উল্লিখিত পরিসংখ্যানই আমাদের বলে দেয় বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে বড় পরিবর্তন আসলেও, এর সুফল সব দেশ পেয়েছে এটা মনে হয় না। দারিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিত্যসঙ্গী। কন্যাশিশুরা এখনও বহুমাত্রিক দারিদ্রের শিকার। এটা ঠিক বিশ্বায়ন অনেক দেশে ব্যক্তিগত খাতের প্রসার ঘটিয়েছে। এর ফলে ওইসব দেশে নব্য ধনী শ্রেণির জন্ম হয়েছে (চীন, ভারত, বাংলাদেশ)। সেখানে কিছু কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে করে সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র দূর হয়নি। আমরা পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক (২০২০) হিসাব অনুসারে এ দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ২০ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। এই হিসাবে সংখ্যাটি প্রায় এখন ৩ কোটি ৪০ লাখ। ২০২০ সালের করোনা ভাইরাসের কারণে যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে, তাতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউনের কারণে পরিবারের আয় ন্যূনতম এক চর্তুথাংশে কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে যে সাফল্য দেখিয়েছিল, তা নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দরিদ্রের হার ছিল ৪০ শতাংশ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র পরিপূর্ণভাবে দূর হয়নি।

বিশ্বায়ন নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। মার্কসবাদীরা এটাকে সাম্রাজ্যবাদী নয়া কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত মনে করেন, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ চালিত বিশ্বায়ন সামরিক শক্তি প্রয়োগের এক নতুন দিশায় আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বায়নের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সামরিক শক্তি জোরদার করা এবং সেই শক্তির প্রয়োগ। এই অশুভ পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার মতে, আমেরিকার নতুন সামরিক তত্ত্ব দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত–ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরে দুনিয়ায় আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক আধিপত্য এবং সামরিক ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে তার একচেটিয়া অধিকার (দেখুন অমিয়কুমার বাগচী সম্পাদিত গ্রন্থ বিশ্বায়ন, ২০০৫)। মার্কসীয় অর্থনীতির প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব পল মার্লার সুইজির মতে, পুঁজিবাদকে যদি অবাধে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয়, তবে তা সত্যিই মানব সভ্যতার ইতিহাসের অবসান ঘটাবে (ওই)। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়ন বিরোধী যে বিক্ষোভ

লক্ষ করা যায়, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিস লিখেছেন, গোটা পৃথিবীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মিথস্ক্রিয়া তার মূল অবলম্বন হলো তাদের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি। অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নীতির সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই। তার মতে, 'ঠান্ডা যুদ্ধ' এর অবসানের পর বিশ্ব অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমেই জোরদার হয়েছে। এই নতুন কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে একদল অর্থনীতিবিদ, আমলা এবং অধিকারিকদের চেষ্টার অন্ত নেই এবং তারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধি। এই কারণে তাদের যে ভূমিকা, তা এই সমস্ত দেশেরই স্বার্থ সহায়ক। অথচ, তারা অর্থনীতির যে ভাষায় কথা বলেন, তা সাধারণ মানুষেরা কতখানি বোঝেন, তাতে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটাস এডওয়ার্ড এস হারমান মনে করেন, বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত যাবতীয় তত্ত্বসমূহের অন্যতম। অন্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলো হলো মূলত দেশীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব, যেকোনো প্রকার অনিয়ম, বাজেটের ভারসাম্য, সামাজিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং মুক্ত বাণিজ্য। অধ্যাপক হারমান তার একটি প্রবন্ধে (বিশ্বায়নের বিপদ) মন্তব্য করেছেন এভাবে—সাম্প্রতিককালে জনগণ এক গণতন্ত্র বিরোধী প্রবল প্রতিবিপ্লবের মধ্যে বাস করছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো সুকৌশলে উচ্চ শ্রেণির নাগরিকদের আধিপত্যবাদের পক্ষেই সক্রিয়। এই প্রক্রিয়া যেহেতু সংখ্যাগুরু মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে, তাই এই পদ্ধতির গর্ভেই অবস্থান করছে তার ধ্বংসের বীজ। শুধু তাই নয়, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত মুনাফার লিপ্সা নষ্ট করছে পরিবেশগত ভারসাম্য। প্রকৃত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবার মাধ্যমে অচিরেই রোধ করা প্রয়োজন এই ধ্বংসাত্মক বিশ্বায়নের বাণিজ্য যাত্রা (ওই)। অধ্যাপক হারমানের মতো আরো অনেক স্কলারের মতে আমরা উল্লেখ করতে পারবো, যারা বিশ্বায়নের সমালোচনা করেছেন এবং বলতে চেষ্টা করেছেন যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গণতন্ত্র বিরোধী এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থের বিরোধী। কেউ কেউ আবার নতুন একটি 'বিশ্ব' চিন্তা করেছেন যেখানে ক্ষমতা বিরাজ করবে। এদের একজন ছিলেন প্রয়াত সামির আমিন, যিনি পরিচিত ছিলেন নব্য মার্কসবাদী হিসেবে। তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেছেন এভাবে যে, একবিংশ শতাব্দী আমেরিকার শতাব্দী হবে না। ওয়াশিংটন ও পুঁজির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করার মতো সামাজিক সংগ্রাম জন্ম নেবে এবং সেটা হবে একটা

তীব্র দ্বন্দ্ব। আধিপত্যকারী শ্রেণিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলবে সংকট। একটি দ্বন্দ্ব ক্রমশ আন্তর্জাতিক সংকটপূর্ণ রূপ নেবে। তার ফলে তা বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। এর প্রথম পূর্বাভাস একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও তাদের অনুগত মিত্র অস্ট্রেলিয়া, অপরদিকে চীন ও অন্যান্য এশিয়া দেশগুলোর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সামির আমিন নব্য মার্কসবাদী। তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষেই কথা বলেছেন। এরা একুশ শতকের পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করেছেন– *'সমাজতন্ত্র'* ও *'বর্বরতন্ত্র'*। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে তিনি 'বর্বরতন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং বিশ্বায়নকে আমরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্বে বিশ্বায়ন বিরোধী একটা বড় জনমত রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোরে শুরুতে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, এটা তারই প্রতিফলন। কিন্তু এতে করে বিশ্বব্যাংক, কিংবা আইএমএফ এর মতো সংগঠনের 'এপ্রোচে' খুব একটা পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু একুশ শতকে এসে মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের বিকাশ কতটুকু সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বের দারিদ্র পরিপূর্ণভাবে দূর করতে পারেনি। একুশ শতকে বড় পুঁজি শক্তিশালী হয়েছে। কর্পোরেট হাউজগুলোর দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে একটি সার্বভৌম দাবি-যার মাঝে আছে মানবিক গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সমতাভিত্তিক সমাজ প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ, পুঁজির সুষম বণ্টন, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ

বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ ইতোমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম অভিযোগটি ছিল বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে গেলেও, দেখা গেছে বিশ্বে ধনী ও গরিবের মাঝে ব্যবধান বেড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে যেখানে লোকসংখ্যা ছিল ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন, বর্তমানে তা ৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন পৌঁছেছে। ২০৫০ সালে তা ৯ দশমিক ৭ বিলিয়নে পৌঁছবে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা, তাদের ন্যূনতম জীবন ধারণের মান নিশ্চিত করা, দারিদ্র দূর করা ইত্যাদি বিশ্বায়ন নিশ্চিত করতে পারেনি। অক্সফাম (OXFAM)* যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে

* অক্সফামের ২০২০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় বিশ্বের ৪.৬ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মোট সম্পদের চেয়ে বিশ্বের ২১৫৩ জন ধনীর কাছে বেশি সম্পদ আছে। এই জনগোষ্ঠী বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ৬০ ভাগ।

স্পষ্ট দেখা যায় বিশ্ব স্পষ্টতই দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একভাগে ধনী রাষ্ট্র, অন্যদিকে গরিব রাষ্ট্র। গরিব রাষ্ট্রগুলো ধনী রাষ্ট্রের জনগণের মনোন্নয়নের কাজ করেছে। কিন্তু তাদের নিজেদের স্বার্থে ধনী রাষ্ট্রগুলো কাজ করেনি। দ্বিতীয়ত, ধনী রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বার্থে 'যুদ্ধ' গরিব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আল কায়দার উত্থান ও খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা একটি বড় উদাহরণ। এই হামলাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনী রাষ্ট্রগুলো ২০০১ সালে আফগানিস্তান দখল করে নেয়। অভিযোগ ছিল আফগানিস্তানের তালেবানরা আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল। এই অভিযোগে তুলে যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক, ২০১১ সালে লিবিয়া দখল করে নেয়। ২০২০ সালে এসেও এই অঞ্চলে যুদ্ধ থামেনি। মার্কিন অর্থনীতি হচ্ছে যুদ্ধ অর্থনীতি। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি বৃদ্ধি পায়, স্থানীয় যুদ্ধ যদি সম্প্রসারিত হয়, তাহলে অস্ত্রের চাহিদা বাড়ে। আর অস্ত্র বিক্রি বাড়লে অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। আমরা একটা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখতে পারবো কীভাবে ধনী রাষ্ট্রগুলো অস্ত্র বিক্রি করে লাভবান হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর উন্নয়নে তারা আদৌ কোনো অবদান রাখেনি। অস্ত্র বিক্রির অর্থ দিয়ে আফ্রিকার মানুষদের জীবনমানের উন্নয়ন করা সম্ভব ছিল।

পরিসংখ্যান বলছে যে বিশ্বায়ন নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর জীবনমানের আদৌ কোনো উন্নতি সাধন করতে পারেনি। এই দেশগুলো দক্ষিণ এশিয়া ও সাব সাহারা অঞ্চলে অবস্থিত। বিশ্বায়ন উন্নত বিশ্বকে আরও ধনী করলেও, সাব সাহারার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে দারিদ্রমুক্ত করতে পারেনি। বিশ্ব জিডিপির মাত্র ২ ভাগ এ অঞ্চলের, অথচ দেশের সংখ্যা ৪৬টি। ৭৩৬ মিলিয়ন মানুষ এখনও এখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন গরিব দেশগুলোর জন্য অভিশাপ হয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্ব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে পারলেও, গরিব দেশগুলো এক্ষেত্রে ব্যর্থ। এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মানুষ 'জলবায়ু উদ্বাস্তুতে' পরিণত হবে। গরিব দেশগুলোর ২ থেকে ৬ মিলিয়ন মানুষের টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বায়ন এদের জন্য কোনো আশীর্বাদ হয়ে আসেনি। বরং ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়ে দিয়েছে। করোনাভাইরাসের সময় নাইজেরিয়ার ৬০ মিলিয়ন মানুষ (তিন ভাগের এক ভাগ) নিজেদের বাড়ি, ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে শুধুমাত্র সুপের পানি প্রাপ্তি ও স্যানিটেশনের নিশ্চয়তার আশায়। বিশ্বায়ন তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেনি। অথচ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বায়নের বড় সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হয়েও, যুদ্ধের পেছনে যে অর্থব্যয় করেছে

(২০০১ সালের পর আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার), তার একটি অংশ দিয়ে আফ্রিকা তথা সাব সাহারা অঞ্চলের মানুষের জীবনমান পালটে দেওয়া যেত। যুক্তরাষ্ট্র এক বছর পারমাণবিক কর্মসূচিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তা দিয়ে ৩ লাখ আইসিইউ বেড তৈরি করা সম্ভব, ৩৫ হাজার ভেন্টিলেটর তৈরি করা যায় ও ৭৫ হাজার ডাক্তারের বেতন দেওয়া যায় (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons এর উদ্ধৃতি দিয়ে News week ২৬ মার্চ ২০২০)। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন। তাই যুদ্ধ হচ্ছে এবং হবে আগামীতেও। যুদ্ধ এখন সাব সাহারা অঞ্চলে সম্প্রসারিত হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় অস্ত্র বিক্রিতে, প্রতিরক্ষা খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দ বেশি দেখুন। নিচে সম্পদ কীভাবে বেড়েছে, তার একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

সারণি : ২২

বিশ্বে শীর্ষ ধনীদের তালিকা

নাম	সম্পদ (বিলিয়ন) (মার্চ ১৮, ২০২০)	সম্পদ (বিলিয়ন) (মে ১৯, ২০২০)	সম্পদ বেড়েছে	শতকরা বৃদ্ধি	প্রতিষ্ঠান
জেফ বেজোস	১১৩.০	১৪৭.৬	৩৪.৬	৩০.৬%	আমাজন
বিল গেটস	৯৮.০	১০৬.০	৮.০	৮.২%	মাইক্রোসফট
মার্ক জুকারবার্গ	৫৪.৭	৮০.০	২৫.৩	৪৬.২%	ফেসবুক
ওয়ারেন বাফেট	৬৭.৫	৬৮.১	৫.৪	০.৮%	বার্কসয়ার হালথাওয়ে
লেরি এলিসন	৫৯.০	৬৬.০	৭.০	১১.৯%	ওরাকল
মোট	২৯৪৭.৫	৩৩৮২.০	৪৩৪.৫	১৪.৭	

সূত্র : Inequality, May 21, 2020

এই অস্ত্র বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখছে। ফলে বিশ্বায়নের নয়ারূপ আমরা প্রত্যক্ষ করবো আগামী দিনগুলোতে। বিশ্বায়নের এটা নয়ারূপ হবে, নাকি বিশ্বায়ন নতুন করে নির্মিত হবে-এটাই একটা প্রশ্ন। আরো একটা কথা। বিশ্বায়নের সুযোগে বিশ্বে ধনী মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে।

এখানে একটা পরিবর্তন দরকার। মে মাসে (২০২০) যুক্তরাষ্ট্রের বেকার সংখ্যা যখন ৩৮.৫ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিলিওনিয়ারদের সম্পদ শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে বেড়েছে ৪৩৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ খোদ যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে বেড়েছে বেকারত্ব, অন্যদিকে মহামারিকে কেন্দ্র করে বেড়েছে ধনীদের সম্পদ। যুক্তরাষ্ট্রের *ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ* যে Billionaire Bonzana 2020 প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় মার্চ ১৮ থেকে মে ১৯ (২০২০) সময়সীমায় ৬০০ বিলিওনিয়ারের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৯৪৮ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ৩.৩৮২ ট্রিলিয়ন ডলারে। যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্বস (Forbes) ম্যাগাজিনের হিসাব অনুযায়ী মার্চ মাসে (২০২০) বিলিওনিয়ারের সংখ্যা ছিল ৬১৪, অথচ মে মাসে (২০২০) এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩০ এ। এই পরিসংখ্যানটি বলে দেয় একদিকে ধনী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে মানুষের মাঝে দারিদ্র বাড়ছে, তৈরি হয়েছে বৈষম্য। এজন্যই বি-বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্বায়নের প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে।

বিশ্বায়ন পণ্য চলাচলকে সহজ করেছে। অতীতে এক দেশ থেকে অন্যদেশে পণ্য যেতে সময় লাগতো ও নানা কাঠখড় পোড়াতে হতো। এখন এটা সহজ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতে করে লাভবান হয়েছে কারা? পরিসংখ্যান বলছে এতে লাভবান হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলো। হার্ভার্ডের Growth Lab যে Country Complexity Ranking প্রকাশ করেছে, তাতে শীর্ষ ১০টি দেশের সবগুলোই শিল্পোন্নত ও উঠতি শিল্পোন্নত দেশ* (সূত্র : Visual Capitalist, নভেম্বর ২০, ২০১৯)। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, ১২তম। আর চীনের ১৯তম। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থান ৬৪ (আফ্রিকার শীর্ষে) বাংলাদেশের অবস্থান ১০৪তম। ১৩৩টি দেশের মাঝে সর্বনিম্নে রয়েছে গায়ানা। অর্থাৎ রপ্তানি ক্ষেত্রে পণ্যের বিভিন্নতা ও জ্ঞান (Productive Knowledge) রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। আবার যদি শুধুমাত্র রপ্তানির পরিসংখ্যান নেই, তাহলে শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকা (২০১৭) নিম্নরূপ : চীন (২.২৬৩ বিলিয়ন ডলার) যুক্তরাষ্ট্র (১৫৪৭ বি.) জার্মানি (১৪৪৮ বি.), জাপান (৬৯৮ বি.), হল্যান্ড (৬৫২ বি.), দক্ষিণ কোরিয়া (৫৭৪ বি.), হংকং (৫৫০ বি.), ফ্রান্স (৫৩৫ বি.) ও

* এই দেশগুলো হচ্ছে জাপান, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, চেক রিপাবলিক, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, হাঙ্গেরি, (২০১৭ সালের পরিসংখ্যান)। ১৯৯৭-২০১৭ সালের পরিসংখ্যান ছিল অনেকটা এরকম : জাপান, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইতালি।

যুক্তরাজ্য (৪৪৫ বি.)। অর্থাৎ তালিকায় নেই কোনো উন্নয়নশীল দেশ। উপরে উল্লিখিত পরিসংখ্যানই আমাদের বলে দেয় শিল্পোন্নত দেশগুলো তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে নিজেরা নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। অনুন্নত বিশ্ব অথবা উন্নয়নশীল বিশ্ব আদৌ উপকৃত হয়নি। রপ্তানি খাতকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলো এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে। সারণি : ২৪-এ ধনী দেশগুলোর নাম ও তাদের মোট সম্পদের বিবরণ দেয়া হলো।

সারণি : ২৩
ধনী দেশগুলোর তালিকা

র‍্যাংকিং	দেশ	অঞ্চল	মোট সম্পদ (বিলিয়ন ডলার)	বিশ্ব সম্পদের অংশ
১.	যুক্তরাষ্ট্র	উত্তর আমেরিকা	১০৫৯৯০	২৯.৪
২.	চীন	চীন	৬৩৮২৭	১৭.৭
৩.	জাপান	এশিয়া-প্যাসিফিক	২৪৯৯২	৬.৯
৪.	জার্মানি	ইউরোপ	১৪৬৬০	৪.১
৫.	যুক্তরাজ্য	ইউরোপ	১৪৩৪১	৪.০
৬.	ফ্রান্স	ইউরোপ	১৩৭২৯	৩.৮
৭.	ভারত	ভারত	১২৬১৪	৩.৫
৮.	ইতালি	ইউরোপ	১১৩৫৮	৩.১
৯.	কানাডা	উত্তর আমেরিকা	৮৫৭৩	২.৪
১০.	স্পেন	ইউরোপ	৭৭৭২	২.২
১১.	দক্ষিণ কোরিয়া	এশিয়া-প্যাসিফিক	৭৩০২	২.০
১২.	অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া-প্যাসিফিক	৭২০২	২.০
১৩.	তাইওয়ান	এশিয়া-প্যাসিফিক	৪০৬২	১.১
১৪.	সুইজারল্যান্ড	ইউরোপ	৩৮৭৭	১.১
১৫.	হল্যান্ড	ইউরোপ	৩৭১৯	১.০

সূত্র : Visual Capitalist, January 16, 2020

বিশ্বায়ন কীভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে আরো ধনী করেছে, তার একটি পরিসংখ্যান দেই। এই পরিসংখ্যানে ধনী দেশ হিসেবে ভারত উঠে এসেছে ৭ নম্বরে। শীর্ষ ১৫টি দেশের মধ্যে আফ্রিকার একটি দেশও নেই। এই ১৫টি দেশ বিশ্ব সম্পদের ৮৪.৩ ভাগ অংশের মালিক। তবে ভারত ধনী দেশে পরিণত হলেও ভারতে দারিদ্রতা আছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে জনসংখ্যার ২৩.৬ ভাগ (২৭৬ মিলিয়ন মানুষ) দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস

করে দৈনিক আয় ১.২৫ ডলার ভিত্তিতে, জাতিসংঘ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী)। এটা ঠিক ভারতে দারিদ্রতা যেমনি বাড়ছে, তেমনি আবার বিলিও নিয়াদের সংখ্যাও বাড়ছে।* এতে দেখা যায় সম্পদের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের সম্পদের একটা বিবরণ দিলাম। নাইজেরিয়া (৩.৪৪ ট্রিলিয়ন, বিশ্বের ০.১২ ভাগ), দক্ষিণ আফ্রিকা (০.৭৭ টিলিয়ন, ০.২১ ভাগ), মিশর (০.৯ ট্রিলিয়ন, ০.২৫ ভাগ)। অর্থাৎ সম্পদের দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে মিশর, তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাইজেরিয়ার স্থান। এর বাইরে এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া (১.৮ ট্রিলিয়ন, ০.৫১ ভাগ), ভিয়েতনাম (০.৮ ট্রিলিয়ন, ০.২২ ভাগ), সিঙ্গাপুর (১.৩৮ ট্রিলিয়ন, ০.৩৮ ভাগ), বাংলাদেশ (০.৭ ট্রিলিয়ন, ০.১৯ ভাগ), পাকিস্তান (০.৪৬ ট্রিলিয়ন, ০.১৩ ভাগ) রয়েছে। এই তালিকায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর অবস্থান অনেকটা এরকম : ব্রাজিল (৩.৫৪ ট্রিলিয়ন, ০.৯৮ ভাগ), চিলি (০.৭৬ ট্রিলিয়ন, ০.২১ ভাগ), কলম্বিয়া (০.৫৬ ট্রিলিয়ন, ০.১৬ ভাগ)। রাশিয়ার সম্পদের পরিমাণ (৩.০৫ ট্রিলিয়ন, ০.৮৫ ভাগ)। এই পরিসংখ্যানই আমাদের বলে দেয় বিশ্বায়নের কারণে উন্নয়নশীল বিশ্ব নিজেদের সম্পদ বাড়াতে পারেনি। অথচ পরিসংখ্যান বলছে আফ্রিকায় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে (তেল ও গ্যাস, ডায়মন্ড, সোনা, ইউরোনিয়াম, কাঠ, টিটানিয়াম, ইত্যাদি, সূত্র : আল জাজিরা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। এই সম্পদ উত্তোলন, আহরণ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করছে আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থাগুলো। আফ্রিকার দেশগুলো এই সম্পদ থেকে উপকৃত হয়নি। নাইজেরিয়ার তেল সম্পদের খবর আমরা জানি। এই সম্পদ নিয়ে নাইজেরিয়ার সেনা কর্মকর্তারা ধনী হয়েছেন, বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন (দৃষ্টান্ত, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও প্রেসিডেন্ট সানি আবাচা), কিন্তু নাইজেরিয়ার দারিদ্র দূর হয়নি। সম্পদের সমান বণ্টন হয়নি। বহুজাতিক সংস্থাগুলো তথা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো তা চায়নি।

নতুন-বিশ্বায়ন (De-Globalisation)

করোনা ভাইরাস (২০২০) সারা বিশ্বব্যাপী যেসব পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে, তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে 'ডি গ্লোবালাইজেশন' বা বি-বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্বায়ন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশ্বায়ন সারা বিশ্বব্যাপী যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং তা

* ২০১৯ সালের শীর্ষ বিলিওনাররা হচ্ছেন যথাক্রমে মুকেশ আমবানী (৫৩ বিলিয়ন সম্পদ), শক্তি মিত্তাল (১৮.৬ বি.) শিভ নাদার (১৬.১ বি.), গৌতম আদানি (১৫.৭ বিলিয়ন), রাধাকিষাণ দামানি (১৫.৬ বি.) উদয় কোটাক (১৫ বি.) প্রমুখ। সূত্র : উইকিপিডিয়া।

নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ব্যর্থতা বিশ্বায়নের সেই আবেদনকে ভেঙে দিয়েছে। বিখ্যাত নিউজম্যাগাজিন ইকোনমিস্টের গত ১৬ মের (২০২০) প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছিল Goodbye Globalisation–বিদায় বিশ্বায়ন! *ইকোনমিস্টের* মতে বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব বাণিজ্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বায়ন বিশ্ব অর্থনীতিকে দু'দশক ধরে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে ধ্বস নামিয়েছে এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য বৃদ্ধির সূচনা করতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়েছে এবং নতুন করে এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা করতে যাচ্ছে। করোনা নোভেল ভাইরাস *কোভিড-১৯* পৃথিবীর ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিসংখ্যানই আমাদের বলে দেয় বিশ্ব অর্থনীতির ব্যর্থতাটা কোথায়। বিশ্বায়ন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতিতে পরিণত করলেও (২০১৯ সালে সাধারণ নিয়মে জিডিপির পরিমাণ ২১.৪২ ট্রিলিয়ন (Trillion) ডলার), স্বাস্থ্য সেক্টরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা চরমে পৌছেছে। করোনা ভাইরাস বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে, তা ১৯৩০ সালের পর বিশ্বে আরেকটি মহামন্দার জন্ম দিতে যাচ্ছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য এখন থমকে গেছে। মেক্সিকো যে গাড়ি রপ্তানি করতো, তা শতকরা ৯০ ভাগ কমে গেছে। হিথরো বিমানবন্দরের (লন্ডন) যাত্রী ম্যুভমেন্ট শতকরা ৯৭ ভাগ কমে গেছে। যাত্রীবাহী অনেক বিমান সংস্থা এখন তাদের ব্যাবসা গুছিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে অথবা জনবল ছাঁটাই করছে।* প্রশান্তমহাসাগর দিয়ে কনটেনইনার পরিবহন হ্রাস পেয়েছে শতকরা ২৩ ভাগ। অথচ বিশ্বায়নের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অবাধ যাত্রী ম্যুভমেন্ট, সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া, আর অবধ বাণিজ্য। তখন তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সিএনবিসি গত ২৪ এপ্রিল (২০২০) তাদের এক প্রতিবেদনে ৭টি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছে, যেখানে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী বেকার সমস্যা বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে এই হার শতকরা ৪.৪ ভাগ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩.৮ ভাগ, জার্মানিতে ৫ ভাগ, অস্ট্রেলিয়ায় ৫.২ ভাগ, আর চীনে ৫.৯ ভাগ। খুচরা বিক্রি অর্থনীতির অন্যতম একটি শক্তি। কিন্তু দেখা যায় চীনে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এর পরিমাণ যেখানে ছিল ১০ ভাগ, সেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ এর পরিমাণ কমেছে মাইনাস ১৫.৮ ভাগ।

* ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলোর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৪.৩ বিলিয়ন ডলার (NDTV.com, Jun 10, 2020)।

যুক্তরাষ্ট্রে ওই সময় এর পরিমাণ ০.০ ভাগ থেকে কমেছে মাইনাস ৬.২ ভাগ। পিএমআই (PMI-Purchasing Managers Index) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক। PMI যদি ৫০ এর নিচে থাকে তা অর্থনীতিতে সংকোচনের আভাস দেয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনে সার্ভিস সেক্টরে PMI-এর পরিমাণ ৪৩, যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯.৮ জাপানের ৩৩.৮ আর ইউরো জোনের ২৬.৪।



চিত্র : বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভের একটি চিত্র

অন্যদিকে উৎপাদন খাতে PMI, চীনে ৫০.১, যুক্তরাষ্ট্রে ৪৯.১, জাপানে ৪৪.৮। আর ইউরো জোনে ৪৪.৫। অর্থাৎ শুধুমাত্র চীনে উৎপাদন খাত সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্যান্য অঞ্চলে সংকুচিত হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্যের যে প্রাক্কলন করেছে, তাতে দেখা যায় বিশ্ব বাণিজ্যে ১২.৯ থেকে ৩১.৯ ভাগ পর্যন্ত ঘাটতি হবে। এই বাণিজ্যে প্রতিটি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা বিশ্বায়ন বা মুক্ত বাণিজ্যের পরিপন্থি। আইএমএফ-এর মতে বিশ্ব জিডিপি ২০২০ সালে হ্রাস পাবে মাইনাস ২.৫ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি প্রবৃদ্ধি মাইনাস ৬ ভাগে হ্রাস পাবে। জাপান ও জার্মানিতেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি মাইনাস ৫ ও মাইনাস ৭ ভাগে হ্রাস পাবে। শুধুমাত্র চীনে প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে প্লাস ৫ ভাগের উপরে। আইএমএফ এর মতে ২০২০ সালে বিশ্ব প্রায় ৯ ট্রিলিয়ন (Trillion) ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হবে। বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম বলছে চলতি ২০২০ সালে ১৭০টি দেশে মাথাপিছু আয় কমবে।

আমরা পরিসংখ্যানগুলো উল্লেখ করলাম এ কারণে যে বিশ্বায়ন যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, সেই সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটেছে এখন। বলা যেতে পারে

বিশ্বায়নের 'মৃত্যু' ঘটেছে। তবে চীন ঘুরে দাঁড়াবে। এখন চীন একটি নতুন ধরনের বিশ্বায়নের জন্ম দিতে পারে। অথবা বিশ্বায়ন নতুন করে নির্মাণ হবে, যেখানে কর্পোরেট হাউজগুলো প্রফিট বা লাভের চাইতে মানবিক বিষয়গুলো (যেমন স্বাস্থ্য খাত) গুরুত্ব পাবে বেশি।

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব

কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে বিশ্বায়নের ধরন কী হবে, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। 'বিশ্বায়নের মৃত্যু হবে'-এ ধরনের অভিমত যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি এমন অভিমতও রয়েছে যে বিশ্বায়নের ধরন বদলে যাবে। এ ব্যাপারে টাইম ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া বিভাগের অধ্যাপক অর্জুন আপ্পাদুরাই (Arjun Appadurai)। তার প্রবন্ধের নাম 'Coronavirus won't kill Globalization, But It will look different afler the Pandemic (Time, May 19, 2020)। যদিও অধ্যাপক আপ্পাদুরাই এটা বলার চেষ্টা করেছেন যে কোভিড-১৯ সংকটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থি একটা প্রবণতা অনেক দেশে জন্ম হয়েছে এবং তারা এমন সব কর্মসূচি নিচ্ছেন (ইমিগ্রেশন বিরোধী, ইসলাম বিরোধী), যা প্রকারন্তরে বিশ্বায়নের স্পিরিটের পরিপন্থি। তার মতে, 'Just as COVID-19 is a virus with global qualities, globalisation is itself viral. But all viruses evolve, and globalization is not different.'। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মাত্রা পেয়েছে। ঠিক তেমনি, বিশ্বায়নেরও একটি বৈশ্বিক মাত্রা রয়েছে। তার মূল্যায়ন হচ্ছে 'Since globalization is here to stay, it is the system of nation states that might well be forced to change, in ways that some might welcome, and others will resist. That battle will outlast the story of COVID-19'। বিশ্বায়ন থাকবে, এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন ব্যাখ্যা হাভার্ডের অধ্যাপক স্টেফেন এম. ওয়াল্ট এর (Stephen M. Walt) *ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে* লিখিত এক প্রবন্ধে (The Realist's Guide to the coronavirus outbreak, March 9, 2020. তিনি লিখেছেন, if the epidemic does not subside quickly and more or less permanently (as the 2003 SARS epidemic did), it will reinforce the growing trend, toward deglobalisation that is already underway.'–যদি করোনা ভাইরাস মহামারিটি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে বিশ্বায়নকে নতুন করে পুনর্গঠন করতে হবে, যে প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। নব্বই-এর দশকে বিশ্বায়নের সুবিধা তো মানুষ ভোগ করেছে- বাণিজ্যের সূত্র ধরে বিশ্ব কানেকটেড হয়েছে, সস্তায় দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। অবাধ ভ্রমণের কারণে বিশ্ব একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে।

সীমান্ত উঠে যাবার কারণে মানুষ মানুষ যোগাযোগ বেড়েছে, বিশ্ব অর্থনীতি এক কাতারে মিশেছে। ডিজিটাল বিপ্লব দ্রুত বদলে দিয়েছে বিশ্বকে। আর পুঁজিবাদ নির্ভর লিবারেল ডেমোক্রেসির মধ্যে দিয়ে মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে। মানুষের আয়ও বেড়ে গেছে। এসবই বিশ্বায়নের প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াল্টের মতে 'From a realist perspective, therefor, the coronavirus is likely to give states another reason to limit globalisation'। তিনি এমন মন্তব্যও করেছেন যে, 'Hyperglobalisation made the global financial system more vulnerable to crises and created serious domestic political problems due to job displacement'। মিথ্যা বলেননি ওয়াল্ট। প্রযুক্তি নির্ভর অনেক চাকরি চলে গেছে ইমিগ্রেন্টদের হাতে। ট্রাম্প এটা ব্যবহার করেই *'America First'* এই ধারণা নিয়ে এগিয়ে গেছেন। অধ্যাপক ওয়াল্টের মতো প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হ্যারল্ড জেমস (Harold James) এর অভিমতও অনেকটা তেমনই 'We should not be surprised if the crisis leads to far-reaching, historically significant global change.-করোনা ভাইরাস বিশ্বে পরিবর্তন আনলে অবাক হবো না। তার মতে it is entirely possible that COVID-19 will Precipate the waning of globalisation- বিশ্বায়নের জন্য একটি ক্ষতচিহ্ন বয়ে আনবে কোভিড-১৯ মহামারিটি (দেখুন, Harold James, A Pandemic of Globalisation, *Project Syndicate*, Feb 28, 2020)। এটা ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথমবারের মতো বিশ্বায়নের ধারণায় এক ধরনের পশ্চাৎপদতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন পিছু হাঁটছে (Douglas A. Irwin, The Pandemic adds momentum to the deglobalisation trend, PIIE, April 23, 2020)। যে স্পিরিট নিয়ে বিশ্বায়ন বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় অবদান রেখেছিল, তা কোভিড-১৯ এর কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে পুরোপুরি ইউটার্ন অর্থাৎ আগের অবস্থানে হয়তো ফিরে যাওয়া সম্ভব না। কনসেন্টটা ঠিক রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন আসবে। কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। একটি 'মানবিক বিশ্বায়ন' হয়তো আমরা দেখবো আগামী দিনগুলোতে, যেখানে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির স্থানে স্থান পাবে মানবিক মূল্যবোধগুলো। স্বাস্থ্যসেবার ধরন পালটে যাবে। ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। কর্পোরেট সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে। প্রটেকশনিজম এর আওতা বাড়বে। এক সময় ফ্রি ট্রেড বা মুক্ত অর্থনীতির কারণে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এখন স্থানীয় শিল্পে প্রণোদনা বাড়বে, বিদেশি পণ্যের অবাধ চলাচলে বাধানিষেধ আসবে। তবে একুশ শতকে বিশ্ব যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, সেখান থেকে ত্রিশ

বছরের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে পরিবর্তন যে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭০ সালে বিশ্ব বাণিজ্যে জিডিপির অংশ যেখানে ছিল ৩০ ভাগের কিছুটা উপরে, ২০০৮ সালে তা উপনীত হয় ৬০.৯ ভাগে, আর ২০১৮ সালে তা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৫৯.৫ ভাগে (Statista Infographics Bulletin, ২৮ মে, ২০২০)। এই প্রবণতা এখন কমবে। একই সাথে চীন কীভাবে বিশ্বের উৎপাদনখাত নিয়ন্ত্রণ করতো, তার একটি পরিসংখ্যান দেই। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের উৎপাদন খাতের ২৮.৪ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো চীন যুক্তরাষ্ট্র ১৬.৬ ভাগ, জাপান ৭.২ ভাগ, জার্মানি ৫.৮ ভাগ, দক্ষিণ কোরিয়া ৩.৩ ভাগ, ভারত ৩.০ ভাগ, ইতালি ২.৩ ভাগ, ফ্রান্স ১.৯ ভাগ, যুক্তরাজ্য ১.৮ ভাগ ও মেক্সিকো ১.৫ ভাগ Statista, Feb 18, 2020)। সুতরাং বোঝাই যায় বিশ্বায়ন চীনের জন্যও একটি বড় সুযোগে তৈরি করেছিল। এটাতে এখন কী পরিবর্তন আসে, সেটাই লক্ষ করার বিষয়। তবে পরিবর্তন যে আসবে, তা অবশ্যম্ভাবী। এখন বিশ্বায়ন থেকে বিশ্ব যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কি হবে, এটা নিয়ে স্কলারদের মাঝে দ্বিমত আছে। হার্ভাডের অধ্যাপক ডানি রডবিক (Dani Rodrik) মনে করেন, 'although the retreat from hyper globalism could potentially endanger human prosperity, it could also result in a more sensible, less intrusive model that focuses on areas Where international cooperation truly Pays off'। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের *Council on Foreign Relation* এর রিচার্ড এন. হাস (Richand N. Hass) এর অভিমতও একই রকমের। তার মতে, বড় ধরনের মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার আক্রমণ, সন্ত্রাসবাদ কিংবা পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণের বিষয়গুলোতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংলাপ ও সহযোগিতা দরকার। এটা না হলে এসব সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বিশ্বায়নের স্পিরিটটা এজন্যই জরুরি। কেনিয়ার একজন মন্ত্রী আমিনা মোহম্মদ, যিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার জেনারেল কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, তিনিও স্বীকার করেছেন যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ব এগিয়ে যেতে পারবে না। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিনেলপি কওজিয়ানু গোল্ডবার্গ (Pinelopi Koujianou Goldberg) মনে করেন 'the COVID-19 crisis has not furnished any good arguments against trade or global supply chains-althoush the latter need some built is redundancy to make them more crisis-sesilient'। অর্থাৎ Covid-19 মহামারি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনি, যার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য ও সাপ্লাই চেইনকে দায়ী করা যেতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে,

সারণি : ২৪
দারিদ্র। কিছু তথ্য

- ৭৩৬ মিলিয়ন মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যসীমায় নিচে বাস করে। সাব সাহারা অঞ্চলে বেশি দরিদ্রলোক বাস করে। এই সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল ২৭৮ মিলিয়ন, ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ৪১৩ মিলিয়ন। বিশ্বের ২৮টি দরিদ্র দেশের মাঝে ২৭টি সাব সাহারা অঞ্চলে অবস্থিত।
- নাইজেরিয়া ভারতকে অতিক্রম করে সবচেয়ে বেশি দরিদ্রলোক বাস করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ১০.৭ ভাগ কন্যাশিশু স্কুলে যেতে পারে না দারিদ্রের কারণে। আফগানিস্তানে এই সংখ্যা ৪৪ ভাগ। দক্ষিণ এশিয়ায় ২২.৭ ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্রতম ১০ জন লোকের মাঝে ৯ জন বাস করবে সাব সাহারা অঞ্চলে
- ৬৮.৪ মিলিয়ন মানুষ বাধ্য হয়ে শরণার্থী হিসেবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এইসব শরণার্থীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ বাস করছেন উন্নয়নশীল দেশসমূহে। (উগান্ডা, বাংলাদেশ, কলম্বো)। এদের মাঝে শতকরা ৭০ জন অমানবিক জীবনযাপন করছেন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেকে শরণার্থী হয়েছেন। ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া, সাব সাহারা আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা থেকে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে অন্যত্র বসবাস করতে বাধ্য হবেন।
- শতকরা ৯১ ভাগ মানুষ এমনসব জায়গায় বসবাস করে যেখানকার বাতাসের মান অত্যন্ত নিম্নমানের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বায়ুদূষণে প্রতিবছর ৭ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়, যার নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের নাগরিক।
- আর্বজনা একটা বড় সমস্যা। শতকরা ৩৩ ভাগ আবর্জনা অব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে ডাম্পিং করা হয়, অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়, যা পরিবেশের জন্য হুমকি।
- ২.৬ বিলিয়ন মানুষের টয়লেট ও বিতদ্ধ পানির ব্যবহারের সুযোগ নেই। এরা সবাই গরিব দেশগুলোতে বসবাস করে। সুরক্ষিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না থাকার কারণে ১.৬ মিলিয়ন মানুষ প্রতিবছর মারা যায়।
- ২৬০ মিলিয়ন শিশু আদৌ স্কুলে যাবার সুযোগ পায় না।
- ২.৭ বিলিয়ন নারী পুরুষদের মতো সমকাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।
- নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর ঋণ গ্রহণ ১৮১ বিলিয়ন (২০১৬) থেকে বেড়েছে ৬০৭ মিলিয়নে (২০১৭)। এইসব দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ৭.১ ট্রিলিয়ন ডলার (২০১৭)। ১১টি দেশের মোট ঋণ আর মোট জাতীয় আয়ের (GNI) রেশিও শতকরা একশ ভাগের উপর অর্থাৎ তাদের ঋণ GNI-এর চাইতে বেশি। ২০০৭ সালে এইসব অঞ্চলের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩.০৯ ট্রিলিয়ন ডলার, ২০১৭ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৭.০৭ ট্রিলিয়ন ডলার।
- ২০৫০ সালের মধ্যে শহরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের চাইতে দ্বিগুণের বেশি লোক বাস করবে (ভারত, চীন, নাইজেরিয়া)।
- ১ বিলিয়ন মানুষ (মোট বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ১৩ ভাগ) এখনও বসবাস করে কোনোরকম বিদ্যুৎ ছাড়া (৮৭ ভাগ গ্রামাঞ্চল এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত)।

সূত্র : World Bank, Year in Review, 2018 in 14 charts

যা সংকট মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে (দেখুন, *Project Syndicate*, May 24, 2020)। এটাই হচ্ছে মোদ্দাকথা। পারস্পরিক নির্ভরশীল যে বিশ্ব গড়ে উঠেছে, সেই নির্ভরশীলতাকে বাদ দেয়া যাবে না। আমরা বিশ্বায়নের বিনির্মাণ বলি আর বি-বিশ্বায়ন বলি (Deglobalisation)। এখানে সহযোগিতার বড় প্রয়োজন। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেই। যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোতে যখন কোভিড-১৯ এর মোকাবিলার PPE*-এর প্রয়োজন হলো, তখন বাংলাদেশ ৪৫ লাখ PPE সরবরাহ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একার পক্ষে তা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই বাংলাদেশ ও চীন তা সরবরাহ করেছে। এই সহযোগিতা ছাড়া নয়া বিশ্বায়ন চলতে পারবে না। একটি মানবিক বিশ্বায়ন প্রয়োজন, যেখানে সহযোগিতা প্রধান্য পাবে, মুনাফা প্রাধান্য পাবে না।

সারণি : ২৫
অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশগুলোর তালিকা

দেশ	বিশ্ব রপ্তানির অংশ (২০১৫-২০১৯)	রপ্তানির অংশ (২০১০-২০১৪)	রপ্তানিকারক দেশের অংশ (২০১৫-২০১৯)
যুক্তরাষ্ট্র	৩৬	৩১	সৌদি আরব (২৫)
রাশিয়া	২১	২৭	ভারত (২৫)
ফ্রান্স	৭.৯	৪.৮	মিশর (২৬)
জার্মানি	৫.৮	৫.৩	দক্ষিণ কোরিয়া (১৮)
চীন	৫.৫	৫.৫	পাকিস্তান (৩৫)
যুক্তরাজ্য	৩.৭	৪.৬	সৌদি আরব (৪১)
স্পেন	৩.১	২.৯	অস্ট্রেলিয়া (৩৩)
ইসরাইল	৩.০	১.৮	ভারত (৪৫)
ইতালি	২.১	১.৭	তুরস্ক (২০)
দক্ষিণ কোরিয়া	২.১	০.৯	যুক্তরাজ্য

সূত্র : SIPRI Fact Sheet March, 2020

* PPE হচ্ছে Personal Protective Equipment বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক।

সারণি : ২৬

প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ শীর্ষে অবস্থানকারী দেশসমূহ

অবস্থানক্রম	দেশ	বাজেট বরাদ্দ (ডলার)
১	যুক্তরাষ্ট্র	৭১৭ বিলিয়ন
২	চীন	১৭৭ বিলিয়ন
৩	ভারত	৬০.৯ বিলিয়ন
৪	জার্মানি	৫৩ বিলিয়ন
৫	সৌদি আরব	৫১ বিলিয়ন
৬	যুক্তরাজ্য	৪৯ বিলিয়ন
৭	ফ্রান্স	৪৮ বিলিয়ন
৮	জাপান	৪৭ বিলিয়ন
৯	রাশিয়া	৪৬.৪ বিলিয়ন
১০	দক্ষিণ কোরিয়া	৪২ বিলিয়ন

সূত্র : Globaldata

সারণি : ২৭

শীর্ষ অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি (২০১৮)

কোম্পানি	দেশ	রাজস্বের পরিমাণ
লকহিড মার্টিন (Lockheed Martin)	যুক্তরাষ্ট্র	৪৭.২৬ বিলিয়ন
বোয়িং (Boeing)	যুক্তরাষ্ট্র	২৯.১৫ বিলিয়ন
নর্থরোপ গ্রুমম্যান (Northrop Grumman)	যুক্তরাষ্ট্র	২৬.১৯ বিলিয়ন
রেথিওন (Raytheon)	যুক্তরাষ্ট্র	২৩.৪৪ বিলিয়ন
জেনারেল ডাইনামিকস (General Dynamics)	যুক্তরাষ্ট্র	২২.০০ বিলিয়ন
বে সিস্টেমস (Bay Systems)	যুক্তরাষ্ট্র	২১.২১ বিলিয়ন
এয়ারবাস (Airbus)	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১১.৬৫ বিলিয়ন
লিওনার্দো (Leenardo)	ইতালি	৯.৮২ বিলিয়ন
আলমাজ আনতে (Almaz Antey)	রাশিয়া	৯.৬৪ বিলিয়ন
থালেস (Thales)	ফ্রান্স	৯.৪৭ বিলিয়ন

সূত্র : সপরির সূত্র থেকে Statista

* চীনের কোনো কোম্পানির পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

সারণি : ২৮

ধনী ও গরিব দেশের মাঝে পার্থক্য

• বিশ্বের মাত্র ১ ভাগ মানুষের কাছে যে সম্পদ আছে, তা বিশ্বের ৬.৯ বিলিয়ন মানুষের সম্পদের দ্বিগুণ। প্রতিবছর যে সম্পদ তৈরি হয় তার ৮ ভাগ চলে যায় ধনী মাত্র ১ ভাগ লোকের কাছে।
• বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী দৈনিক ৫.৫০ ডলার আয় করে জীবন ধারণ করে।
• ৭৩৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।
• বিশ্ব সম্পদ এর মাঝে প্রতি ডলার প্রতি মাত্র ৪ সেন্ট পাওয়া যায় কর হিসেবে।
• ২৫৮ মিলিয়ন শিশু, অর্থাৎ প্রতি ৫ জনের মাঝে ১টি শিশু স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রতি ১০০ ছেলে শিশু ও ১২১ মেয়ে শিশু তাদের স্কুলে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
• প্রতিদিন ১০ হাজার লোক স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে মারা যায়। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত না হওয়ায় প্রতিবছর ১০০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে চলে যায়।
• বিশ্বের যে সম্পদ, তার অর্ধেকেরও বেশি মালিক পুরুষ। বিশ্বের শীর্ষ ২২ জন ধনী ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা আফ্রিকার সব মহিলাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তার চাইতে বেশি। মহিলারা যেসব কাজ করেন এবং যার জন্য তারা কোনো পরিশ্রমিক পান না (যেমন গৃহস্থালি) তার পরিমাণ বছরে ১০.৮ ট্রিলিয়ন ডলারের সমান।

সূত্র : অক্সফাম

সারণি : ২৯

CRI (Commitment to Reducing Inequality) অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর অবস্থান

দেশ	স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা	করনীতি	সমতা নিশ্চিতে শ্রমনীতি	র‍্যাংকিং
সুইডেন	৯	৮	৮	১
বেলজিয়াম	৪	৩	২৪	২
ডেনমার্ক	৮	৯	১২	৩
নরওয়ে	২০	৬	৩	৪
জার্মানি	২	১৭	৬	৫
জার্মানি	২	১৭	৬	৫
ফিনল্যান্ড	৩	২৩	১০	৬
অস্ট্রিয়া	৬	৪০	১	৭
ফ্রান্স	৫	১৯	২১	৮
নেদারল্যান্ড	১৯	১৩	৯	৯
লুক্সেমবার্গ	১২	২১	১১	১০

* ১৫২ দেশের বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এসব রাষ্ট্র তিনটি ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করে, তা হিসাব করে র‍্যাংকিং করা হয়েছে। এভাবেই অসমতা হ্রাসের র‍্যাংকিং করা হয়।

সূত্র : অক্সফাম, ২০১৭

সারণি : ৩০

CRI অনুযায়ী সবচেয়ে খারাপ ১০টি দেশ

দেশ	স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা	করনীতি	সমতা নিশ্চিতে শ্রমনীতি	র‍্যাংকিং
ভুটান	১১২	১২৪	১৪১	১৪৩
টোংগা	৯৮	১০৮	১৪৪	১৪৪
বেলারুশ	৪৮	১৪৮	১৩৭	১৪৫
আফগানিস্তান	১৪১	১৩১	১৩৩	১৪৬
তিমোর লেস্টে	১৩৫	১৪৭	১২১	১৪৭
পানামা	১৪৫	১১৪	১৪০	১৪৮
আলবেনিয়া	৮৭	১৫২	৫৯	১৪৯
মিয়ানমার	১৫১	৩৮	১২৬	১৫০
বাহরাইন	১৩৩	১৫১	১০২	১৫১
নাইজেরিয়া	১৫২	১১৭	১৩৯	১৫২
বাংলাদেশ	১৪৮	৬৫	১২৭	১৪১

সারণি : ৩১

CRI এ দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

দেশ	স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা (স্কোর)	র‍্যাংকিং	করনীতি (স্কোর)	র‍্যাংকিং	সমতা নিশ্চিতে শ্রমনীতি (স্কোর)	র‍্যাংকিং	আঞ্চলিক র‍্যাংকিং
নেপাল	০.২০	২	০.৫৩	৩	০.৪৫	২	১
মালদ্বীপ	০.২৯	১	০.২৫	৪	০.৫০	১	২
ভারত	০.০৭	৮	০.৪৬	৪	০.৪০	৩	৩
শ্রীলঙ্কা	০.০৯	৫	০.৫৫	১	০.২৩	৬	৪
পাকিস্তান	০.০৮	৬	০.৪৩	৫	০.২৯	৪	৫
বাংলাদেশ	০.০৭	৭	০.৫৩	২	০.২৬	৫	৬
ভুটান	০.২০	৩	০.৩২	৬			৭
আফগানিস্তান	০.০৯	৪	০.২৭	৭	০.২০	৭	৮

সূত্র : অক্সফাম ২০১৭, CRI Index

সারণি : ৩২

যুক্তরাষ্ট্র যেসব সংস্থা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	:	২০২০ (সম্ভাব্য)
প্যারিস জলবায়ু চুক্তি	:	২০১৭
ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি)	:	২০১৭
ইরান পারমাণবিক চুক্তি	:	২০১৮
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল	:	২০১৮
আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট	:	২০১৮
ইউনেস্কো	:	২০১৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিরস্ত্রীকরণ

> Nuclear weapons, far from being "essential to preserve peace", as the current NATO doctrine has it, are in the logic of the NPT an unacceptable risk to humanity; which means that it is their elimination, not their retention, that is essential to security.
>
> **Centre for International Governance Innovation**

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য সময় দখল করে ছিল দুই সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার জন্ম হলেও, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি সত্য, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন পর্যন্ত এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে গিয়েছিল। এই অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তি (যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। মানব সভ্যতার জন্য একটি খারাপ খবর ছিল জাপানে ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। এই বোমা বর্ষণের কারণে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ জেনেছিল পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা। এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগ শুরু হলেও, এক পর্যায় দুই বৃহৎ শক্তি অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিতকরণ তথা নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ নেয়।

সাধারণ অর্থে নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় যেকোনো ধরনের অস্ত্রের উৎপাদন সীমিত করা, উৎপাদন হ্রাস করা অথবা ধ্বংস করা। সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্রের ক্ষেত্রেই নিরস্ত্রীকরণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে পারমাণবিক অস্ত্র তথা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ধ্বংসের ক্ষেত্রেও এই নিরস্ত্রীকরণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে 'balanced reduction of armed

forces and conventional armaments, based on the principle of undisminished security of the parties with a view to promoting or enhancing stability at a lower level, taking into account the need of all States to protect their security. (জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ডকুমেন্ট, ১৭ নভেম্বর, ২০১৫)।

বিশ্ব প্রথমবারের মতো মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও মৃত্যুতে মানুষের মাঝে পরবর্তীতে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল, যা অস্ত্র সীমিতকরণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম যুদ্ধে ২০ মিলিয়ন অর্থাৎ ২ কোটি মানুষ মৃত্যু বরণ করেছিল। আহত হয়েছিল ২১ মিলিয়ন। এর মাঝে সেনাবাহিনীর মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯ দশমিক ৭ মিলিয়ন। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন মোট ৫০ থেকে ৫৬ মিলিয়ন মানুষ। পরবর্তীতে আরো ১৯ থেকে ২৮ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিলেন যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন রোগশোকে। যুদ্ধের এই ভয়াবহতা থেকেই নিরস্ত্রীকরণের দাবিটি ওঠে।

নিরস্ত্রীকরণের ইতিহাস থেকে জানা যায় সাধারণত দু'ভাবে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেওয়া নিরস্ত্রীকরণ বা Enforced disarmament, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীন নিরস্ত্রীকরণ বা Voluntary disarmament। বলপূর্বক নিরস্ত্রীকরণ আমরা দেখতে পাই জার্মানির ক্ষেত্রে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হওয়ার পর সামরিক দিক থেকে দেশটিকে পঙ্গু করার জন্য জোর করে তার উপর নিরস্ত্রীকরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। *ভার্সাই* চুক্তিতে যেসব শর্ত জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই সূচনা করেছিল। এই বলপূর্বক নিরস্ত্রীকরণ প্রকৃত অর্থে ভালো কিছু বয়ে আনেনি। অন্যদিকে স্বেচ্ছাধীন নিরস্ত্রীকরণের কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারবো। ১৮১৭ সালে আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মাঝে Rush- Begor চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। ওই চুক্তিটিকে স্বেচ্ছাধীন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই চুক্তিতে আমেরিকা ও ব্রিটেনের নৌবাহিনী সীমিত করার কথা বলা হয়েছিল। যদিও এটা ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চুক্তির শর্তাবলি কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় হেগ সম্মেলনের খবরও আমরা জানি। নিরস্ত্রীকরণ ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য, কিন্তু তা সফল হয়নি। নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত ওয়াশিংটন নৌ সম্মেলন (১৯২১, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে বিধিনিষেধ আরোপ), নয় শক্তির চুক্তি (১৯২২, চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি), চার শক্তির চুক্তি (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের যেকোনো ইস্যুতে মতবিনিময়), লন্ডন নৌ সম্মেলনের (১৯৩০ ও

১৯৩৫) কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনেভায়। ৬১টি দেশের প্রতিনিধিরা ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে মতভেদের কারণে ওই সম্মেলন সফল হয়নি। কোনটা আক্রমণাত্মক অস্ত্র, কোনটা আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র, এ প্রশ্নে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানি প্রথমে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, পরে *লিগ অব নেশনস* থেকে বের হয়ে যায়। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়, *লিগ অব নেশনসও* ব্যর্থ হয়।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে আমরা বারুচ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৬ সালে বার্নাড বারুচকে (Bernard Baruch) জাতিসংঘের পারমাণবিক কমিশনে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন। বারুচ Acheson-Lilienthal Report-এর উপর ভিত্তি করে ওই রিপোর্টটি দেন। উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ। তার প্রস্তাবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে ৬টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এগুলো নিম্নরূপ :

১. নিরাপত্তা পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ গঠন করবে, যার কাজ হবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা;

২. যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকবে নিরাপত্তা পরিষদের উপর;

৩. সকল রাষ্ট্রের পারমাণবিক ও অন্যান্য কেন্দ্র পরীক্ষা করার অধিকার থাকবে নিরাপত্তা পরিষদের;

৪. পারমাণবিক নিয়মকানুন লঙ্ঘন করার কোনো অভিযোগ যদি নিরাপত্তা পরিষদে আসে, সেক্ষেত্রে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ভেটো দেওয়া যাবে না;

৫. নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা করার কাজ চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র আস্তে আস্তে তার পারমাণবিক তথ্যাদি সবার সামনে প্রকাশ করবে;

৬. নিরাপত্তা পরিষদ তার তদন্ত শেষ করলে, আমেরিকা তার পারমাণবিক বোমার মজুত ধ্বংস করে ফেলবে।

বারুচ দাবি করেছিলেন পারমাণবিক বিষয়ে জাতিসংঘের সনদের মূল নীতির প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গের আস্থা দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে। বলা ভালো, *বারুচ পরিকল্পনা* জাতিসংঘের পারমাণকি শক্তি কমিশনের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিকল্প

প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। তার প্রস্তাবে ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার চুক্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ করতে হবে। যত অস্ত্র মজুত আছে তা তিন মাসের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। সোভিয়েত প্রতিনিধি গ্রোমিকো আরো প্রস্তাব করেছিলেন পারমাণবিক তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা দরকার। পরস্পরবিরোধী এই দুটি প্রস্তাবের কারণে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ তথা সীমিতকরণের বিষয়টি তখন অমীমাংসিত থেকে গেল। উভয় পরাশক্তিই পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত বাড়াতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পারমাণবিক দ্রব্য ও কলাকৌশল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব আনেন। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এর কারণ ছিল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তবে এটা ঠিক আইজেনহাওয়ারের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর না হলেও, নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়নি। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন নীতিগতভাবে একমত হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান অপরিহার্য। দেশ দুটি একমত হয় যে পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদন কমিয়ে ফেলতে হবে। এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করা দরকার। রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পক্ষেও তারা একমত হয়। কিন্তু তারপরও ১৯৬৩ সালের দিকে উভয় বৃহৎ রাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষার কথা ঘোষণা করে। তাদের স্ট্রাটেজি দেখে এটা মনে হয়েছিল তারা চায় না অন্য কোনো দেশ বিশ্বে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হোক। পরিস্থিতি ক্রমাগত সংকটের দিকে এগিয়ে গেলে জাতিসংঘ এগিয়ে আসে। জাতিসংঘ ১৮টি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি সম্মেলন ডাকার উদ্যোগ নেয়। এক পর্যায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য রাষ্ট্র একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজি হয়। কিন্তু ফ্রান্স ও চীনের তাতে আপত্তি থেকে যায়। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্র ওই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িত থাকায়, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে বরাবরই একটি সন্দেহ থেকে গিয়েছিল। তবে এটা ঠিক যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, উভয় পরাশক্তিই পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত ছিল। ইতোমধ্যে চীন ও ফ্রান্সও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল। আলজিরিয়ার সাহারা মরুভূমিতে ফ্রান্স প্রথমবারের মতো পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ১৯৬০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। এই পরিকল্পনার নাম ছিল *Gerboise Blueue*। আর প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে ১৯৬৮ সালের ২৩

আগস্ট। চীন প্রথম তার পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ১৯৬৪ সালের ১৬ অক্টোবর। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা চীনের এই পারমাণবিক পরীক্ষার নামকরণ করেছিল *Chic-I*, যা পরিচিত ছিল *Project 596* হিসেবে। ঝিনঝিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের লপ নুর (Lop Nur) অঞ্চলে এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। এর আগে ব্রিটেন প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল ১৯৫২ সালের ৩ অক্টোবর, যার নাম ছিল *Operation Hurricane*। এর আগে ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল বর্তমানে কাজাকিস্তানের অন্তর্গত সেমিপালাটিনক্স (Semipalatinsk) পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রে। ওই পরীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছিল *RDS-1*। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরদো (Alamogordo) এলাকায় ওই পরীক্ষা চালিয়েছিল। ওই পরীক্ষার কোড নাম ছিল *Trinity*। ওই পরীক্ষার তিন সপ্তাহের মাথায় যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা (৬ আগস্ট ১৯৪৫) ও নাগাসাকি (৯ আগস্ট ১৯৪৫) শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল।

ষাটের দশক থেকেই দুই পরাশক্তির মাঝে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু হলেও, ওই সময় একটা প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছিল পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণের। এর রেশ ধরেই ১৯৬৮ সালে *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, ১৯৬৯ সালে *Strategic Arms Limitation Treaty (SALT)* স্বাক্ষরিত হয়েছিল। SALT আলোচনায় পরবর্তীতে *Strategic Arms Reduction Treaty* তে পরিণত হয়।

সারণি : ৩৩
পারমাণবিক পরীক্ষার ঘটনাপঞ্জি

১৯৪৫ সালে প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর পর বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পারমাণবিক ঘটনাপঞ্জি নিচে দেওয়া হলো :

১৯৪৫ সাল :	১৬ জুলাই - নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে ভোর হওয়ার আগে বিশ্বে 'ট্রিনিটি' নামের প্রথম মার্কিন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৬ আগস্ট- জাপানের হিরোশিমা নগরীতে আণবিক বোমা ফেলা হয়। এর তিনদিন পর নাগাসাকিতে আরও একটি আণবিক বোমা ফেলা হয়। এই দুই বোমাই জাপানের আত্মসমর্পণ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকে ত্বরান্বিত করে।

১৯৪৯ সাল :	২৯ আগস্ট- প্রথম সোভিয়েত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ। অক্টোবর- অস্ট্রেলিয়ার উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলে মন্টেবেলো দ্বীপে প্রথম ব্রিটিশ আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। নভেম্বর- প্রশান্ত মহাসাগরের এনিউইটেক এটোলে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোণ ঘটায়।
১৯৫৩ সাল :	মার্চ- মার্কিন পারমাণবিক গবেষণার গোপনীয় কাগজপত্র চুরি এবং তা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বৈদ্যুতিক চেয়ারে আমেরিকার নাগরিক জুলিয়াস এবং ইথাল রোজেনবার্গের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ধরা হয়।
১৯৫৭ সাল :	মে- ভারত মহাসাগরের ক্রিস্টমাস দ্বীপে ব্রিটেনের প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ।
১৯৬০ সাল :	ফেব্রুয়ারি- সাহারা মরুভূমিতে ফ্রান্স তার প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।
১৯৬২ সাল :	অক্টোবর- সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভের কিউবাভিত্তিক পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি এবং সেগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের অবসান ঘটে এবং বিশ্বের পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়।
১৯৬৩ সাল :	অক্টোবর- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তিতে মহাকাশের বাইরে বায়ুমণ্ডলে অথবা পানির নিচে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯৬৪ সাল :	অক্টোবর- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ঝিনজিয়াং প্রদেশের পারমাণবিক পরীক্ষার এলাকায় চীনের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ।
১৯৬৯ সাল :	নভেম্বর- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়মিত কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা (সল্ট) শুরু করে।
১৯৭০ সাল :	মার্চ-নতুন করে আর কোনো পারমাণবিক অস্ত্র যাতে বিস্তার না ঘটে সে লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি। (এনপিটি) কার্যকর করা হয়।
১৯৭৪ সাল :	মে- ভারত প্রথম তার আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

১৯৭৯ সাল :	জুন- পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত রাখতে ভিয়েনায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সল্ট চুক্তির স্বাক্ষর করে।
১৯৮১ সাল :	জুন- ইরাকের পারমাণবিক চুল্লিতে ইসরাইলি যুদ্ধ বিমানের হামলা। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ইরাকি পরিকল্পনার অভিযোগ তুলে ইসরাইল চুল্লিটি গুঁড়িয়ে দেয়।
১৯৮২ সাল :	পরাশক্তিসমূহের দীর্ঘ পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রসংক্রান্ত জেনেভা আলোচনা শুরু।
১৮৮৬ সাল :	২৬- এপ্রিল ইউক্রেনের চেরনোবিলে বিশ্বের ভয়াবহতম পারমাণবিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাকবলিত ইউক্রেন তখন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
১৯৮৭ সাল :	ডিসেম্বর- মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিলোপে ওয়াশিংটনে মার্কিন-সোভিয়েত শীর্ষ বৈঠকে রাষ্ট্রপতি রিগান ও গর্বাচেভের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৮৮ সাল :	মার্চ- ইসরাইলি আণবিক গবেষণার গোপনীয়তা ব্রিটিশ পত্রিকায় প্রকাশ করে দেওয়ার অভিযোগে সাবেক ইসরাইলি পারমাণবিক টেকনিশিয়ান মোর্ডেচেই ভানুনু'র ১৮ বছরের কারাদণ্ড।
১৯৯১ সাল :	জুলাই - মার্কিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পারমাণবিক অস্ত্রের বিলোপ সাধনে রাষ্ট্রপতি বুশ ও গর্বাচেভের কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি (স্টার্ট) স্বাক্ষর। অক্টোবর- ইউরোপে সকল স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং পারমাণবিক গোলা ধ্বংসের মার্কিন সিদ্ধান্তকে ন্যাটোর অনুমোদন এবং পারমাণবিক বোমার মজুতের ব্যাপক হ্রাস শুরু।
১৯৯৩ সাল :	জানুয়ারি - রুশ রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলৎসিন ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের নতুন স্টার্ট-২ স্বাক্ষর। এ চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও রুশ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হয়। মার্চ-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমবারের মতো স্বীকার করে যে তারা পারমাণবিক বোমা বানিয়েছিল কিন্তু ১৯৯১ সালে তাদের বানানো ছয়টি বোমাই ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১৯৯৪ সাল :	ফেব্রুয়ারি - যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একে অপরের ভূখণ্ডের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের স্থাপনাকে লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত হয়। অক্টোবর- যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক চুক্তিতে উপনীত। গোপনে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টার আশঙ্কা করা হয়েছিল।
১৯৯৫ সাল :	১১ মে- পারমাণবিক বিস্তাররোধ চুক্তিকে (এনপিটি) ২৫ বছরের জন্য স্থায়ী রূপ দিতে বিশ্বের জাতিসমূহের সম্মতি। ১৫ মে- এনপিটির মেয়াদ বৃদ্ধির মাত্র ক'দিন পরেই চীন ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৩ জুন-ফ্রান্স সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। ৬ আগস্ট- হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের ৫০ বছর পূর্তি পালন, ৫ সেপ্টেম্বর- মুরুরোয়া এটলে ফ্রান্স ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। বিশ্বব্যাপী ফ্রান্সকে নিন্দা এবং তাহিতিতে দাঙ্গা।
১৯৯৬ সাল :	২৭ জানুয়ারি- ফ্রান্স ষষ্ঠ এবং চূড়ান্ত পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। ২৫ মার্চ- ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগর পারমাণবিক মুক্তাঞ্চল চুক্তি স্বাক্ষর। ১১ এপ্রিল - আফ্রিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা দিয়ে আফ্রিকার ৪৩টি দেশের চুক্তি স্বাক্ষর। ৮ জুন- শিনজিয়াং প্রদেশের পারমাণবিক পরীক্ষা এলাকায় চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ।
১৯৯৭ সাল :	২ জুলাই - নেভাদা মরুভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র বিতর্কিত ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত পরীক্ষা চালানো শুরু করে। ১৮ সেপ্টেম্বর- যুক্তরাষ্ট্র নেভাদায় তেজস্ক্রিয় প্লুটনিয়ামের ওপর দ্বিতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।
১৯৯৮ সাল :	২৪ ফেব্রুয়ারি- ফরাসি জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাপক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অনুমোদন করে। ১৯ মার্চ - মাসের শেষদিকে তেজস্ক্রিয়

প্লুটনিয়ামের ওপর একাধিক ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণ ঘটানোর ঘোষণা দেয় মার্কিন জ্বালানি দপ্তর। ১১ মে- পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজস্থান প্রদেশের মরুভূমিতে ভারতের তিনটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। ১৩ মে- ভারত আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটায়। ২৮ মে- চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য আনতে পাকিস্তান তার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তানে সফল পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩০ মে- পাকিস্তান আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার ধারাবাহিক পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়ে আন্তর্জাতিক নিন্দা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। উপমহাদেশে নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার আশঙ্কা।

সারণি : ৩৪

স্বঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ

১. **যুক্তরাষ্ট্র :** প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণটি ঘটায় ১৯৪৫ সালে। এ নিয়ে মোট এক হাজার ৫৪টি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, বাদবাকি দুনিয়ার সবগুলো দেশ মিলেও যা করেনি। **অস্ত্রভাণ্ডার :** ৪০১৮টি পারমাণবিক বোমা রয়েছে। **মিসাইলের পাল্লা :** ৮ হাজার একশ' মাইল (১৩ হাজার কিলোমিটার), বিশ্বের যেকোনো স্থানে আঘাত হানতে সক্ষম।
২. **ব্রিটেন :** প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৫২ সালে। এ পর্যন্ত ৪৫টি পরীক্ষা চালিয়েছে। **অস্ত্রভাণ্ডার :** ২১৫টি পারমাণবিক বোমা রয়েছে। **মিসাইলের পাল্লা :** সাত হাজার পাঁচশ' মাইল (১২ হাজার কিলোমিটার)।
৩. **ফ্রান্স :** ১৯৬২ সাল থেকেই পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত মোট দুই শ' ১০টি পরীক্ষা চালিয়েছে। সর্বশেষ ১৯৯৫-৯৬ সময়ের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগরের পলিনেশীয় অঞ্চলে ছয়টি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। **অস্ত্রভাণ্ডার :** ১৭৫টি পারমাণবিক বোমা রয়েছে। **মিসাইলের পাল্লা :** তিন হাজার তিনশ' মাইল (পাঁচ হাজার তিনশ' কিলোমিটার)।

৪. **রাশিয়া :** যুক্তরাষ্ট্রের পর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে-এ পর্যন্ত মোট সাত শ' ১৫টি। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র প্রতিযোগিতার একদা বড় কুশীলব রাশিয়ার অস্ত্রভাণ্ডারে ওয়ারহেডের সংখ্যা এখন দিনদিন কমছে। **অস্ত্রভাণ্ডার :** পারমাণবিক বোমার সংখ্যা ৬৮০০টি। **মিসাইলের পাল্লা :** ছয় হাজার আট শ' মাইল (১১ হাজার কিলোমিটার)।
৫. **চীন :** পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো শুরু করে ১৯৬৪ সালে। এ পর্যন্ত ৪৫ বার পরীক্ষা চালিয়েছে। অস্ত্রের সংখ্যা ২৬০টি। চীন পাকিস্তানকে তার পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচিতে গোপনে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে বলে ধারণা করা হয়।
৬. **ভারত :** ১৯৯৮ সালের মে মাসে পাঁচ পাঁচটি পরমাণু বোমার-বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছিল ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধি সরকারের আমলে। **অস্ত্রভাণ্ডার :** পরমাণু ওয়ারহেডের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি। **মিসাইলের পাল্লা :** এক হাজার পাঁচশ' পঞ্চাশ মাইল (দুই হাজার পাঁচ শ' কিলোমিটার)।
৭. **পাকিস্তান :** ভারতকে টেক্কা দিতে গিয়ে ১৯৭২ সালে গোপন পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি শুরু করে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এ পর্যন্ত নিজের তৈরি একাধিক মাঝারি পাল্লার মিসাইলের পরীক্ষা চালিয়েছে। **অস্ত্রভাণ্ডার :** ১২০টি পরমাণু ওয়ারহেড আছে। **মিসাইলের পাল্লা :** নয়শ' ত্রিশ মাইল। (এক হাজার পাঁচশ' কিলোমিটার)।
অঘোষিত পরমাণু অস্ত্রধারী দেশ
৮. **ইসরাইল :** ধারণা করা হয় যে, ভূগর্ভে ইসরাইলের পরমাণু বোমা লুকিয়ে রাখা আছে। ইসরাইল অঙ্গীকার করেছে, যে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হবে না। **অস্ত্রভাণ্ডার :** ৬৪টি থেকে একশ' ১২টি পরমাণু ওয়ারহেড মজুত আছে বলে ধারণা করা হয়। **মিসাইলের পাল্লা :** নয় শ' মাইল (এক হাজার পাঁচশ' কিলোমিটার)। গোপন পরমাণু অস্ত্র কার্যক্রমধারী বলে সন্দেহভাজন দেশ।
৯. **ইরান :** যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ইরান পরমাণু শক্তিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ব্যবহার করে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। **মিসাইলের পাল্লা :** তিন শ' মাইল (পাঁচ শ' কিলোমিটার)।

১০. **ইরাক :** ১৯৯১ সালে উপসাগর যুদ্ধে পরাজয়ের পর জাতিসংঘ ইরাকে অস্ত্র কর্মসূচির ওপর কড়া নজরদারি শুরু করে। জাতিসংঘের অস্ত্র তদন্ত দলের সাঁড়াশি অভিযানের মুখে ইরাকের অস্ত্র উন্নয়নের গতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। **মিসাইলের পাল্লা :** ৯০ মাইল (একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার)
১১. **উত্তর কোরিয়া :** ২০০৬ সালের ৯ অক্টোবর দেশটি প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০১৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় দেশটি। দেশটির কাছে ২০-৩০টি পারমাণবিক বোমা রয়েছে এবং যে উপাদান রয়েছে, তা দিয়ে ৩০-৬০টি পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব। **মিসাইলের পাল্লা :** ছয় শ' থেকে নয় শ' ত্রিশ মাইল (এক হাজার থেকে এক হাজার পাঁচশ' কিলোমিটার)।
১২. **আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল :** আশির দশকে লাতিন আমেরিকার এই দুটি প্রতিবেশী দেশ পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি জোরেশোরে চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলো ১৯৯০ সালের দিকে ঐ কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়। উভয় দেশই লাতিন আমেরিকায় পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তিতেও সই করেছে।
১৩. **বেলারুশ, কাজাখস্তান :** কাজাখস্তান ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার সময় এদের হাতে বেশ কিছু পরমাণু অস্ত্র ছিল। বর্তমানে এরা সবাই যাবতীয় পরমাণু অস্ত্র নির্মূল করে পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
১৪. **দক্ষিণ আফ্রিকা :** আফ্রিকার একমাত্র দেশ যারা পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হয়। ১৯৯১ সালে এফ. ডব্লু. ক্লার্ক পরমাণু অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করে পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। (সূত্রঃ টাইমস/এপি)

এনপিটি চুক্তি (NPT)

NPT বা *Nuclear Non-Proliferation Treaty* হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি। এর উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা ও পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ও ১৮ দেশের সমন্বয়ে গঠিত *Committee on Disarmament* এ ধরনের চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে আসছিল। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই। এবং

কার্যকরী হয় ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ থেকে। চুক্তিটি ২৫ বছর মেয়াদি ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের মে মাসে *এনপিটিতে* স্বাক্ষরকারী দেশগুলো জাতিসংঘে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই চুক্তিটি অনুমোদন করেন। ২০১৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিশ্বের ১৯১টি দেশ এই চুক্তির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছে। উত্তর কোরিয়া ২০০৩ সালে এনপিটি চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল ও দক্ষিণ সুদান এনপিটি চুক্তিটি অনুমোদন করেনি।

সারণি : ৩৫

একনজরে পারমাণবিক অস্ত্র : ১৯৪৫-২০২০

১৯৪৫		২০২০	
১৫ কিলো টন	২২ কিলো টন	৪৫৫ কিলো টন	৮০০ কিলো টন
'লিটল বয়' (হিরোশিমা)	'ফ্যাটম্যান' (নাগাসাকি)	ট্রাইডেন্ট (এসএলবিএম)	এসএস (আইসিবিএম)
যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া

* এসএলবিএম : সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য পারমাণবিক অস্ত্র
আইসিবিএম : আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র
'লিটন বয়' : জাপানের হিরোশিমায় যে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল, তার নাম (৬ আগস্ট, ১৯৪৫)
'ফ্যাটম্যান' : জাপানের নাগাসাকি শহরে নিক্ষেপিত পারমাণবিক বোমার নাম (৯ আগস্ট, ১৯৪৫)

সূত্র : দি ইকোনমিস্ট, Statista, ৩ আগস্ট ২০২০

এনপিটি চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে :

১. চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো কোনো পারমাণবিক অস্ত্র, রসদ, বা পারমাণবিক বোমা তৈরির কোনো উপাদান অন্য কোনো দেশে, যারা এখনও পারমাণবিক শক্তি হিসেবে পরিচিত নয়, তাদের সরবরাহ করতে পারবে না। পারমাণবিক বোমা তৈরিতে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারবে না।

২. চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো IAEA-এর (International Atomic Energy Agency) নীতি ও গাইডলাইন অনুসরণ করবে এবং তারা এই নিশ্চয়তা দেবে যে তাদের যেকোনো পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে।

৩. পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো (Nuclear Weapons Staters-NWS, ৬টি) পারমানবিক শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলোকে (Non-Nuclear Weapon State-NNWS) কোনো ধরনের পারমাণবিক প্রযুক্তি সরবরাহ করতে পারবে না, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পারমাণবিক বোমা বানাতে পারে। পারমাণবিক শক্তিধর

রাষ্ট্রগুলো (NWS) এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তারা, NNWS রাষ্ট্রগুলোতে কোনো ধরনের পারমাণবিক হামলা চালাবে না।

৪. চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তারা আন্থার সাথে পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

৫. চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারমাণবিক শক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিকাশ ঘটাবে। তবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টিকে প্রধান্য দিয়ে ও চুক্তির প্রতি কমিটমেন্ট থেকে এই দেশগুলো পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পক্ষে কাজ করে যাবে।

এনপিটি পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। চুক্তিটি ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত হলে, ফিনল্যান্ড চুক্তিতে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। আর ১৯৯২ সালে ফ্রান্স ও চীন এনপিটিতে যোগ দেয়। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশগুলো পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে *Treaty of Tlatelolco* স্বাক্ষর করলেও (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭), ব্রাজিল ১৯৯৮ সালে এনপিটিতে যোগ দেয়, আর সর্বশেষ কিউবা যোগ দেয় ২০০২ সালে। মেক্সিকোর একটি শহর Tlatelolco তে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বিধায় এটি *Treaty of Tlatelolco* নামে পরিচিত। কিন্তু এই চুক্তির পূর্ণ নাম হচ্ছে *Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and Caribbean*। দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক কর্মসূচি হাতে নিলেও, ১৯৯১ সালে দেশটি পারমাণবিক পরীক্ষার সকল প্রযুক্তি ধ্বংস করে ফেলে। এর মধ্যে দিয়ে অন্যান্য সব আফ্রিকান দেশ এনপিটিতে যোগ দেয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ও পরবর্তীতে স্বাধীন তিনটি দেশ (ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তান) ১৯৯৪ সালে তাদের সব পারমাণবিক প্রযুক্তি রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করে এবং এনপিটিতে যোগ দেয়। যুগোস্লাভিয়া ভেঙে গেলে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোও এক এক করে এনপিটিতে যোগ দেয়। মনটেনেগ্রো যোগ দেয় ২০০৬ সালে। এভাবেই বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো এনপিটিতে যোগ দিয়েছিল।

তবে একটা অভিযোগ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করেছিল। এ ব্যাপারে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন চুক্তি ছিল। অভিযোগে আছে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ ও তুরস্কে B61 যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছিল, যা পারমাণবিক বোমা সজ্জিত ছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল ও দক্ষিণ সুদান কখনো এনপিটিতে স্বাক্ষর করেনি। ভারত ১৯৭৪ সালে প্রথম, ১৯৯৮ সালে

দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। গবেষকদের মতে ভারতের কাছে ১৫০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। আর পাকিস্তানের কাছে আছে ১২০টি ওয়ারহেড। তবে *Carnegie Endowment for International Peace* ও *Stimson Center* এর মতে পাকিস্তানের কাছে ৩৫০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। ভারত মনে করে বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে পারমাণবিক বোমা ও প্রযুক্তি থাকায় এক ধরনের পারমাণবিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। এই পারমাণবিক বৈষম্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পারমাণবিক শক্তি অর্জন করা থেকে বিরত রেখেছে। ভারত এই যুক্তিতে এনপিটিতে যোগ দেয়নি। অন্যদিকে ভারত যোগ না দেওয়ার পাকিস্তানও যোগ দেয়নি। আর ইসরাইলের যুক্তি হচ্ছে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এনপিটি আলোচনা শুরু ও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, তা অযৌক্তিক। তাই ইসরাইল এনপিটি চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। অলিখিতভাবে ইসরাইল একটি পারমাণবিক শক্তি। নিচে একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি তাতে বোঝা যাবে স্বীকৃত পারমাণবিক দেশটি কোনটি এবং তারা এ যাবৎ কটি পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে।

পারমাণবিক দেশ	পারমাণবিক পরীক্ষা
যুক্তরাষ্ট্র	১০৫৪
রাশিয়া	৭১৫
ব্রিটেন	৪৫
ফ্রান্স	২১০
চীন	৪৫
ভারত	৬
পাকিস্তান	৬
উত্তর কোরিয়া*	৬
ইসরাইল (অলিখিত)	জানা যায়নি

* ২০০৬ সালের ৯ অক্টোবর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়।

সিটিবিটি

সিটিবিটি বা *Comprehensive Nuclear Test Bam Treaty* হচ্ছে একটি চুক্তি, যাতে সব ধরনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সিটিবিটি চুক্তিটি গ্রহণ করে ১৯৯৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। এর পর এটি সদস্যদেশগুলোর স্বাক্ষরের জন্য তা উন্মুক্ত করা হয়

১৯৯৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ওই সময় পারমাণবিক শক্তিধর ৫টি দেশ সিটিবিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৬৮টি দেশ এই চুক্তিটি অনুমোদন দিয়েছে। বাকি ১৭টি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করলেও, তা অনুমোদন করেনি। চীন, মিশর, ইরান, ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তা অনুমোদন করেনি। অন্যদিকে ভারত, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান আদৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। চুক্তির দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে:

১. চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো কোনো ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করতে পারবে না, চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় কোনো পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে পারবে না;

২. চুক্তি স্বাক্ষরিত কোনো দেশ নিজে অথবা অন্যকোনো দেশকে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে উৎসাহিত করবে না, সেই সাথে নিজেও অংশ নেবে না।

সল্ট চুক্তি (SALT)

বিশ্ব শতাব্দীতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত অস্ত্র চুক্তি, যা SALT I ও SALT II নামে পরিচিত, তার গুরুত্ব অনেক। SALT বা *Strategic Arms Limitation Talks* বা আলোচনা শুরু হয়েছিল ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে ১৯৬৯ সালে। আলোচনা ও চুক্তি সীমাবদ্ধ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে। এই আলোচনার সূত্র ধরেই *Anti-Ballistii Missile Treaty* স্বাক্ষরিত হয়েছিল। SALT I চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৬ মে। এই চুক্তি অনুযায়ী কৌশলগত যত ব্যালিস্টিক মিসাইল লাঞ্চার, অর্থাৎ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ যন্ত্র আছে, তা 'ফ্রিজ' করা হয়। যাতে করে কোনো পক্ষ আর তার সংখ্যা বাড়াতে না পারে। আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। চুক্তিতে ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক SLBM বা সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সক্ষম ৫০টি সাবমেরিন ও ৮০০ লাঞ্চার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

SALT II আলোচনা শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকে এবং তা চলে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। এটি স্বাক্ষরিত হয় ভিয়েনায় ১৯৭৯ সালের ১৮ জুন। এই চুক্তিতে সব ধরনের নতুন মিসাইল প্রোগ্রাম নিষিদ্ধ এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহনকারী বাহনের সংখ্যা ২২৫০ তে সীমাবদ্ধ রাখা, দূর পাল্লার মিসাইলের সংখ্যা ১৩২০ এ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তাতে করে দুই পরাশক্তির মাঝে

অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমে যায়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের ৬ মাসের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় ও দেশটি দখল করে নেয়। এর মধ্যে দিয়ে দুটি বড় শক্তির মাঝে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয় ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা নতুন করে শুরু হয়।

আইএনএফ চুক্তি

আইএনএফ বা *Intermediate Range Nuclear Forces Treaty* ছিল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বড় অগ্রগতি। ১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর এটি ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এটি অনুমোদন করে ১৯৮৮ সালের ২৭ মে। ১ জুন, ১৯৮৮ রিগান ও গর্বাচেভ এটি অনুমোদন করেন। চুক্তিবলে ভূমিতে স্থাপিত ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ক্রুজ মিসাইল (যার ব্যাপী ৫০০-১০০০ কিলোমিটার ও ১০০০-৫৫০০ কি.মি.) নিষিদ্ধ করা হয়। সমুদ্রে ও আকাশে ব্যবহৃত মিসাইল এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৯১ সালের মে মাসের মধ্যে দেশ দুটি প্রায় ২৬৯২টি মিসাইল ধ্বংস করে। কিন্তু এই চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে যায় যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালের ২০ অক্টোবর এই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিটি স্থগিত করে। রাশিয়াও পরদিন এই চুক্তিটি স্থগিত করে। এতে করে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা আবার শুরু হলো।

স্ট্রার্ট চুক্তি (START)

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে স্ট্রার্ট বা *Strategic Arms Reduction Treaty (START)* ছিল দ্বিপাক্ষিক। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণসংক্রান্ত চুক্তি। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৩১ জুলাই ১৯৯১, যা START I নামে পরিচিত। এটি কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালের ৫ ডিসেম্বরে। পরবর্তীতে START II স্বাক্ষরিত হয়। START I-এর সময়সীমায় পারমাণবিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৮৫৫৬ ও রাশিয়া তথা সিআইএসভুক্ত দেশগুলোর জন্য ৬১৬৩টি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। START I স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারি ও কার্যকর হয় ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল। ১৯৯৩-২০০২ সাল ছিল START এর সময়কাল। পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে ৪২৫০টি

ও রাশিয়ার জন্য ৪২৫০টি। ২০০৩ পরবর্তী সময় উভয় দেশের সমরাস্ত্র ৩৫০০টিতে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট START II অনুমোদন করে ১৯৯৬ সালের ২৬ জানুয়ারি, আর রাশিয়া অনুমোদন করে ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ABM চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলে রাশিয়া START II থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় ২০০২ সালের ১৪ জুন।

START চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় SORT বা *Strategic Offensive Reduction Treaty*-এর মাধ্যমে, যা *Treaty of Moscow* নামেও পরিচিত। START এর আদলেই এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করতে রাজি হয়। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় মস্কোতে ২০০৩ সালের ১ জুন। ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নতুন এই চুক্তিতে উভয় রাষ্ট্রই তাদের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ ১৭০০ থেকে ২২০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। এর আগে *New START* চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় প্রাগে ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল, এবং তা অনুমোদনের পর কার্যকর হয় ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। ২০২১ সালে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কথা। New START চুক্তিটি SORT এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। New START চুক্তিতে যা আছে, তা হচ্ছে : ১. মিসাইল ও বোমারু বিমানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকবে ৭০০টিতে, ২. ওয়ারহেড সীমাবদ্ধ থাকবে ১৫৫০ টিতে, ৩. মিসাইল লাঞ্চার বা ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপক এর সংখ্যা থাকবে ৮০০টিতে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণ কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের সীমিতকরণের প্রশ্নটিকে একটি প্রশ্নের মাঝে ফেলে দিয়েছে। New START-এর পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনার আদৌ কোনো অগ্রগতি নেই। কিন্তু ট্রাম্পের একটি ঘোষণা নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে START চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তারা আর এই চুক্তির নবায়ন করবে না। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের দু'জন বিশেষজ্ঞ যারা START চুক্তির প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল, তারা বিখ্যাত *Foreign Affairs* ম্যাগাজিনে লিখিত এক প্রবন্ধে চুক্তি নবায়ন না করার ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেছেন। এরা দুজন হচ্ছে Rose Gottemoeller (যুক্তরাষ্ট্র) আর Anatoly Antonov। তারা লিখেছেন ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত একটি *'ওয়েক আপ'* কল বিশ্বের জন্য। তাদের মতে এই সিদ্ধান্ত "a Chilling sign of how dangerous the world has become"। তারা

আরো সতর্ক করে বলেছেন, 'Without a binding treaty the nuclear arms race will immediately recommence, and armageddon will not be for away'। 'Armageddon', অর্থাৎ সৎ ও অসৎ এর সর্বশেষ রণক্ষেত্রে

সারণি : ৩৬

একনজরে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ

১৬৭৫	:	স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg Agreement)
১৮৯৯	:	হেগ শান্তি সম্মেলন
১৯১৯	:	ভার্সাই চুক্তি
১৯২৫	:	লোকার্নো (Locarno) চুক্তি
১৯২৭	:	কেল্লাগ-ব্রিয়ান্ড (Kellogg-Briand) চুক্তি
১৯৩২-৩৪	:	বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন
১৯৬০	:	দশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ কমিটি
১৯৬২-৬৮	:	১৮ জাতি নিরস্ত্রীকরণ কমিটি
১৯৬৯-৭৮	:	নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত সম্মেলন
১৯৭৯-বর্তমান	:	নিরস্ত্রীকরণসংক্রান্ত সম্মেলন
নৌবাহিনী		
১৯০৮-১৯০৯	:	লন্ডন নৌবাহিনী সম্মেলন
১৯২১-১৯২২	:	ওয়াশিংটন নৌবাহিনী সম্মেলন
১৯২৭	:	জেনেভা নৌবাহিনী সম্মেলন
১৯৩০	:	লন্ডন নৌ চুক্তি
১৯৩৫	:	দ্বিতীয় লন্ডন নৌ চুক্তি
মহাশূন্য		
১৯৬৭	:	মহাশূন্যসংক্রান্ত চুক্তি
রাসায়নিক অস্ত্র		
১৯৭২	:	সকল ধরনের জৈব রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ।
১৯৯০	:	সকল ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র সীমিতকরণ। ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০০০ টনের মধ্যে অস্ত্র সীমাবদ্ধ রাখা।
১৯৯৩	:	সকল ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন, গবেষণা মজুত করা, ট্রান্সফার ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পরিণত হবে বিশ্ব! ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গেল ফেব্রুয়ারিতে (২০১৯) INF চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এবং একই সাথে *Open Skies Treaty* থেকেও নিজেকে প্রত্যাহার করেছে। *Open Skies Treaty* স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২০০২ সালে। ৩৫টি দেশ এর অনুমোদন দিয়েছে। এই

চুক্তিতে এক দেশ অপর দেশের মহাশূন্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এবং নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি পাবে। এই চুক্তিও এখন বাতিল হলো। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের ছোট পারমাণবিক অস্ত্র (Mini Nukes) আবিষ্কার করেছে যা পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে উসকে দিতে পারে। (দেখুন, *MPN News*, ১ মে, ২০২০)। *W 54* নামে পরিচিত এই মিনি পারমাণবিক বোমা যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা সাবমেরিনের মাধ্যমে ব্যবহৃত হতে পারে। ১০ থেকে ১০০০ টন TNT (১ কিলোটন) ক্ষমতা সম্পন্ন এগুলো (হিরোসিমায় ব্যবহৃত হয়েছিল ১৫ কিলোটন TNT)। ছোট এই মিনি পারমাণবিক বোমার ওজন ৩ পাউন্ড (১.৩৬ কিলোগ্রাম)। এমনকি *Suitcase Nuclear Device* এর কথাও শোনা যায়, যা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করেছে। এটা এত ছোট যে 'ব্যাকপ্যাক' অথবা যেকোনো সুটকেসে বহন করা সম্ভব।

জৈব অস্ত্র কনভেনশন

সাম্প্রতিক সময়ে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হচ্ছে জৈব অস্ত্র। বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) ঘটনাটি যখন বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় তুলেছিল, তখন জৈব অস্ত্রের বিষয়টি সামনে চলে আসে। অর্থাৎ একটা অভিযোগে ছিল করোনা ভাইরাস একটি জৈব মারণাস্ত্র! জৈব অস্ত্রের মাধ্যমে মানব শরীরে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ইত্যাদি প্রবেশ করিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই ১৯৭২ সালে *Biological Weapons Convention (BWC)* চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১০৯টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, যা ১৯৭৫ সালের মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে (বর্তমানে ১৮৩টি দেশ এই চুক্তিবদ্ধ)। যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির স্বাক্ষকারী দেশ ও ১৯৭৫ সালে চুক্তিটি অনুমোদন করে। চীন অনুমোদন করে ১৯৮৪ সালে, আর বাংলাদেশ অনুমোদন করে ১৯৮৫ সালে। চুক্তির ১নং ধারা অনুযায়ী কোনো দেশ যেকোনো অবস্থাতেই হোক না কেন, জীবাণু অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারবে না। ধারা ২ এ এই ধরনের অস্ত্র ধ্বংস, কিংবা ধারা ৩ এ অস্ত্রের ট্রান্সফার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধারা ৪ এ বলা হয়েছে BWC চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ধারা ৫ এ বলা হয়েছে দেশগুলো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারবে। ধারা ৬ এ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানানো যাবে কোনো দেশ যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, সে ব্যাপারে তদন্ত করতে। ধারা ৭ এ কোনো দেশ যদি জৈব অস্ত্রে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের সাহায্য এবং ধারা ৮ এ শান্তিপূর্ণভাবে *Biological Science and Technology* ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। এখানে একটা কথা প্রয়োজন। তিবলিসে পেন্টাগনের একটি প্রোগ্রাম আছে, যার নাম *Biological Weapons Sharing Program Threat Reduction (DTRA)*। এই কর্মসূচির আওতায় জৈব অস্ত্র কীভাবে কাজ করে, তা দেখা হয়। চীনের উহানে (যেখানে থেকে করোনা ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছিল ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর) একটি ল্যাব আছে *Wuhan Institute of Virology*, যেখানে জৈব অস্ত্র নিয়ে গবেষণা হয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে।

রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি

রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি এক ধরনের অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি। রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি বা *Chemical Weapons Convention* চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারি। চুক্তিটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে *Organistion for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*। জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। চুক্তিটি ১৯৯৩ সাথে স্বাক্ষরিত হলেও, তা কার্যকর হয়েছে ১৯৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল। মোট ১৬৫টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৩টি দেশ এই চুক্তির আওতাধীন থাকলেও মিশর, ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ সুদান এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা ভালো, ১৮ জাতির সমন্বয়ে গঠিত Disarmament Committee রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ১৯৬৮ সালে। পরে তা Conference on Disarmament নামে পরিচিতি পায়। এই কমিটি ১৯৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করে, যেখানে রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি সম্পর্ক একটি প্রস্তাব ছিল। ওই প্রস্তাব অনুসরণ করেই পরে রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ : ১. সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ; ২. রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, উৎপাদিত সকল অস্ত্র ধ্বংস করা, ৩. রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্টি (দেশ) ও OPCW-এর মধ্যে সমন্বয়, ৪. যেকোনো রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শনের অধিকার থাকবে OPCW এর; ৫. রাসায়নিক শিল্পের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

চুক্তির শর্ত অনুসরণ করে ২০০০ সালের এপ্রিলের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস করা হয়, ২০০২ সালের এপ্রিলের মধ্যে ধ্বংস করা হয়

শতকরা ২০ ভাগ অস্ত্র, আর ২০০৪ সালে এপ্রিলে শতকরা ৪৬ ভাগ, আর ২০০৭ সালের এপ্রিলে শতকরা ১০০ ভাগ অস্ত্র ধ্বংস করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালের ১৪ জানুয়ারি চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। আর এটি নিবন্ধিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৫ এপ্রিল, আর এটি কার্যকর হয়েছে ১৯৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল। OPCW'র কাছে ইতোমধ্যে ৭২৩০৪ মেট্রিক টন রাসায়নিক এজেন্ট ও ৯৭টি রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের খবর আছে, যারা রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন করে, অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।

মহাশূন্য চুক্তি

মহাশূন্যসংক্রান্ত চুক্তি, যা কি না *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the moon and other Celestial Bodies* নামে পরিচিত, এটা এক ধরনের চুক্তি, যা Space Law বা মহাশূন্য আইন অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই চুক্তিটি ১৯৬৭ সালের ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর রয়েছে। ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ১০৯টি দেশ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছে, তবে ২৩টি দেশ এখনও চুক্তিটি অনুমোদন করেনি। বাংলাদেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া চুক্তিটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। চুক্তিতে যা আছে তা অনেকটা এরকম : ১. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ ভূপৃষ্ঠে *Weapons of Mass Destruction* বা ভয়ংকর মারণাস্ত্র হিসেবে যা পরিচিত, তা মহাশূন্যে স্থাপন করতে পারবে না। এমনকি চাঁদ বা দূরবর্তী কোনো অজানা গ্রহেও তা প্রতিস্থাপন করা যাবে না; ২. চাঁদকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা কাজে ব্যবহার করা যাবে। সেখানে কোনো সেনা ঘাঁটি স্থাপন বা কোনো ধরনের পারমাণবিক পরীক্ষা করা যাবে না। তবে মহাশূন্যে *Conventional Weapons* বা সনাতন অস্ত্র মহাশূন্যে স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ নেই; ৩. মহাশূন্য সব দেশ ও জাতির জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং তারা সেখানে অভিযান চালাতে পারবে; ৪. চুক্তিতে চাঁদের উপর কোনো দেশের একক কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ চাঁদকে এককভাবে দখলও চুক্তিতে নিষিদ্ধ।

তবে চুক্তিতে এক ধরনের অস্পষ্টতা রয়েছে যে, মহাশূন্যে কিংবা চাঁদ থেকে খনিজ পদার্থ বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা যাবে কি না। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে *Commercial Space Launch Competitiveness Act 2015* পাস হয়েছিল, যাতে করে বাণিজ্যিকভাবে মহাশূন্য ব্যবহার করা যায়।

পরবর্তীতে লুক্সেমবার্গ, জাপান, চীন, ভারত ও রাশিয়াও এ ধরনের আইন পাস করেছে। প্রসঙ্গক্রমেই *Open Skies Treaty* নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এটি ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর রয়েছে। এটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র *Open Skies Treaty* থেকে বের হয়ে আসবে। (নিউইয়র্ক টাইমস, মে ২১, ২০২০)। অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বাধা। কেননা নতুন START চুক্তির আগেই যুক্তরাষ্ট্র *Open Skies Treaty* থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। START চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওই চুক্তিতে পারমাণবিক মিসাইলের সংখ্যা ১৫০০ (যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া) এ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ট্রাম্প চাচ্ছেন নতুন START আলোচনায় চীনও অন্তর্ভুক্ত হোক। *Open Skies Treaty* থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হচ্ছে রাশিয়া তার একটি শহরের উপর দিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট চলাচলে অনুমতি দিচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ওই শহরে রাশিয়া তার পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করেছে, যা দিয়ে ইউরোপে আক্রমণ চালানো সম্ভব।